

কওয়ায়েদে-খানাদারী

অর্থাৎ

গাইদ্য-নীতি

ইহাতে

পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফের অতীত, আবশ্যকীয় বাক্যাবলীর সংক্ষিপ্ত
ব্যবহা এবং পার্শী, উর্দু, হিন্দী, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়
লিখিত বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও জ্ঞানীব্যক্তিগণের সংসার-নীতি, সমাজ-
নীতি, ও ধর্ম-নীতি সম্বন্ধীয় কার্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত
উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মন দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ কর ইহা, ওহে ও স্মৃতি।

“অল্লা” ও “রসুলের” আদেশ, পাল তুমি, এই হে মিনতি ॥

ইহকাল, পরকাল তব সমুজ্জল হইবে ইহাতে।

“ফজ্জ” ও “সুন্নতের” “অজর” পাবে তুমি হাতে হাতে ॥

“পকাইত বিধি” ও “চৌকীদারী গাইড” প্রণেতা

মানভূম জেলার পুলিশ ইন্স্পেক্টর

“আসী”

সামিনউদ্দীন আহমদ

কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ১৯০৯ খৃঃ অঃ।

মূল্য ১৮ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

অল্লা, রসূল দঃ ও কোরান শরিকের বিষয় ।

১। অল্লাহ শব্দ সম্বন্ধে ।	৯। কোরান শরিক সম্বন্ধে ।
২। খোদাতালার পরিচয় ।	১০। কোরান শরিকের মাহাত্ম্য ।
৩। ঈশ্বরের প্রতি ভয় ।	১১। কোরানের আদেশ ও নিষেধ ।
৪। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ।	১২। কোরান শরিকের পাঠ ।
৫। মহম্মদ দঃ সম্বন্ধে ।	১৩। মহম্মদের দঃ আদেশ ।
৬। মহম্মদের দঃ মহত্ব ও মর্যাদা ।	১৪। চারি ফরজ সম্বন্ধে ।
৭। মহম্মদের দঃ অমরত্ব ।	১৫। ইমান সম্বন্ধে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ইসলামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খোদার বন্দেগী ।

১। পঃ গান। নমাজ সম্বন্ধে ।	১৪। অপরাপর নমাজ সম্বন্ধে ।
২। রমজানের রোজার বিবরণ ।	১৫। নমাজের সময়ের নির্ণয়তা ।
৩। রোজার ফজিলত ।	১৬। শরীর ও বস্ত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে ।
৪। উজুর ফজিলত ।	১৭। হজ্জ সম্বন্ধে ।
৫। নমাজের ত্রিঘা ।	১৮। কোরান ও চারি ইমামের বিবরণ ।
৬। নমাজের প্রণালী ।	১৯। হিজরী সালের গণনা ।
৭। জকাত সম্বন্ধে ।	২০। ইংরাজি সালের গণনা ।
৮। জকাতের গুণ ।	২১। রসূলে খোদার দঃ বিবাহ ।
৯। জকাতের ব্যবস্থা ।	২২। রসূলে খোদার দঃ কুসীনামা, চারি অসহাবের বিবরণ, শিখা মতের উৎপত্তি ও মহরমের বিবরণ ।
১০। কোরবানী সম্বন্ধে ।	২৩। ওহাবী মতের উৎপত্তি, রাকবী ও খারজীগণের বিবরণ ।
১১। ফিৎরা সম্বন্ধে ।	
১২। ইদারেনের নমাজ সম্বন্ধে ।	
১৩। জুমার নমাজের বিবরণ ।	

তৃতীয় অধ্যায় ।

সৌজন্য ।

১ । সত্য কথা বলা সম্বন্ধে ।	৬ । সত্যের গুণ ।
২ । মিথ্যাকথা না বলা সম্বন্ধে ।	৭ । সত্য কথা বলিবার অত্যাশ ।
৩ । মিথ্যার দোষ ।	৮ । সত্যের প্রতিপালন ।
৪ । মিথ্যার সংশ্রব ।	৯ । পরনিন্দা ।
৫ । অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে ।	

চতুর্থ অধ্যায় ।

পরোপকারিতা ।

১ । স্বার্থভাগ ।	১১ । পর ধনে যত্ন ।
২ । জীবে দয়া ।	১২ । দরিদ্র ও প্রার্থীর সহিত ব্যবহার ।
৩ । পরদোষ গোপন সম্বন্ধে ।	১৩ । সংকার্ষের মহিমা ।
৪ । পরধন সম্বন্ধে ।	১৪ । দানের গুণ ও প্রথা ।
৫ । পরের দুঃখ ।	১৫ । দানগ্রাহীর প্রতি ব্যবহার ।
৬ । অহিতকর কার্য ।	১৬ । দানের মাহাত্ম্য ।
৭ । হিতকর কার্য ।	১৭ । অতিথির সহিত ব্যবহার ।
৮ । পরের মন্দ করা ।	১৮ । কৃপণের অবস্থা ।
৯ । পরের আস্থা ও শরতান সম্বন্ধে ।	১৯ । সংকার্ষের বিবরণ ।
১০ । ঈর্ষ ও মনুষ্য ।	

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভক্তি ও ভালবাসা ।

১ । পিতা ও মাতার সেবা ।	৬ । বন্ধুতা ।
২ । পিতা ও মাতার সহিত পুত্র ও কন্যার ব্যবহার ।	৭ । স্ত্রীর গুণ ।
৩ । স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্বন্ধ ।	৮ । স্ত্রী শিক্ষা ।
৪ । স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ও তাহার ফল ।	৯ । স্ত্রীলোকের পরণা ।
৫ । কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠের কর্তব্য ।	১০ । স্ত্রীলোকের আবরণ ও আভরণ ।
	১১ । গৃহিনীর কর্তব্য ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সদ্যবহার ।

১। অপরের সহিত ব্যবহার ।	৪। সদালাপ ।
২। অহংকার ।	৫। সদাচরণ ও বেশভূষা আদি ।
৩। নিরহংকার ।	৬। অপরের সহিত সাক্ষাতে ব্যবহার ।

সপ্তম অধ্যায় ।

বিদ্যা ।

১। বিদ্যা অধ্যয়ন সম্বন্ধে ।	৩। ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষার সহিত
২। ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষা ।	ধর্ম ও কর্তব্যের সংশ্লিষ্ট ।

অষ্টম অধ্যায় ।

জীবিকা ।

১। সং উপায় ।	৮। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ।
২। অসং উপায়ের প্রতিকল ।	৯। কার্য্যে কর্তব্য জ্ঞান ।
৩। সং জীবিকার জন্য চেষ্টা ।	১০। সম্পত্তিরক্ষণ ব্যবস্থা ।
৪। পরিশ্রমে কাতরতার কল ।	১১। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধে ।
৫। উপার্জনের ব্যবস্থা ।	১২। স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে ।
৬। অধীনতা কর্তব্য জ্ঞান ।	১৩। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয়
৭। ব্যবসায় ও বাণিজ্য ।	সম্বন্ধে ।

নবম অধ্যায় ।

গৃহবাস ।

১। ভিটাবাড়ি বা গৃহের আয়ুঃ অর্থাৎ স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে ।	৬। পিতার নিকট পুত্রের দায়িত্ব ও পিতার কর্তব্য ।
২। গৃহের নির্মাণবিধি সম্বন্ধে ।	৭। অল্প বয়সে পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে ।
৩। বাসগৃহ নির্মাণ জন্য স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে ।	৮। স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্বন্ধে ।
৪। স্বাধীন ভাবে বাস করিবার বিষয় ।	৯। গৃহজামাতা রূপে বিবাহের পরিণাম ।
৫। একত্রে বা একগৃহে বাস সম্বন্ধে ।	১০। স্ত্রী সহগামের ব্যবস্থা ও তাহার পরিণাম ।

১১। পুত্র ও কন্যার জন্ম, শিক্ষা ও তাহাদের প্রতিপালন সম্বন্ধে।	১৮। জাহাজ ও নৌকা সম্বন্ধে।
১২। পুত্র বা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়।	১৯। হানাম ও হারামের বিষয়।
১৩। সম্বন্ধের বিচার বিষয়ে।	২০। উপাসনার সময় ও তাহার ব্যবস্থা।
১৪। গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে।	২১। ইসলাম সমাজের দুর্দশার কারণ।
১৫। জলাশয় ও বাগান সম্বন্ধে।	২২। ধর্মের সর্বশেষ রাজ্য সম্বন্ধে।
১৬। জীবহত্যা বা পশুবধ সম্বন্ধে।	২৩। ফজ্র সমূহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।
১৭। মাংশের গুণ ও কোরবানী সম্বন্ধে।	২৪। “মোমানিয়তে বুজরগান” অর্থাৎ বিজ্ঞব্যক্তিগণের নিবেদনব্যবস্থা।

দশম অধ্যায়।

দীক্ষা অর্থাৎ পিরী ও মুরিদী।

১। পিরী ও মুরিদী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	৪। মিলাদ শরিফ ও দরুদেপাকের ফজিলত সম্বন্ধে।
২। সুফিগণের পরিচয়।	৫। মুসলমান সাধুর ক্রমতা।
৩। সংস্কার বা মুরশেদে কামেল সম্বন্ধে।	৬। দোয়া ইসম পাকির গুণ।

পরিশিষ্ট।

আমাদের দুর্দশার দৃষ্টান্ত।

কওয়ায়েদে-খানাদারী

অর্থাৎ

গাইদ্য-নীতি

ইহাতে

পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফের অতীত, আবশ্যকীয় বাক্যাবলীর সংক্ষিপ্ত
ব্যবহা এবং পার্শী, উর্দু, হিন্দী, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়
লিখিত বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও জ্ঞানীব্যক্তিগণের সংসার-নীতি, সমাজ-
নীতি, ও ধর্ম-নীতি সম্বন্ধীয় কার্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত
উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মন দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ কর ইহা, ওহে ও স্মৃতি।

“অল্লা” ও “রসুলের” আদেশ, পাল তুমি, এই হে মিনতি ॥

ইহকাল, পরকাল তব সমুজ্জল হইবে ইহাতে।

“ফজ্জ” ও “সুন্নতের” “অজর” পাবে তুমি হাতে হাতে ॥

“পকাইত বিধি” ও “চৌকীদারী গাইড” প্রণেতা

মানভূম জেলার পুলিশ ইন্সপেক্টর

“আসী”

সামিনউদ্দীন আহমদ

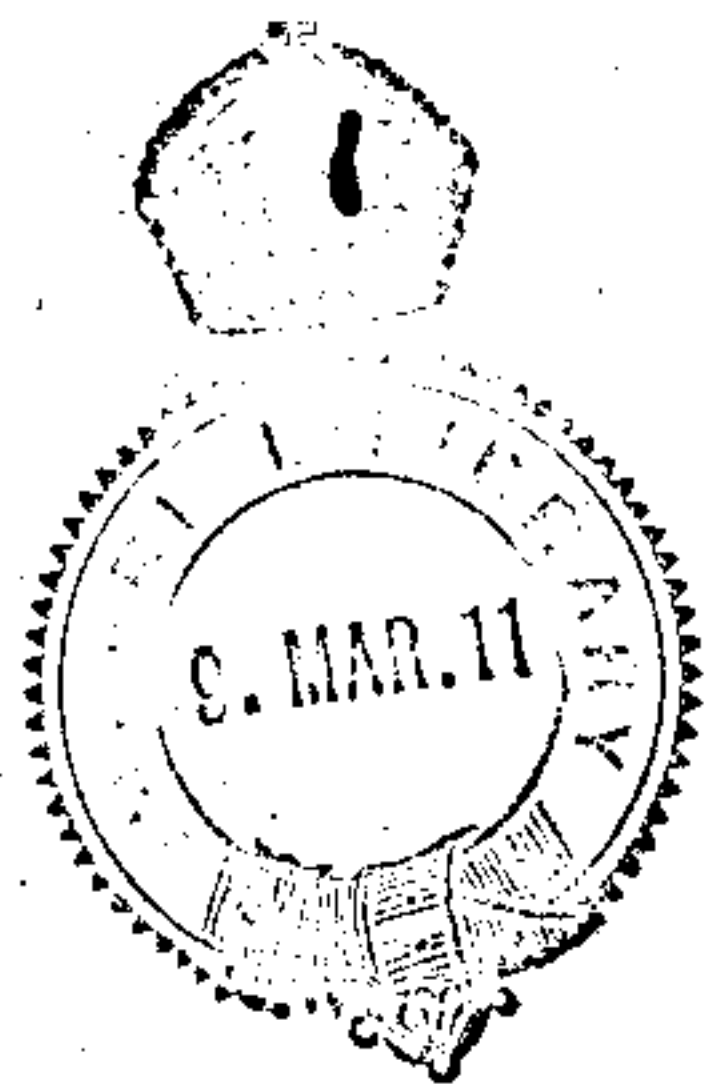
কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ১৯০৯ খৃঃ অঃ।

মূল্য ১৮ টাকা মাত্র।



PRINTED BY B. K. DASS AT THE "WELLINGTON PRINTING WORKS,"
10, HALADHAR BURDHAN LANE, CALCUTTA.

উদ্দেশ্য ।

উপদেশ বা নীতি সম্বন্ধে নানা ভাষায় নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, আমার এই পুস্তিকার দ্বারা যে, কেহ কোন অভিনব বিষয়ের উপদেশ বা শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাহা আমি বলিতে পারি না । সংসার সম্পর্কীয় এমন কোন কোন বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, অমেকে হয়ত জানিয়াও জানেন না এবং বুঝিয়াও বুঝেন না, তাহা উপদেশ বা শিক্ষা নহে কিন্তু পরীক্ষা করিলেই তাহার ফল পাওয়া যাইতে পারে । নিয়তই যুগ্মযোর চক্ষে বাহা পড়িতেছে, অনেকেই হয়ত তাহার ফল ভোগ করিতেছেন, অথচ প্রায় কেহই তাহার আলোচন বা আলোচনা করিয়া পরিণাম ভাবিতেছেন না । তাহার আলোচনা করিয়া উপকার বা অনুপকারের কারণ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে অনেকে অবশ্যই উহার উৎপত্তি ও পরিণাম ফল বুঝিতে পারেন, কিন্তু প্রায় কেহই তৎসম্বন্ধে মনোনিবেশ করেন না বলিয়া আমার ধারণা; এই নিমিত্ত ইহাতে অধিকাংশ স্থলে প্রত্যেক বিষয়ের যথা সম্ভব মূল কারণ ও পরিণাম ধরিয়াই আলোচনা করা হইয়াছে । এই পুস্তিকাখণ্ড পাঠে কেহ কোন স্থানে তর্ক উত্থাপন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহার প্রমাণ-জন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত না দিয়া তাঁহাদের বাক্যের সত্যতার পোষকতায় সাধারণের বিবেচনা ও প্রত্যক্ষ পরিণাম ফলের বিচারের উপর নির্ভর করিলাম ।

আজকাল বালক ও বালিকাগণ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির গুণে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা পায় না এবং সংসার রক্ষণ প্রক্রিয়া ও প্রণালী অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল রক্ষা করিয়া “ছনিয়াদারী” করা শিখিতে পারেনা ভাবিয়াই আমি আপন সম্মান ও সম্মতিগণের শিক্ষার জন্ত এই পুস্তিকার

হস্তলিপি খণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলাম, আমার কোন কোন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে ইহা মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম, তবে কাহারও উপকারে আসিতে পারে কি না, বুঝিতে পারি না। আমি এক জন সামান্ত ও অশিক্ষিত মনুষ্য, তাহাতে আবার মনুষ্য মাত্রই দোষ ও ভ্রমের বশীভূত, এই নিমিত্ত ইহার কোন বিষয় কোন পাঠকের নিকট দোষ বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি যেন নিজ গুণে ক্ষমা করেন এবং আমাকে জানাইয়াও যেন বাধিত করেন ; কিন্তু কেহ ইহার মর্ম্মানুসারে কার্য করিলে তাহা দেশের ও সমাজের মঙ্গল বলিয়াই ধর্তব্য হইবে। সাধারণের হিতার্থে এই পুস্তিকায় পবিত্র “আয়েতে-কোরাণ” ও “হদিসে-পাক” কে অক্ষরান্তরিত করিতে হইয়াছে ইহা অবশ্যই অন্ত্যায় ও অবিধি, তজ্জন্ত খোদাওন্দ করিমের সমীপে মাফির প্রার্থনা।

পবিত্র কোরাণ শরিফ অল্লাহর বাক্য, তদনুরূপ পবিত্র হদিস শরিফ অর্থাৎ জনাব রসুলে করিমের দঃ বাক্য অর্থাৎ তাঁহার আদেশ, ব্যবস্থা ও নিষেধ অল্লাহর বাক্যের সমতুল্য বলিয়াই গণ্য। পবিত্র কোরাণ শরিফের “শুরায়ে নজম” তাহা প্রমাণ করিতেছে। আমার এই পুস্তিকা খণ্ড কয়টি মাত্র হদিস শরিফের অবলম্বনেই লিখিত, তাহার যৎসামান্য ব্যাখ্যাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার।

“বিসমিল্লা হির রহম্মা নির রহীম”

“অল হুমদো লিল্লাহে, রব্বিল আল মীন,
অর রহম্মা, নির রহীমে, মালেকে এও মিদদীন,
ইআকা না বোদো, ও ইআকা নস্তঈন,
এহ দেন্নস সেরাতল মুস্তকীম,
সেরাতল লজিনা, অন্ অমতা আলয়হীম,
গয়রীল মগ দুবে আলয়হীম ওলদ দায়া লীন”

“আমীন”

“বল গল ওলা বেকমা লেহী
কশ ফদ দোজা বেজমা লেহী
হসোনং জমিয়ো খেসা লেহী
সল্লু আলায় হে ও আ লেহী”

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

অল্লা, রসূল দঃ ও কোরান শরিকের বিষয় ।

১। অল্লাহ শব্দ সম্বন্ধে ।	৯। কোরান শরিক সম্বন্ধে ।
২। খোদাতালার পরিচয় ।	১০। কোরান শরিকের মাহাত্ম্য ।
৩। ঈশ্বরের প্রতি ভয় ।	১১। কোরানের আদেশ ও নিষেধ ।
৪। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ।	১২। কোরান শরিকের পাঠ ।
৫। মহম্মদ দঃ সম্বন্ধে ।	১৩। মহম্মদের দঃ আদেশ ।
৬। মহম্মদের দঃ মহত্ব ও মর্যাদা ।	১৪। চারি ফরজ সম্বন্ধে ।
৭। মহম্মদের দঃ অমরত্ব ।	১৫। ইমান সম্বন্ধে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ইসলামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খোদার বন্দেগী ।

১। পঃ গান। নমাজ সম্বন্ধে ।	১৪। অপরাপর নমাজ সম্বন্ধে ।
২। রমজানের রোজার বিবরণ ।	১৫। নমাজের সময়ের নির্ণয়তা ।
৩। রোজার ফজিলত ।	১৬। শরীর ও বস্ত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে ।
৪। উজুর ফজিলত ।	১৭। হজ্জ সম্বন্ধে ।
৫। নমাজের ত্রিঘা ।	১৮। কোরান ও চারি ইমামের বিবরণ ।
৬। নমাজের প্রণালী ।	১৯। হিজরী সালের গণনা ।
৭। জকাত সম্বন্ধে ।	২০। ইংরাজি সালের গণনা ।
৮। জকাতের ণ্ড ।	২১। রসূলে খোদার দঃ বিবাহ ।
৯। জকাতের ব্যবস্থা ।	২২। রসূলে খোদার দঃ কুসীনামা, চারি অসহাবের বিবরণ, শিখা মতের উৎপত্তি ও মহরমের বিবরণ ।
১০। কোরবানী সম্বন্ধে ।	২৩। ওহাবী মতের উৎপত্তি, রাকবী ও খারজীগণের বিবরণ ।
১১। ফিৎরা সম্বন্ধে ।	
১২। ইদারেনেহ নমাজ সম্বন্ধে ।	
১৩। জুমার নমাজের বিবরণ ।	

তৃতীয় অধ্যায় ।

সৌজন্য ।

১ । সত্যকথা বলা সম্বন্ধে ।	৬ । সত্যের গুণ ।
২ । মিথ্যাকথা না বলা সম্বন্ধে ।	৭ । সত্য কথা বলিবার অত্যাশ ।
৩ । মিথ্যার দোষ ।	৮ । সত্যের প্রতিপালন ।
৪ । মিথ্যার সংশ্রব ।	৯ । পরনিন্দা ।
৫ । অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে ।	

চতুর্থ অধ্যায় ।

পরোপকারিতা ।

১ । স্বার্থভাগ ।	১১ । পর ধনে যত্ন ।
২ । জীবে দয়া ।	১২ । দরিদ্র ও প্রার্থীর সহিত ব্যবহার ।
৩ । পরদোষ গোপন সম্বন্ধে ।	১৩ । সংকার্ষের মহিমা ।
৪ । পরধন সম্বন্ধে ।	১৪ । দানের গুণ ও প্রথা ।
৫ । পরের দুঃখ ।	১৫ । দানগ্রাহীর প্রতি ব্যবহার ।
৬ । অহিতকর কার্য ।	১৬ । দানের মাহাত্ম্য ।
৭ । হিতকর কার্য ।	১৭ । অতিথির সহিত ব্যবহার ।
৮ । পরের মন্দ করা ।	১৮ । কৃপণের অবস্থা ।
৯ । পরের আস্থা ও শরতান সম্বন্ধে ।	১৯ । সংকার্ষের বিবরণ ।
১০ । ঈর্ষ ও মনুষ্য ।	

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভক্তি ও ভালবাসা ।

১ । পিতা ও মাতার সেবা ।	৬ । বন্ধুতা ।
২ । পিতা ও মাতার সহিত পুত্র ও কন্যার ব্যবহার ।	৭ । স্ত্রীর গুণ ।
৩ । স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্বন্ধ ।	৮ । স্ত্রী শিক্ষা ।
৪ । স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ও তাহার ফল ।	৯ । স্ত্রীলোকের পরণা ।
৫ । কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠের কর্তব্য ।	১০ । স্ত্রীলোকের আবরণ ও আভরণ ।
	১১ । গৃহিনীর কর্তব্য ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সদ্যবহার ।

১। অপরের সহিত ব্যবহার ।	৪। সদালাপ ।
২। অহংকার ।	৫। সদাচরণ ও বেশভূষা আদি ।
৩। নিরহংকার ।	৬। অপরের সহিত সাক্ষাতে ব্যবহার ।

সপ্তম অধ্যায় ।

বিদ্যা ।

১। বিদ্যা অধ্যয়ন সম্বন্ধে ।	৩। ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষার সহিত
২। ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষা ।	ধর্ম ও কর্তব্যের সংশ্রব ।

অষ্টম অধ্যায় ।

জীবিকা ।

১। সং উপায় ।	৮। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ।
২। অসং উপায়ের প্রতিকল ।	৯। কার্য্যে কর্তব্য জ্ঞান ।
৩। সং জীবিকার জন্য চেষ্টা ।	১০। সম্পত্তিরক্ষণ ব্যবস্থা ।
৪। পরিশ্রমে কাতরতার কল ।	১১। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধে ।
৫। উপার্জনের ব্যবস্থা ।	১২। স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে ।
৬। অধীনতা কর্তব্য জ্ঞান ।	১৩। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয়
৭। ব্যবসায় ও বাণিজ্য ।	সম্বন্ধে ।

নবম অধ্যায় ।

গৃহবাস ।

১। ভিটাবাড়ি বা গৃহের আয়ুঃ অর্থাৎ স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে ।	৬। পিতার নিকট পুত্রের দায়িত্ব ও পিতার কর্তব্য ।
২। গৃহের নির্মাণবিধি সম্বন্ধে ।	৭। অল্প বয়সে পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে ।
৩। বাসগৃহ নির্মাণ জন্য স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে ।	৮। স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্বন্ধে ।
৪। স্বাধীন ভাবে বাস করিবার বিষয় ।	৯। গৃহজামাতা রূপে বিবাহের পরিণাম ।
৫। একত্রে বা একগৃহে বাস সম্বন্ধে ।	১০। স্ত্রী সহগামের ব্যবস্থা ও তাহার পরিণাম ।

১১। পুত্র ও কন্যার জন্ম, শিক্ষা ও তাহাদের প্রতিপালন সম্বন্ধে।	১৮। জাহাজ ও নৌকা সম্বন্ধে।
১২। পুত্র বা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়।	১৯। হানাম ও হারামের বিষয়।
১৩। সম্বন্ধের বিচার বিষয়ে।	২০। উপাসনার সময় ও তাহার ব্যবস্থা।
১৪। গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে।	২১। ইসলাম সমাজের দুর্দশার কারণ।
১৫। জলাশয় ও বাগান সম্বন্ধে।	২২। ধর্মের সর্বশেষ রাজ্য সম্বন্ধে।
১৬। জীবহত্যা বা পশুবধ সম্বন্ধে।	২৩। ফজ্র সমূহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।
১৭। মাংশের গুণ ও কোরবানী সম্বন্ধে।	২৪। “মোমানিয়তে বুজরগান” অর্থাৎ বিজ্ঞব্যক্তিগণের নিবেদনব্যবস্থা।

দশম অধ্যায়।

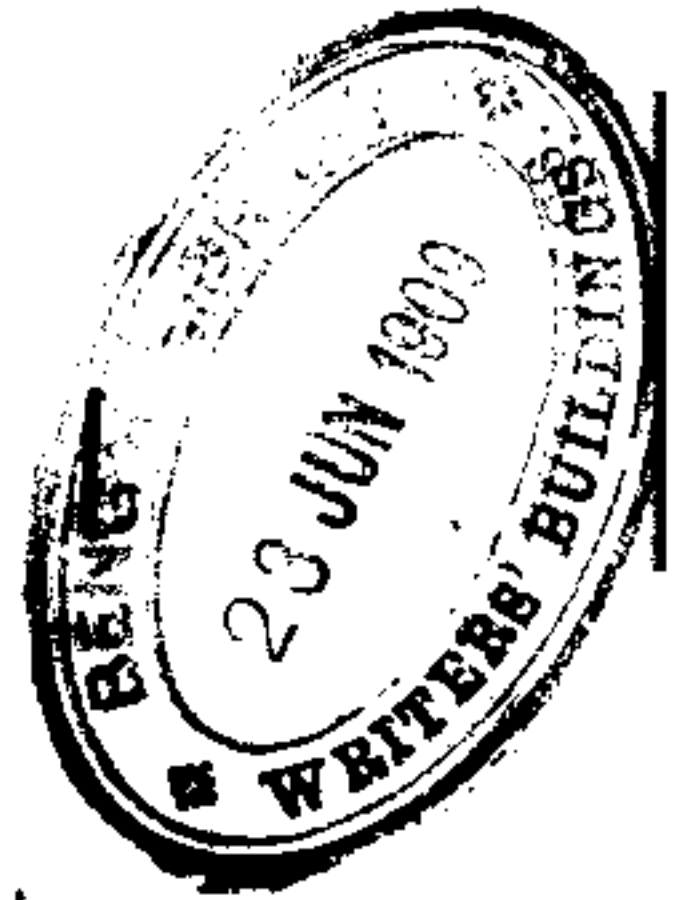
দীক্ষা অর্থাৎ পিরী ও মুরিদী।

১। পিরী ও মুরিদী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	৪। মিলাদ শরিফ ও দরুদেপাকের ফজিলত সম্বন্ধে।
২। সুফিগণের পরিচয়।	৫। মুসলমান সাধুর ক্রমতা।
৩। সংস্কার বা মুরশেদে কামেল সম্বন্ধে।	৬। দোয়া ইসম পাকির গুণ।

পরিশিষ্ট।

আমাদের দুর্দশার দৃষ্টান্ত।

গাইহু-নীতি



“বফজলে খোদাওন্দ রোজি রেসাঁ ।

তোফারৈলে নবি সরওরে মুরসেলা ॥”

হে খোদাতালা তুমি কল্পনাভীত ও বর্ণনাভীত । আমি জানি ও সকলেই জানে তুমি সমাগরা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টিকর্তা, তোমার গুণ বর্ণনা করে কাহার সাধ্য । তুমি অনাদি ও অশেষ গুণসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও জ্যোতির্শ্রয় হইতেছ ।

প্রথম অধ্যায় ।

আল্লা, রসূল ও কোরাণ শরিফের বিষয় ।

১। “অল্লাহ” এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই, তিনি কাহারও পুত্র নহেন, তাঁহারও কোন পুত্র নাই, তিনি নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ ।

“অল্লাহ” শব্দ অতি পবিত্র, সমস্ত মূলভাষায় লিখিত ধর্মশাস্ত্রে এই পবিত্র শব্দেই সৃষ্টিকর্তাকে সম্বোধন করিয়াছেন । হিব্রু ভাষায় সৃষ্টিকর্তাকে “ইলি” কহেন, বেদের সংস্কৃত ভাষায়

“এলে” কহিয়াছেন ও আরবি ভাষায় “অল্লা” কহেন । দেখিতে গেলে ইহা কেবল স্থান বিশেষে উচ্চারণের প্রভেদ মাত্র, অতএব এই সর্বসমাদৃত শব্দে সৃষ্টিকর্তাকে সম্বোধন করাই আমাদের এমন কি সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ঞ্চতি-মধুরতা নিমিত্ত এই পুস্তকে যে যে শব্দে অল্লাকে সম্বোধন করা হইয়াছে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয় ।

২। ঈশ্বরকে নিয়তই হাজের অর্থাৎ উপস্থিত ও নাজের অর্থাৎ দৃশ্য ভাবা উচিত । খোদায়ে পাক, পবিত্র কোরাণ-শরীফে বলিয়াছেন—

আরবি ।

“নহনো অকরবো এলায়হে
মিন হবলিল অরিদ”

ইহার অর্থ এই যে আমি তোমাদের গলদেশের প্রধান শিরা অপেক্ষাও নিকটে আছি । কোন কবি বলিয়াছেন—

হিন্দি ।

“না ওহ ঠাঁও না ওহ বিন ঠাঁও
রূপ, রেখ, বিন নিশ্বল নাঁও
নাহি মিলা, নাহি বিছড়া, আয়েস রাহা ভরপুর
দিষ্ট ওস্ত কি নিরে, অক্স মুরখকি হাঁয় দূর”

ইহার অর্থ এই যে তাঁহার (ঈশ্বরের) কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই এবং এমন কোন স্থান নাই যে তিনি তথায় নাই, তাঁহার আকার ও চিত্র নাই, তাঁহার নাম মিশ্রল হইতেছে । তিনি

কাহারও সহিত মিলিত নহেন এবং তিনি কোন পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্নও নহেন সর্বত্রই বিद्यমান । দৃষ্টিবানের নিকটে এবং অন্ধ ও মূর্খের দূরে রহিয়াছেন ।

৩। প্রতি কার্যো ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভরসা রাখা আবশ্যক ।

৪। প্রতি সংকার্যো ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আন্তরিক ভয় ও ভক্তিসহকারে সেই কার্য সম্পন্ন করা কর্তব্য এবং নিয়ত তাঁহার দয়া প্রার্থনা করা উচিত ।

৫। শয়তানের (পরে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে) প্ররোচনায় কখনও কোন অসৎ কার্যের কল্পনা মনোমধ্যে স্থান পাইলে তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে হাজের ও নাজের বলিয়া বুঝা উচিত । তৎক্ষণাৎ সেই মন্দ কার্য হইতে অবশ্যই বিরত থাকিতে পারা যাইবে ।

৬। জনাব মহম্মদ মুস্তফা, সলুল্লাহ অলেয়েহ ও সল্লিমকে খোদার রসূল অর্থাৎ অভিপ্রেত ও প্রেরিত এবং সর্বশেষ নবি বলিয়া নিয়ত তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস রাখা কর্তব্য এবং নিয়ত তাঁহাকে ও তাঁহার নামের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক ।

৭। জনাব রসূলে মকবুল (দরুদ) ইহজগতে সর্বশেষ পয়গম্বর অর্থাৎ সুসংবাদদাতারূপে জন্ম হইয়াছেন । তাঁহার পর পৃথিবাতে আর কোন রসূল বা পয়গম্বর জন্ম হইবেন না, কারণ ইহা পৃথিবীর শেষ অবস্থা । হিন্দুগণ বলেন ইহা 'কলিকাল' এই জগৎ ঈশ্বরের নিকট অন্যান্য নবি অপেক্ষা

সর্বশেষ নবি জনাব মহম্মদ মুস্তফা দঃ মরতবা অর্থাৎ ইজ্জৎ
অতিশয় মহান । মহাকবি সাদি বলিয়াছেন—

পার্সী ।

“এমামে রোসল পেশওয়ায়ে সবিল
অমিনে খোদা মহবতে জীবরাইল”

ইহার অর্থ এই যে জনাব মহম্মদ মুস্তফা দঃ সমূহ পয়গম্বরের
মধ্যে ইমাম অর্থাৎ সর্দার হইতেছেন । ঈশ্বরের অমানন্দার ও
ঈশ্বরের সর্বপ্রধান দূত জীবরাইলের দঃ আসিবার স্থল । এই
নিমিত্ত পুরাকালের নবিগণ আপন আপন ক্ষমতাবলে জনাব
মহম্মদ মুস্তফা দঃ মহান ক্ষমতা জানিতে পারিয়া তাঁহার
উন্মৎ অর্থাৎ মতাবলম্বির শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্ম বাসনা প্রকাশ
করিয়া গিয়াছেন । এই মর্মে কোন কবি বলিয়াছেন—

উর্দু ।

“বার গাহে হকমে মুসা নে এহ কি হায ইল্তেজা
আয় খোদা দাখেল তু কর উন্মতে মহম্মদ মেসদা”

ইহার অর্থ এই যে (হজরৎ মহম্মদের দঃ জন্ম হইবার
বহুপূর্বে) হজরত মুসা দঃ (যাঁহাকে ইংরাজগণ মুজ্জি
কহেন) ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে
মহম্মদের দঃ ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে গণ্য করিও । ইহার
কারণ এই যে জনাব রসূলে করিমের দঃ উন্মৎগণের মধ্যে
অনেকের মরতবা অর্থাৎ ইজ্জৎ পুরাকালের অনেক নবি
অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং উন্নত । অতএব এখন আমাদের

ভাবা উচিৎ এবং ইহা আমাদের মহাসৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা এরূপ মহা সম্মানশালী রসুলের উন্মৎ হইয়া জন্ম হইয়াছি । কোন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন—

উর্দু ।

“বনায়া রহমতে আলম্‌কি উন্মৎমে হমে তুনে
এলাহী শুকরে কেঁও কর হো অদা ইস খাস রহমৎকা”

ইহার অর্থ এই যে হে জগদীশ্বর তুমি আমাকে যে শেষ পয়গম্বর রসুলে করিমের দঃ উন্মৎ মধ্যে জন্ম দিয়াছ তাহার জন্ম আমি কি প্রকারে ও কতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতেছি না । জনাব রসুলে করিমের দঃ আবির্ভাবের সংবাদ তাঁহার জন্ম হইবার বহু পূর্বে বেদ ও বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তবে ঈর্ষাবশতঃ সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন না ও তাঁহাকে এই মহম্মদ দঃ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না ।

৮ । জনাব রসুলে করিম দঃ কে জীবিত জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনুগত দাসানুদাসের ন্যায় তাঁহার স্নেহলাভের আকাঙ্ক্ষা করা আমাদের আবশ্যক । কেতাবে আছে—

আরবি ।

“ইয়া আওলিয়া অল্লাহে লারে মুতো”

ইহার অর্থ যে আওলিয়াগণের মৃত্যু নাই তাঁহারা সকলেই জীবিত । আওলিয়া জীবিত থাকিলে যিনি পয়গম্বর অর্থাৎ আওলিয়াগণের গুরু গুরু তিনি জীবিত না থাকিবেন কেন ।

অতএব অশ্রাশ্র পয়গম্বরগণও আমার জনাব রসুলে করিম দঃ সততই জীবিত ও জাগ্রত আছেন বুঝিতে হইবে ।

৯ । খোদায়ে পাক আপন রসুলে মকবুলের দঃ প্রতি ও তাঁহার উম্মংগণের জন্ত পবিত্র কোরাণ শরিফ নাজেলে অর্থাৎ অবতীর্ণ করিয়াছেন । ইহা সত্য সত্যই খোদার বানী । জনাব রসুলে মকবুলের দঃ সমীপে হজরৎ জীবরাইলের দঃ আবির্ভাব হইলে তিনি ঈশ্বরের বানী যখন যাহা রসুলে করিমের দঃ সমীপে প্রকাশ করিতেন জনাব রসুলে করিম দঃ তখনই তাহা সাধারণের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন । শ্রোতৃগণ তৎক্ষণাৎ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন । এইরূপে সমূহ কোরাণ নাজেল হইয়াছিল ও সকলে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেছিলেন । হজরৎ জীবরাইলের দঃ আগমন না হইলে জনাব রসুলে করিম দঃ কোরাণের কোন নূতন বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিতেন না । লোকে কেহ জীবরাইল আলেয়েহে সলামকে দেখিতে পাইতেন না, তবে কেহ কেহ কখন কখন চিল বা অন্য পক্ষীকে দেখিতে পাইতেন মাত্র । তৎকালেই রসুলে করিমের দঃ কোরাণ শরিফ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হইত, নচেৎ তিনি আপন স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে কোরাণ শরিফের কিছুই ব্যক্ত করিতে পারিতেন না । সাধারণ ক্ষমতাবলে যে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেন তাহাকেই হদিস শরিফ কহে । কোরাণ ও হদিস শরিফ তাঁহারই কথিত কিন্তু ইহার উভয়ের ভাষায় আকাশ ও পাতালের প্রভেদ । কেতাবে হাজার ও হাজার হদিস শরিফ

দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার একটীমাত্র হৃদিসের এবারৎ কোরাণ শরিফের কোন না কোন আয়েতের এবারৎ বা মজমুনের মধুরতার সহিত তুলনাই হইতে পারে না । এইজন্য কোরাণ শরিফকে অবশ্যই খোদার কলাম বলিতে হইবে । এই পবিত্র কোরান শরিফের প্রতি সতত আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক । বিধর্মাবলম্বী ও কাকেরগণ এই পবিত্র কলাম মুজিদকে খোদার কলাম না বলিয়া মহম্মদেরই দঃ উক্তি বলেন । ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । মহম্মদকে দঃ ঈশ্বর উন্মি অর্থাৎ বিদ্যাহীন করিয়াছিলেন, তিনি কেবল আপন মাতৃভাষা আরবিতে কথা বলা ব্যতীত কোন ভাষার লিখা বা পড়া জানিতেন না ও অন্য কোন ভাষায় কথাও বুঝিতে বা বলিতে পারিতেন না । এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কি এত বড় ক্ষমতা হইতে পারে যে এরূপ অতুলনীয়, অসাধারণ ও অদ্বিতীয় পুস্তক যাহার এক পংক্তির তুলনায় আজ পর্য্যন্ত কেহ এক পংক্তি লিখিতে পারেন না অথচ তাঁহার মত লোকে যে এই পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য ও সংগত নহে । ইহা যে ঈশ্বরের বানী তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে ইহাই এক আশ্চর্যজনক প্রমাণ হইতেছে যে, যে মূল বা বীজমন্ত্র দ্বারা স্বয়ং মহম্মদ দঃ দীক্ষিত এবং যাহার দ্বারা মহম্মদ দঃ আপন জীবদ্দশায় অসংখ্য ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার দ্বারা এতাবৎকাল অসংখ্য অসংখ্য মুসলমান দীক্ষিত হইয়াছেন, হইতেছেন ও

আরবি ।

“লাএলাহাইল্লাল্লাহো, মহম্মদর রসুলুন্নাহে” ।

এই পবিত্র বচন, দুইটি ছন্দে বিভক্ত ও ইহার উভয় ছন্দই পবিত্র কলাম মুজিদেব অন্তর্ভুক্ত । এই পবিত্র কলাম মুজিদ যদি মহম্মদের দঃ কথিত হইত তবে, তিনি অবশ্যই আপন এই বীজমন্ত্র অর্থাৎ কলাময়ে পাকের উভয় ছন্দকে কলাম মুজিদেব মধ্যে একত্রে ও একস্থানে উল্লিখিতরূপে ভুক্ত করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেন । কারণ ইহা তাঁহার অধিকারের মধ্যেই ছিল । কাফেরগণ বেশ দেখিতে পারেন যে এই দুইটি ছন্দ পবিত্র কলাম মুজিদেব মধ্যে কোন স্থানেই একত্রে নাই । দুইটি ছন্দ পৃথক পৃথক স্থানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা খোদায়ে পাকের ইচ্ছানুরূপ যেখানে যাহা ব্যক্ত করা আবশ্যিক তাহাই তিনি করিয়াছেন । এই পবিত্র কলাম শরিফ কখন কোন মনুষ্যের কথিত নহে, অবশ্যই খোদায়ে পাকের কলাম পাক হইতেছে ।

১০ । জনাব মহম্মদ মুস্তফার দঃ আর এক নাম “আহমদ” দঃ হইতেছে । খৃষ্টধর্মের বাইবেল গ্রন্থে এই নামেই মহম্মদ মুস্তফার দঃ ভবিষ্যৎবাণী রহিয়াছে । নব বাইবেলে ইহা থাকুক আর নাই থাকুক কিন্তু হিব্রু ভাষায় লিখিত আদি বাইবেলে ইহা অবশ্যই আছে । পবিত্র কোরান শরিফের “সূরায়ে সফ” এতেও ইহা বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু তদ্ব্যতীত কোরান শরিফের মধ্যে কোনও স্থানেই আহমদের দঃ নাম যে মহম্মদ দঃ তাহা

দঃ রচিত হইত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই এই কোরাণ শরীফের মধ্যে কোন না কোন স্থানে আপনাকে বাইবেলের লিখিত সেই “আহমদ” দঃ বলিয়া প্রমাণ করিতে কখনই ক্রটি বা ভ্রম করিতেন না। এই কারণেও অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পবিত্র কোরাণ শরীফ কখনই মহম্মদের দঃ রচিত নহে। অতএব ইহা যে খোদার বানী ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাফেরগণের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বৃথা। জনাব রসুলে খোদার আহমদ দঃ নাম গুণবাচক নাম হইতেছে। তাহার এইরূপ গুণবাচক নাম অসংখ্য আছে, তাহার মধ্যে এই নাম সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে আহমদ দঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি “অহদ,” অহদ শব্দের অর্থ এক। এই এক শব্দ কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়, কারণ ঈশ্বরই এক, তাহার দ্বিতীয় নাই, অতএব অহদ শব্দের অর্থ ঈশ্বর। কোরাণ ও হাদিস শরীফে আছে যে, খোদায়ে পাক আপন প্রিয় নবিয়ে আখেরে জমান অহমদ মুজতেবা, মহম্মদ মুস্তফা দঃ কে আপন পবিত্র নুরের অর্থাৎ জ্যোতির অংশ হইতে সৃষ্টি করিয়া “লোহ মহফুজে” (ঈশ্বরের সন্নিধানে পবিত্র স্থানের নাম বিশেষ) রাখিয়াছিলেন ও সেই নুরে মহম্মদি দঃ কে আপন নাম ও গুণের সাদৃশ্যতায় “আহমদ” নামে অবিহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর জগতে সেই নুরের আবির্ভাব হইলে তাহারই নামকে “মহম্মদ” বলিয়া প্রকাশ করেন। এই আহমদ ও মহম্মদ দঃ নামের মধ্যে কোনই বিভিন্নতা নাই এবং উভয় নামের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সকলই এক। আরও এক কথা

জগতে এমন কোন ধর্ম বা ধর্মপুস্তক আছে যে তাহাতে সাহস করিয়া বলিয়াছেন ও বলিতে পারেন যে “আমার এই ধর্মপুস্তকে লিখিত কোন একটা ক্ষুদ্র পংক্তির সমতুল্য পংক্তি একটা রচনা করিয়া আন” । আমার পবিত্র কোরাণ শরিফ ব্যতীত কেহই আজ পর্য্যন্ত সে সাহস করিতে পারেন না এবং পারিবেনও না । জগতে আমার ইসলামের বিরোধি আরবি ভাষাবিজ্ঞ মহামহা বিদ্বান হইয়া গিয়াছেন ও হইতেছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কেহই পবিত্র কোরাণের কোন না কোন একটা পংক্তির তুলনায় অন্য একটা পংক্তি রচনা করিয়া তাহার সমতুল্যতার প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন । তাহা কেহই পারেন না । খোদায়ে পাক আপন কলাম মুজিদে বলিয়াছেন—

আরবি ।

“মিন্মা নজ্জলনা অলা অবদেনা

কাতু বেস্ত রতিম মিম মিসলেহী—”

ইহার অর্থ এই যে আমি যাহা নাজিল করিয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কাহারও সন্দেহ থাকে তবে এইরূপ সূরা একটা রচনা করিয়া লইয়া আইস । বেদ ও বাইবেলাদি কোন গ্রন্থই সাহস করিয়া এরূপ কথা বলিতে পারেন না । বলিতে গেলে কথায় কথায় শত সহস্র লোকে তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন । আমার পবিত্র গ্রন্থ কোর মনুষ্যের রচিত নহে, ইহা অবশ্যই খোদার বানী, তাহাই তাহার এরূপ

ক্ষমতা । মানুষে কখনই খোদার কাজের সমতুল্যতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে না এবং পারিবেও না অতএব তাঁহার পবিত্র বচনের তুলনায় কোন বচন রচনা করা কাহারও সাধ্য নহে । এইজন্য আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারে না এবং পারিবেনও না । হিন্দুগণের ধর্ম্যপুস্তক বেদের চতুর্থ খণ্ড, অথর্ব বেদের মণ্ডুক উপনিষদেও জনাব রসুলে করিমের দঃ ভবিষ্যৎ বানী রহিয়াছে । তাহাতে “মহামর্দ” নাম আছে । এইজন্য হিন্দুভায়াগণ ঈর্ষাবশতঃ বলেন মুসলমানগণ আপনাদের রাজত্বকালে ইহা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন ! আরও কেহ কেহ বলেন অথর্ববেদ বেদের মধ্যেই নহে, এই নিমিত্ত অথর্ববেদবাদী হিন্দুগণকে অপর হিন্দুগণ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ দোষ ও ভ্রান্তি । উক্ত বেদের অলৌল উপনিষদে আছে—

সংস্কৃত ।

অস্মাং ইল্লা মিত্রা বরুণাদিবানধত্তে ।

ইল্লা বরুণো রাজা পুনর্দত্তঃ ॥

ইয়া মিত্রো ইল্লাং ইল্লাং ইল্লাং বরুনো মিত্রস্তে জস্কামঃ ॥১॥

হোতার মিত্রো হোতারমিত্র মহা সুরিত্রাঃ ॥

অল্লো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমঃ পূর্ণঃ ব্রহ্মানঃ অল্লাম্ ॥২॥

অল্লো রসুল মহামদর কবরস্ত অল্লা আল্লাম্ ॥৩॥

আদল্লা বুক মেককম্ ॥ অল্লা বুক নিখাতকম্ ॥৪॥

আল্লা যজ্ঞেন হত হত্বা ॥ অল্লা সূর্য্য, চন্দ্র সর্ব্বনক্ষত্রাঃ ॥৫॥

অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষাং বিশ্বরূপম্ ॥৭॥

ইল্লা কবর ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লেতি ইল্লাঃ ॥৮॥

ওম অল্লা ইল্লা অনাদি স্বরূপায় অথর্বণা ইরামাহং হ্রীং অনানপ
শুন সিদ্ধান্ কলচরান অদৃষ্টং কুরুফট্ ॥৯॥

অম্বরসংহারিনী হং হ্রিং অল্লো রসুল মহমদর কবরস্ত অল্লো অল্লাম
ইল্লেতি ইল্লাঃ ॥১০॥

ইহাতে স্পষ্টই মহম্মদ দঃ কে রসুল বলিয়া স্বীকার করা
হইয়াছে, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে আমাদের পবিত্র ধর্মের
ও রসুলের উল্লেখ বেদেও আছে। আর্ধ্যধর্মাবলম্বী
কাফেরগণ “অনুমান” করেন যে “আকবর সাহেবের” সময়ে
কেহ উহা রচনা করিয়াছেন। তাহাদের নিকট যে অথর্ব
বেদ আছে তাহাতে ইহা নাই। এক্ষণে বিচার করা আবশ্যিক
ইহাদের “অনুমান” শব্দের অর্থ কি, তাহা কি স্বতসিদ্ধ ?
তাহারা এমন কি পুরুষ যে তাহাদের অনুমান ভ্রান্তিমূলক
হইতে পারে না, বা স্ত্রীমূলক হইতে পারে না। আবার
বলিতেছেন “আকবর সাহেব”—ভাল, আকবর সাহেবটী কে ?
দিল্লীর অধিতীয় সম্রাট “আকবর সাহ” ব্যতীত ভারতে
“আকবর সাহেব” নামের এমন কোন অসাধারণ পুরুষ হন
নাই যে তাহার সময়ে এই শ্লোকটি রচনা হইয়াছে। এইত
গেল তাহাদের পুস্তকেই তাহাদের ভ্রম ও দোষ। যদি
ইহা আকবর সাহকেই ধরিয়া লওয়া হয় তকে আকবর সাহ
খৃঃ ১৫৫৬ সাল হইতে ১৬০৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতে রাজত্ব

ইহার পূর্বে কি এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা ছিল না ? বহুকাল অবধি ইহার আলোচনা হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের ধর্মবিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক সমূহ প্রমাণ দিতেছে । আকবর সাহের সময়েই যদি ইহা কেহ রচনা করিয়াছিল ও বেদের সহিত যদি ইহার কোন সংস্রব না ছিল তবে ইহাদের এত যত্নগা হইবার কারণ কি ? খৃষ্টাঙ্গগণ এই জ্বালায় অস্থির হইয়া আপন ধর্মপুস্তককে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া আসিতেছেন । এই প্রকারে এই আর্ঘ্য * কাফেরগণ অথবা অন্য কাহারও দ্বারা এই অথর্ব বেদের পরিবর্তন হওয়াও বিচিত্র কি ! এই উদ্দেশ্যেই কাফেরগণ তাহাদের আদি বা পুরাতন বেদের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন ও ক্রমান্বয়ে সংশোধিত বেদ প্রচার করিতেছেন । এই সম্বন্ধে আলোচনার স্থলে এই আর্ঘ্য কাফেরগণ আপন পুস্তকে লেখিয়াছেন “(প্রশ্ন) আজ পর্য্যন্ত কেহ একথা কহেন নাই । আপনি যখন একরূপ নূতন কথা বলিতেছেন, তখন আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে । (উত্তর) তোমাদিগের বিশ্বাস করা এবং অবিশ্বাস করাতে আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে না” । এক্ষণে ইহাদের এই কথা ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ইনি নূতন কথা বলিতেছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই একথা বলিতে পারে না । ইহাতেও তিনি সত্যবাদী বলিয়া নিজমুখেই প্রকাশ

করিতেছেন । হায় রে কাফেরগণ এতদিন কি কেহ পুরাতন বেদ দেখে নাই । তাহাতে ইহা না থাকিলে অবশ্যই উহা শত প্রকারে ঘোষিত হইয়া যাইত । খোদাওন্দ করিম যাহাকে অবিশ্বাসী ও কাফের করিয়াছেন তাহার স্মৃতি কি প্রকারে হইতে পারে । নরক ইহাদেরই জন্য সৃষ্টি হইয়াছে ।

১১ । পবিত্র কোরাণের আদেশ অনুযায়ী খোদার আজ্ঞা সমূহ মুসলমান মত্রে পালন করা অবশ্য কর্তব্য ও তাহাতে বাহা নিষেধ আজ্ঞা আছে তদসমূহ ত্যাগ করা মুসলমান মাত্রে আবশ্যক ।

১২ । আন্তরিক ভক্তিসহকারে নিয়ন্ত পবিত্র কোরাণ শারিফ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য । কেহ পাঠ করিতে না জানিলে শিক্ষা করা উচিত । শিক্ষা করিতে পারিলে যতবার আদ্যোপান্ত পাঠকরা যায় ততই মঙ্গল নচেৎ অন্ততঃ পক্ষে জীবনের মধ্যে একবারও সমূহ কোরাণ পাঠ করিবার আদেশ আছে । শিক্ষা করিতে না পারিলে জীবনের মধ্যে যতবার হয় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করা উচিত । কাহারও ভাগ্যে তাহাও না ঘটিলে জীবনের মধ্যে একবারও সমূহ কোরাণ শরিফ তাহাকে শ্রবণ করিতেই হইবে নচেৎ তিনি খোদার দরগাহে গোনাহগার হইবেন । এই পবিত্র কোরাণ শরিফের প্রধান মহত্ত্ব এই যে, ইহা ব্যতীত জগতে অন্য কোন ধর্মের ধর্মপুস্তকের হাফেজ অর্থাৎ আদ্যোপান্ত মুখস্থকারী কেহই নাই । আমার পবিত্র কোরাণ শরিফের

অন্যান্য ধর্মের অসারতা প্রযুক্ত ও ঈশ্বরের নিগ্রহ হেতু কেহই তাহাদের ধর্মপুস্তক মুখস্থ করিতে পারেন না ও কেহ সম্পূর্ণ মুখস্থ করিয়া রাখিতেও পারেন না । ইহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বর অন্যান্য সমূহ ধর্মকে রদ করিয়া দিয়াছেন ও এক্ষণে জগতের প্রচলিত ধর্মই আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম বলিয়া তাহার ধর্ম পুস্তকে মুখস্থ করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন । এই পবিত্র কোরাণ শরিফে পাঠে অবহেলা করা উচিত নহে ।

১৩। পবিত্র কোরাণের আদেশ ব্যতীত জনাব রসুলে করিম মহম্মদ মুস্তাফির দঃ যে সমস্ত আদেশ বা ব্যবস্থা রহিয়াছে তৎসমূহকে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে প্রতিপালন করা মুসলমান মাত্রের কর্তব্য ।

১৪। পবিত্র কোরাণের আদেশ অনুযায়ী পঞ্জগানা রীমাজ, পবিত্র রমাজান শরিফের রোজা ও জকাত এবং পবিত্র হজ্জের আদেশ পালন করিতে মুসলমানগণ বাধ্য । ইহা খোদার আদেশ অনুযায়ী ফর্জ্জ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য । ইহাতে অবহেলা বা ত্রুটি করিলে খোদার দরগাহে অশেষরূপে গুণাহগার ও দণ্ডনীয় হইতে হইবে । ইহা ত্যাগ করা কোনও মতেই উচিত নহে । এমন কি ইহা ত্যাগ হইতেই পারে না এতদ্ব্যতীত কোরাণ শরিফের আরও যে সকল অমর ও নিহী অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধ আছে, তদনুসারে কার্য করা ও তাহা পালন করা সকলেরই কর্তব্য ।

অভিপ্রেত ও প্রেরিত পুরুষ । পবিত্র কোরাণ শরিফ খোদার
 বচন ও তাহার বিবরণসমূহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলে
 সে কখনই মুসলমান হইতে পারে না । কোরাণ শরিফ অনু-
 যায়ী মহম্মদ মুস্তাফার দঃ পূর্বে যে সমস্ত পয়গম্বর অর্থাৎ
 মহাপুরুষ বা ধর্মযাজক হইয়া গিয়াছেন, খোদার মলাএক
 ও ফেরেস্টা অর্থাৎ ঈশ্বরের দূতগণ ও পবিত্র কোরাণ শরিফের
 পূর্বের ধর্মপুস্তক সমূহ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অর্থাৎ
 কয়ামত অর্থাৎ পরকাল যাহার বিবরণ সমূহ ধর্ম পুস্তকে
 বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রতি অটল বিশ্বাস করা প্রত্যেক
 মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য । ইহাকে ও খোদার আদেশ
 এবং নিষেধ আজ্ঞা সমূহকে প্রতিপালন করাকেই ইমান কহে ।
 এতদ্ সমূহের প্রতি ভক্তি সহকারে বিশ্বাস ও তদনুরূপ কার্যা
 না করিলে ইমান কামেল হইতে পারে না অর্থাৎ পূর্ণতা
 প্রাপ্ত হইবে না ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ইসলামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খোদার বন্দেগী ।

১ । জগতে এমন কোন ধর্ম নাই যে তাহাতে ঈশ্বরের
 আরাধনা ও উপাসনা নাই এবং এমন কোনও ধর্মযাজক
 হন নাই যে তিনি আপন মতাবলম্বিগণকে নিরাকার ঈশ্বরের
 আরাধনা ও উপাসনার জন্ত আদেশ ও উপদেশ দেন নাই ।

তবে নাস্তিক বা তদ সদৃশ ব্যক্তিগণের কথা পৃথক, কারণ তাহাদের কোন ধর্মই নাই । তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না । এরূপ সম্প্রদায় জগতে অতি অল্প । কিন্তু অধিক সংখ্যক ধর্মযাজক বা মহাপুরুষগণ যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ও তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন অবশ্যই সেই চৈতন্যস্বরূপ, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, খোদাওন্দ করিমের আরাধনা ও উপাসনা করা ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য । এক্ষণে ধর্মভেদে, ধর্মগুরুগণ আরাধনা ও উপাসনার প্রক্রিয়া ও প্রণালীর বিভিন্নতা করিয়া দিয়াছেন মাত্র । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ নমাজ । এই পবিত্র নমাজের জন্য ঈশ্বরের দৃঢ় আদেশ আছে এবং তাহা দিবা ও রাত্রে পাঁচ সময়ে ৫ বার সম্পন্ন করিবার আদেশ হইয়াছে । তিজ্জাত ইহাকে পঞ্জগানা নমাজ কহে । ইহা প্রত্যেক মুসলমান বয়ঃ-প্রাপ্ত পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে ফর্জ্জ অর্থাৎ ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় আদেশ । ইহা সম্পন্ন করিতে সকলেই বাধ্য । পবিত্র নমাজের জন্য কোরাণ শরিফের সূরায়ে ফাতেহা এবং আয়েতে পাক না পড়িলে নমাজ হয় না । কেহ না জানিলে অথবা কেহ সহজে ও শীঘ্র মুখস্থ করিতে না পারিলে তাহার শিক্ষাকাল পর্য্যন্ত অথবা যে কোন ভাষাতে হউক না কেন পবিত্র কোরাণ শরিফের তরজমাতে ও নমাজ পড়িতে হইবে । ইহা দুই প্রকার, খোদার আদেশ এবং মহম্মদ মুস্তাফার আদেশ ও ব্যবস্থা । খোদার আদেশকে ফর্জ্জ কহে, রসুলের আদেশকে শুন্ন ও ওয়াজেব

কহে । সুন্নৎ দুই প্রকার, মওকেদা ও গএর মওকেদা । সুন্নতে মওকেদা নমাজ পড়িতেই হইবে, ছাড়া যাইতে পারে না, গএর মওকেদা পড়িতে ও পারা যায়, এবং ছাড়িতেও পারা যায় । এইরূপে ওয়াজেব নমাজকে পড়িতেই হইবে, ইহার গুরুত্ব করজ নমাজের নিম্নে হইতেছে । অন্যান্য যে সকল নমাজ আছে তাহা সকলই নফল নমাজ । ইহা পড়িতে পারিলে সওয়াব, না পড়িলে অজাব বা মন্দ নহে । এই প্রকার বিভিন্নতা জনাব রসুলে করিমের দঃ ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া ও তাঁহার আদেশ ও ব্যবস্থানুযায়ী হইয়াছে । করজ, সুন্নতে মওকেদা ও ওয়াজেব নমাজ না পড়িলে খোদার দরগাহে গোনাহগার হইতে হইবে, কারণ ইহা তাঁহার ও তাঁহার রসুলে পাকের আদেশ । যে বাহার আজাব হইয়, তাহার উচিত যে, আপন আজাকারীর আজানুসারেই কার্য করে । ইহ সংসারেই যখন কেহ আপন মুনিবের আদেশ প্রতি পালন না করে, তজ্জন্য সে দণ্ড ভোগ করিয়াই থাকে, তখন স্বয়ং খোদাওন্দ করিমের ও তাঁহার রসুলের আদেশ পালন না করিলে যে, সে দণ্ডনীয় না হইবে, ইহার কোনই কারণ নাই, দণ্ডভোগ করিতেই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । যুক্তিতেও ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং শাস্ত্রও ইহাই ব্যক্ত করিতেছে । অতএব এই নমাজের আদেশ প্রতিপালন না হইলে ইহার দণ্ড লঙ্ঘন হইবার নহে । যখন যে অবস্থাতে থাকা থাকি না কেন এমনকি শয্যাগত শীড়িত থাকিলেও অন্তঃ পক্ষে ইহা

আমরা বাধ্য । ইহাতে কখন কাহারও অবহেলা বা কাহেলী করা অনুচিত ।

উর্দু ।

করো বন্দেগী আল্লাহ কি আয় মোনিনো ।
হুকমৈ কোরান ও রসুল কি মানলো ॥
ন হোগা শাকি তোমহারা শাকিয়ে মহশর ।
হুকম উসকা তুম ন মানো অগর ॥
এহ ন কহতা হায় অহকরে সমিন দিঁ ।
হুকম অল্লাহকা হায় এহ বিল একি ॥

সাধারণ বাঙ্গালার অনুবাদ ।

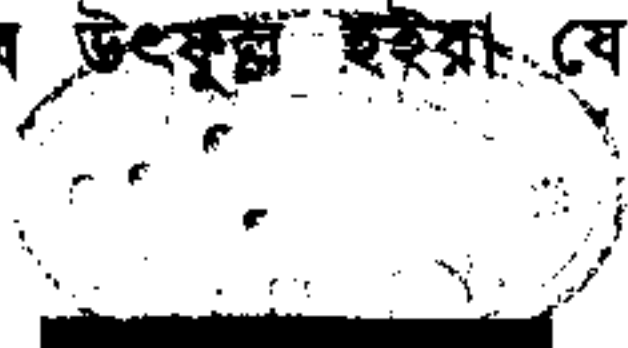
করহে বন্দেগী আল্লার ওহে মোমিন ভাই ।
কোরাণ ও রসুলের আদেশ মানহে সবাই ॥
রোজ হশরেতে মদদ পাইবে না হে আর ।
যদি হে আদেশ পালন না করহ তাঁহার ॥
দীন, হোম সমিন না কহে হে নিজে ।
এই হুকুম আল্লার আছে হে কোরাণের মাঝে ॥

এই পঞ্চগানা নমাজের সওয়াব অর্থাৎ পুণ্য অত্যন্ত অধিক, ইহাতে এই পাঁচ ওক্তের নমাজে পাঁচজন নবির সমাজের সওয়াব রহিয়াছে, এই উদ্দেশেই এই পাঁচ ওক্তের সময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে । যথা—

(১ম) আদি পুরুষ হজরত আদম দঃ ও আদি মাতা মামা হওয়ার দঃ স্বর্গচ্যুত হইবার পর তাঁহারা যে সময়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন তাহা ফজরের সময় হইতেছে তাঁহারা

(২য়) হজরত ইব্রাহীম দঃ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা জন্য কাফেরগণকে উপদেশ দেওয়ায় স্বাকারবাদী কাফেরগণ তাঁহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল । ঈশ্বর যখন তাঁহাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে বহির্গত করিয়াছিলেন তৎকালে জহুরের সময় ছিল । তিনি সেই সময়েই যে নমাজ পড়িয়াছিলেন তাহাই জহুরের নমাজ হইতেছে । তাঁহার উপর এই সময়ের নমাজ ফরজ হইয়াছিল ।

(৩য়) হজরত ইয়াকুব দঃ এর কনিষ্ঠ পুত্র হজরত ইউসুফ দঃ অত্যন্ত সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন এবং তিনি ওলি ছিলেন । এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন । হজরত ইউসুফের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ইর্ষাবশতঃ তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্যে এক কূপে নিক্ষেপ করিয়া দেয় । ঈশ্বর তাঁহাকে তথায় রক্ষা করেন । কিছু দিনের পর একজন বণিক জলের আশায় তথায় যায় ও তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করে এবং তাঁহাকে আপন কৃতদাসস্বরূপ লইয়া গিয়া মিসর অর্থাৎ ইজিপ্ট দেশে বিক্রয় করে । তথায় তিনি ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজ বিদ্যা এবং বুদ্ধি বলে মিসর দেশের রাজার মন্ত্রিত্বলাভ করেন । অর্থাৎ অজিজ মিসর হন । এখানে তাঁহার পিতা তাঁহার অদর্শনে ও বিরহে অন্ধ হইয়া যান । কিছু দিবস পরে এক সময়ে ঈশ্বরাদেশে হজরত জীবরাইল দঃ আসিয়া হজরত ইয়াকুব দঃ কে হজরত ইউসুফের দঃ শুভ-সংবাদ দেন, সেই সময়ে অসরের সময় ছিল, তিনি আনন্দোৎসবে উৎকৃষ্ট হইয়া যে নমাজ পড়িয়াছিলেন



তাহাই আসরের নমাজ হইতেছে, তিনি সেই অবধি এই সময়ে এই নমাজ পড়িতেন । ইহারা উভয়েই পয়গম্বর ছিলেন ।

(৪র্থ) জনাব হজরত দাউদের দঃ ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন তাহার উপরও তিনি অপর এক জনের স্ত্রীর রূপে বিমুক্ত হইয়া তাহার প্রাণবধের বাসনায় তাহাকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন । তথায় সে হত হইয়া গেলে তাহার বিধবা স্ত্রীকে আপন পত্নীত্বে গ্রহণ করেন । এই পাপের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে ধৃত করেন ও কিছু কাল পরে তাঁহার এই পাপ মোচন হয়, তৎকালে তিনি খোদার নমাজ পড়েন, সেই নমাজের সময় মগরব ছিল এবং তদবধি তিনি সেই সময়েই নমাজ পড়িতেন ।

(৫ম) হজরত ইউনুস দঃ পয়গম্বরের সময়ে স্বাকারবাদী কাফেরগণ তাঁহার উপদেশ অনুসারে নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার না করা ও তাঁহার অবমাননা করায় তিনি তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদের উপর খোদার গজব অর্থাৎ অভিসম্পাত, নাজেল অর্থাৎ অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করেন । তিনি খোদার নবি ছিলেন তাঁহার প্রার্থনা অমোঘ বা অব্যর্থ, অতএব তাঁহার সেই প্রার্থনা ঈশ্বর সমীপে মঞ্জুর হইয়া যায় । তিনি সেই অঈশ্বরবাদী কাফেরগণকে জানাইয়া দেন যে, অমুক দিবসে তোমাদের উপর নিরাকার ঈশ্বরের গজব নাজেল হইবে, এই বলিয়া তিনি আপন স্ত্রী ও পুত্র সহ তথা হইতে স্থানান্তরে পলায়ন জন্য যাত্রা করেন । পথিমধ্যে এক নদী পড়ে সেই নদী পার হইবার সময় বিস্তর ঝড় ও তুফান আরম্ভ হয়, তদ্বারা নৌকা ডুবু ডুবু

হইবার উপক্রম হইতে থাকে, এমন সময়ে আরোহীগণের মধ্যে সকলে মিলিয়া সাব্যস্ত করে যে আমাদের মধ্যে কেহ হয়ত বিশেষ গুণাহগার আছি, না হয় কোন কৃতদাস আপন মুনিবের অধিকার হইতে পলাইয়া আসিতেছে, তাহাকে নোকা হইতে এই নদীতে নিক্ষেপ না করিলে অপর সকলের প্রাণ রক্ষার উপায় নাই । এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই স্থানে কোরা অর্থাৎ সকলের নাম লইয়া স্মরতী করিতে লাগিলেন, তাহাতে বারম্বার হজরত ইউনুসেরই দঃ নাম উঠিতে থাকে তখন তিনি বলিলেন বাস্তবিক সত্যসত্যই আমি আপন মুনিব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিনা আদেশে পলাইয়া আসিতেছি, অতএব আমি মহাপাপী, এরূপ স্থলে এত লোকের প্রাণরক্ষার্থে আমাকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা কর্তব্য । তাহাতেই তিনি জলে নিক্ষিপ্ত হন । এমন সময়ে এক মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া যায়, কএক দিবস পরে সেই মৎস্যকে আর এক বৃহৎ মৎস্য গিলিয়া যায় ; হজরত ইউনুস দঃ এইরূপে ৪০ দিবস কাল মৎস্য গর্ভেই থাকেন । ঈশ্বর রক্ষা কর্তা, ইহা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র বা অসম্ভব কি । ঈশ্বর তাঁহাকে নির্বিঘ্নেই রাখিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি এই দোয়া অর্থাৎ মন্ত্র সতত পাঠ করিতেন ।

আরবি ।

“লা এলাহা ইল্লা অস্তা সোবহানেকা

ইন্নি কুনতো মিনজ জোয়া লেমিন ।”

এই দোয়ায়ে পাকের অশেষ গুণ, ইহারই গুণে ও ঈশ্বর

আদেশে সেই মৎস্য হজরত ইউনুস দঃ কে উদ্ধার করিয়া দেয় । তিনি সমুদ্রের মধ্যে এক স্থানে এক চড়াতে স্থান প্রাপ্ত হন । ঈশ্বর তথায় একটি কদু অর্থাৎ লাউ গাছের সৃষ্টি করেন । হজরত ইউনুস দঃ তাহারই ছায়াতলে থাকিতে লাগিলেন । কিছু দিন পরে রৌদ্রের উত্তাপে সেই কদু গাছটি শুকাইয়া যায়, তখন তিনি ঐ গাছের জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করেন তৎকালে ঈশ্বরের আদেশ হইল যে, তুমি এক্ষণে অতি সামান্য গাছের জন্য আক্ষেপ করিতেছ, কিন্তু এক সময়ে নিরীহ ও নির্বোধ মনুষ্যগণকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে না পারিয়া ও তাহাদের মূল্যবান জীবনের জন্য চিন্তা না করিয়া উহাদের উপর গজব নাফেল নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলে । তখন তিনি আপন পাপ ও পাপের প্রতিকূলের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া তওবা অর্থাৎ অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার তওবা মঞ্জুর হইল । তৎকালেই এশার সময় ছিল এই এশার সময়ে তাঁহার প্রতি চারি রেকাত নমাজ ফরজ হয় ও দেশে গিয়া মনুষ্যগণকে শিক্ষার জন্য আদেশ হয় । তখন তিনি দেশে গিয়া দেখিলেন কথিত দিবসে যথাসময়ে গজবের লক্ষণ দেখিতে পাইয়াই সকলে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তাঁহাকে তদবধি খোদার সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে এবং এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে ও গজব হইতে সকলেই রক্ষা পাইয়াছে । তখন তিনি আপন মতাবলম্বীগণকেও সেই এশার সময়ে নিরাকার

আদেশ করেন। সেই এশার নমাজ আমার পবিত্র রসুলে পাকের দঃ উপর ও ফরজ হইয়াছে। এইরূপে এই পাঁচ সময়ের নমাজ পড়া হইয়া থাকে। কখন, কাহারও কোন না কোন কারণে কোন নমাজ কজা অর্থাৎ সময়াতীত হইয়া গেলে অথো কজা নমাজ পড়িতে হয়। সুন্নত নমাজের কজা পড়া যায় না। কেবল ফরজ নমাজেরই কজা পড়া যায়।

২। সুস্থশরীরে থাকিলে রমজানের রোজা রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই বাধ্য, ইহাও খোদায়ে পাকের আদেশ অনুযায়ী ফরজ হইতেছে। ইহাকে কখন ভয় বা তাচ্ছিল্য করিয়া অবহেলা করা কাহারও উচিত নহে, এবং অসুখ হইতে পারে এই ভাবিয়াও ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। পূর্ব হইতে অসুখ বা পীড়া হইয়াছে অথবা রোজা রাখিবার পর পীড়া হইয়া গেল তৎকালে রোজা রাখিতে পারা যায় না। কোন দূরদেশে বা বিদেশে গমন করিলে তাহার ব্যবস্থাও তাহাই, কিন্তু এই নিমিত্তও যে কয়টি রোজা কজা হইবে পবিত্র রমজানের পরেই তাহা পূর্ণ করিতে সকলে বাধ্য, এইরূপে রোজা না করিলে খোদার নিকট সঙ্গিন গোনাহগার ও পবিত্র আদেশ লঙ্ঘনের নিমিত্ত গুরুতর দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। পবিত্র রমজানমাসে স্ত্রীলোকগণের শরীর অশুদ্ধ হইলে তাঁহাদের সেই কয় দিবসের জন্য রোজা কজা করিবার আদেশ খোদায়ে পাক প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারে শিক্ষার্থী বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণের উপরও রোজা কজা করিবার আদেশ আছে।

৩। পবিত্র রোজা কষ্টকর বলিয়া মনে একটা মিথ্যা ভয় ও ধারণা না করিলেই পবিত্র রমজানের রোজা সচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে নির্বাহ হইয়া যাইবে। এই 'রোজাতে' অশেষ উপকার আছে। ঈশ্বর জগতে যাহা কিছু করিয়াছেন সমূহ বিষয় আমাদের উপকারের জন্যই করিয়াছেন। তদনুরূপ ইহাতে যদি আমাদের উপকার না রাখিতেন তবে আমাদের প্রতি ইহার আদেশ করিতেন কেন। মন্দ হইলে কখনই সে আদেশ করিতেন না। স্থূল কষ্টায় ইহার উদ্দেশ্য ও কারণ খোদাতালাই জানেন। ইহার ব্যবস্থা এই যে, রোজা করিয়া দিবাভাগে ভোগ, উপভোগ, পান, স্ত্রী-লোকের সহিত কাম-ভরে আলিঙ্গন বা চুম্বন, এমন কি অতিরিক্ত আমোদ বা আহ্লাদ ও বিলাসিতা নিষেধ। ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ, রক্তনিষ্করণ, বমণ অথবা উদগার ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা ও রাত্রিকালে বরাদ্দ নমাজ আদায় করা এবং অপরাপর এবাদতে মগ্ন থাকা রোজার প্রধান অঙ্গ হইতেছে। এইরূপে একমাস-কাল ক্রমাগত দেহ ও মনকে পবিত্র রাখিলে মনুষ্যের প্রধান শত্রু নফস অর্থাৎ ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎস্য) দমন হইবে ও নানা কু-কার্য হইতে বিরত থাকিতে পারা যাইবে। শরীর শুষ্ক হইয়া শারীরিক গ্লানিসমূহ বিদূরিত হইবে এবং খোদা ও রসুলের প্রতি ভক্তি ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকিবে। কোন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন—

বাঙ্গালা ।

“কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি যত রিপুচয়,
তোমার পরশ মাত্র সবে হয় লয় ।
মানবের পাপরাশি করিতে হরণ,
আনিল তোমায় নবি করিয়া যতন ।
হতভাগা সেই জন না চিনে তোমায়,
বঞ্চিত পরম ধনে সংসার মাজায় ।
সাদরে তোমায় যেই না করে পালন,
মোসলেম বলিয়া গণ্য নহে সেই জন ।”

রোজা রাখিয়া রাত্রিকালে যাহাতে পবিত্র নমাজ ও এবাদৎ অর্থাৎ আরাধনা হইতে না পারে ও আলস্যতা আসিয়া না পড়ে, দিবসে অজীর্ণতা যাহাতে না হয় ও শরীর সুস্থ থাকে, এইরূপ ভাবেই রাত্রে আহাৰ করা কর্তব্য । সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, কষ্ট না হইলে সুখ হয় না । ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের সুখ ও সচ্ছন্দতার জন্যই খোদাওন্দ করিম এই মহোপকারী ব্রতের আদেশ করিয়াছেন । ইহার কঠোরতা যেমন গুরুতর, তেমনই এতদজনিত কারণে আমাদের ইহকাল ও পরকালের পরিণামফলও যে ততই সুমধুর না হইবে ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই ।

৪ । পবিত্র নমাজের প্রধান অঙ্গ উজু (হস্তপদাদি ধৌত করাকে উজু কহে) উজু না করিলে নমাজ হইবে না । শরীর পাক অর্থাৎ পবিত্র থাকিলেও উজু করিতেই হইবে । ইহাই খোদার আদেশ । ইহার মধ্যে হাত, মুখ ও পা ধৌত করা এবং

মাথায় মসা করা অর্থাৎ ভিজা হাত বুলাইয়া দেওয়া ও দাড়ী ঘন থাকিলে তন্মধ্যে ভিজা অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দেওয়া ফরজ হইতেছে । এই উজুর অবশিষ্ট ক্রিয়া সমূহ সুন্নত । উজু করিয়া উজু অক্ষুন্ন রাখিতে না পারিলে নমাজ হইবে না । বাহা, প্রস্রাব, বায়ুনিঃসরণ, স্ত্রী-লোকের সহিত আমোদ ও কামভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন, হারামবস্তুর আশ্রাণ, অস্বাদন বা স্পর্শন, ব্যমি বা উদগার, রক্তনিঃসরণ ও নিদ্রাভিভূত হওন এমন কি অকথ্যকথন অর্থাৎ গালি প্রয়োগ, অন্যায় ক্রোধ প্রকাশ, অতিরিক্ত হাসি ও মিথ্যা কথা বলিলেও উজু নষ্ট হইয়া যাইবে । এতদ্ব্যতীত স্ত্রী বা পুরুষের সতর (শরীরের যে অংশ সতত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা আছে তাহাকেই সতর কহে) দর্শন অর্থাৎ তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িলে উজু নষ্ট হইবে । পুরুষের কোমর হইতে হাঁটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত (যাহাকে “সতরে আওরত” বলা যায়) ও স্ত্রী-জাতির সমূহ অঙ্গই সতর হইতেছে । ইহার মধ্যে কাহারো কোন স্থানের বস্ত্র সরিয়া গেলে বা ইহার কোনও স্থানে নিজের বা অপরের দৃষ্টি পড়িলে উজু নষ্ট হইয়া যাইবে । ইহার কারণ এই যে সতত সতরে বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ । তবে বিশেষ আবশ্যকতার সময় ইহার বস্ত্র উন্মোচন করিতে পারা যায়, তাহাও যেন অপরে কেহ দেখিতে না পায় । এক্ষণে ভাবা উচিত এই এক উজুতেই আমাদের মঙ্গলের জন্য খোদায়ে রহীমের কতই মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে ও আমাদেরকে কতই অমঙ্গল-

আছে—যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক উজুতে পাঁচ ওক্তের নমাজ পড়েন তিনি বহিস্তি অর্থাৎ স্বর্গবাসী হইবেন । এই উজুর আশেষ ফজিলৎ অর্থাৎ সৎগুণ রহিয়াছে । শারীরিক ক্লান্তি যতই হউক না কেন, উজু করিলেই ক্লান্তি দূর হইয়া শরীরে শান্তি আসিয়া স্থান পায় । আরাধনা, উপাসনা কিম্বা সাংসারিক কার্যে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ হয় । এই একমাত্র উজুকে রক্ষা করিয়া বহিস্তি হইবার বাসনা করিতে হইলে আহাৰ, নিদ্রা, আচার, ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য পড়িবে । একমাত্র আহাৰের নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলে ‘উজু’ অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং শরীরও সুস্থ থাকিবে । শরীর সুস্থ থাকিলে আয়ুঃ বৃদ্ধি হইবে । এইরূপে আচার ও ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিলে আমাদের প্রধান শত্রু রিপু সমূহের দমন হইবে । রিপু দমন করিতে পারিলে সংসারের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে । এই প্রকারে উজুসম্বন্ধে আরও বিস্তর নিয়ম আছে । কেবলমাত্র জলের দ্বারাই যে উজু হইবে অন্য কোন প্রকারেও যে উজু হইবে না এমন নহে । জল অভাবে অথবা কোনও বিশেষ কারণবশতঃ পবিত্র উজুর ক্রিয়া পাক অর্থাৎ পবিত্র মৃত্তিকা অথবা ধূলির উপর হস্তদ্বয় স্থাপন করিলে যে পরিমাণে ধূলী বা মাটি হাতে লাগিবে তাহার দ্বারা পবিত্র উজুর ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে । ইহাকেই “তাইয়ামুম” কহে । খোদায়েপাক আপন কলাম মুজিদে ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । উজু ও তাইয়ামুম মধ্যে প্রভেদ এই যে উজু করিবার সময় নিয়ৎ ফরজ নহে, কিন্তু তাইয়ামুম কালে নিয়ৎ ফরজ

হইতেছে । উজুতে যে সমস্ত ক্রিয়া ফরজ হইতেছে তাইয়ামুমকালে তাহার সকলই আদায় করিতে হয় না । ইহাতে প্রথমে মুখে একবার ও উভয় হাতে এক একবার ধূলির দ্বারা মসা করাই ফর্জ । প্রথমবার ধূলিতে উভয় হস্ত নিক্ষেপ করিয়া মুখে মসা করিতে হইবে । দ্বিতীয়বার সেই ধূলিতে পুনরায় উভয় হস্ত নিক্ষেপ করিয়া অগ্রে বাম হস্তের ধূলির দ্বারা দক্ষিণ হস্তের কুণ্ডল পর্য্যন্ত হস্ত-নালীর উভয় পার্শ্বে একবার মসা করিতে হইবে । তৎকালে দক্ষিণ হস্তের ধূলি যেন মুছিয়া না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তাহার পর সেই দক্ষিণ হস্তের ধূলির দ্বারা পূর্ববৎ বাম হস্তের কুণ্ডল পর্য্যন্ত মসা করা আবশ্যিক, ধূলিতে এই দুইবার হস্ত নিক্ষেপ ব্যতীত তৃতীয়বার হস্ত নিক্ষেপ ও অন্য কোনও অঙ্গ মসা করা নিষেধ, ইহাতেই উজুর কার্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে, কোন বিশেষ কারণবশতঃ পাকির গোসল করিতে না পারিলে এই প্রকারে মসা করিলেও গোসলের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যাইবে ও শরীর পাক বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে । মলমূত্রাদির বেগ সম্বরণ করিয়া অথবা ইচ্ছাপূর্বক স্বভাবের গতি রোধ করিয়া উজুরক্ষা করা বা নুমাজ পড়া উচিত নহে । ইহার দ্বারা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা । বিজ্ঞান ও শাস্ত্র উভয়েই ইহা নিষেধ করিতেছে । ইহাতে স্পর্শই, বুঝা যাইতেছে যে যাহাতে অনিয়ম ও অসময়ে স্বভাবের বেগ না হয় তদনুরূপ পান ও আহার করা কর্তব্য । জগৎপাতা জগদীশ্বর এই একমাত্র উজু রক্ষার নিয়মের মধ্যেই আমাদের স্বাস্থ্য ও সংসার রক্ষার সমূহ নিয়ম নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন । ধন্য তাঁহার ও তাঁহার রসুলের পাকের মহৎ উদ্দেশ্যকে ধন্য ।

৫। পবিত্র নমাজ পড়িবার সময় কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা নমাজের ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিতে হয় । জগৎপাতা জগদীশ্বরকে সম্মুখীন বুঝিয়া ভীত, শঙ্কিত ও বিনীতভাবে এবং আন্তরিক ভক্তিসহকারে ও ধীরে ধীরে অথবা এক কার্যের পর অন্য কার্যের মধ্যস্থলের সময়ে শরীরকে কিঞ্চিৎ আরাম দিয়া নমাজের কার্য সমাধা করা আবশ্যিক । রাজা, বাদসা বা হাকিমের দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে লোকে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে ও নম্রতা, হীনতা এবং ভক্তি সহকারে ভীত অবস্থায় যেরূপ বাক্য আলাপন করে এই পবিত্র নমাজকালেও তদনুরূপ করা আবশ্যিক । এই নমাজ জন্য ধনি, নির্ধন, ছোট, বড়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্ত্রী এবং পুরুষ কাহারও অব্যাহতি নাই, সকলেই ইহার জন্য খোদার নিকটে দায়ী ।

৬। নমাজের নিয়ৎ অর্থাৎ বন্দনা পুরুষের পক্ষে তহরিমাতে নাভিমূলের নিম্নদেশে বাম হস্তের কবজার উপরিস্থান দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া ধারণ করিতে হইবে । দক্ষিণ হস্তের উপর অপর তিনটি অঙ্গুলী প্রশস্তভাবেই থাকিবে । ক্ষমা-প্রার্থনার উদ্দেশে, সহস্র অপরাধের বন্দীর গায় বন্ধনাবস্তার তুল্য, তহরিমাতে হাত দুইটি বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইবে । চক্ষু বন্ধ করা নিষেধ । রুকুর সময় মস্তক যেন কোমরের নিম্নে না যায় । রুকুতে চতুষ্পদ পশুর সমতুল্যতার পরিচয় দেওয়া ও মিনতির উদ্দেশে সিজদার সময় ভূতলে দেহ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা ও ক্ষমা প্রার্থনা করাই উদ্দেশ্য । সিজদার সময় উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী দুইটি উভয়

কানের সোজা ভূমিতে রাখিতে হইবে । , অপর অঙ্গুলি প্রশস্ত-
ভাবেই থাকিবে । অহাহয়াত পাঠকালে সোজা হইয়া জানুভরে
বসা ও স্বসম্মানে অবনত মস্তকে থাকিয়া ঈশ্বরের স্তব পাঠ করাই
উদ্দেশ্য । তৎকালে পুরুষের পক্ষে বাম পদ চিৎ করিয়া তদুপরি
ভর দিয়া বসিতে হইবে । দক্ষিণ পদ খাড়া হইয়া থাকিবে ও
তাহার অঙ্গুলীগুণিন পশ্চিমমুখিন হইবে । ভক্তির নিমিত্ত
ভক্তের আসন অনুযায়ী বসাই উচিত বলিয়া এই আসনের ব্যবস্থা
হইয়াছে । বসিবার সময় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রশস্তভাবে
জানুর উপরে থাকিবে । চক্ষের দৃষ্টি বক্ষের উপর রাখিতে
হইবে । দাঁড়াইবার সময় নজর সিজদার স্থানে পড়িবে ।
পদদ্বয় চারি অঙ্গুলি ব্যবধান থাকিবে । রুকুর সময়ে নজর
পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখিতে হইবে । সিজদার সময়ে অগ্রে
নাসিকার অগ্রভাগ ভূস্পর্শ করিয়া পরে মাথা ভূমে সংলগ্ন করিতে
হইবে । মাথা তুলিবার সময় অগ্রে নাকের অগ্রভাগ ভূস্পর্শ
করিয়া পরে মাথা তুলিতে হইবে । ক্ষমা প্রার্থনা জন্য নাকখত
খাওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ মিনতি হইতেছে । ইহার উদ্দেশ্যও
তাহাই । সিজদার সময় নজর নাকের পৃষ্ঠদেশের প্রতি
থাকিবে । সিজদাতে মস্তক এরূপ ভাবে ভূমে সংলগ্ন করিতে
হইবে যেন, কোন প্রকার ক্ষুদ্র জীব সিজদার স্থানে আসিয়া
পড়িলে তাহাও যেন বিনষ্ট না হয় । সিজদার সময় পা দুইটি
ভূমে সংলগ্ন থাকা আবশ্যক । কোনও পা যেন শূন্যে উঠিয়া না
পড়ে । ইমামের পশ্চাতে নমাজ পড়িবার সময় মোকতেদিকে

কার্যে কখন মোকতেদির অগ্রগামী হওয়া বড়ই দোষ তাহা নিষেধ, গুনাহগার হইতে হইবে । নমাজের সময় কোন প্রকার চিন্তা বা আলোচনা মনোমধ্যে স্থান দেওয়া অকর্তব্য । তাহাতে নমাজ দুরন্ত হইবে না । মন কেবল মাত্র পাঠেই নিবিষ্ট থাকা আবশ্যক । কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়া গিয়াছেন—

পাশী ।

“জব্বা দর জিকরে দর দিল ফিকরে থানা
চে হাসিল জি” নমাজ পঞ্জ গানা ।”

ইহার অর্থ এই যে মুখে নমাজ ও মনে ঘরের চিন্তা একপক্ষ নমাজে কোন ফল হয় না । মওলানা সাদি বলিয়াছেন—

পাশী ।

“বর জব্বা তসবিহ ও দর দিল গাও খর
ই চুনি তসবিহ কায় দারদ অসর
সদ তমনা দর দিলস্ত আয় বুল ফজুল
কায় কুনদ নুর হক দর দিল নজুল”

ইহার অর্থ এই যে মুখে ঈশ্বরের নাম ও মনে গরু ও গাধা । এপ্রকার নামে কি ফল । হে অজ্ঞ, মনোমধ্যে এত বাসনা রাখিলে তথায় ঈশ্বরের জ্যোতি কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হইবে । অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে রূপ রূপ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যত শীঘ্র হয় ঠিকার কার্যের গায় এই পবিত্র নমাজের ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অগ্নায় । নমাজকালে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বাক্যের দ্বারা কোন প্রকার হরকাত নিষেধ । নমাজের জন্ত

নিয়ৎ করিবার পর হইতে সলাম পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন প্রকার বাধা বা বিঘ্ন ঘটুক না কেন নমাজের নিয়ৎ ভগ্ন করা বা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এমন কি মনোনিবেশ করা নিষেধ । কায়, মন ও বাক্যের সহিত স্তুতি, মিনতি ও ভক্তি করাই আরাধনা ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ । এই নমাজ সম্বন্ধে আরও এই প্রকার অশেষ নিয়ম আছে । উচ্চ আসনোপরি উপবেশনপূর্ব্বক আরামের সহিত উপাসনা করা অথবা গাম্ভীর্য বাস্তাদির দ্বারা আমোদ ও আহ্লাদে নিমগ্ন হইয়া উপাসনাকে উপাসনা বা আরাধনা বলা যাইতে পারে না । আরাধনা ও উপাসনার যেরূপ সুন্দর নিয়ম ও ব্যবস্থা আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে আছে তদ্রূপ কোন ধর্ম্মে নাই । কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এবং কত প্রকার বিনীতভাবে আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে যেমন উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমন অন্য কোনও ধর্ম্মে হয় না । কোন কোন বিধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি আমার এই পবিত্র নমাজ ক্রিয়াকে ব্যায়াম বিশেষ বলিয়া আখ্যা করেন, যদিও ইহাকে ব্যায়াম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে ক্রীড়া বা সখের ব্যায়াম কিছুকাল অভ্যাস করিয়া লোক পরে ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে স্বাস্থ্যের বিস্তর অনিষ্ট ঘটে কিন্তু আমার এই পবিত্র নমাজের ক্রিয়াকে সামান্য ব্যায়াম কার্য্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে মনুষ্যের যৌবনাবস্থার আরম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একই নিয়মে, অনিবার্য্য রূপে, প্রত্যহ নির্দ্ধারিত কালে সম্পন্ন করিতে হয় । ইহা যে আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কতই সুখকর ও মহোপকারী তাহা বর্ণনাভীত । ইহাতে ইহকাল ও পরকাল

উভয় কালেরই মঙ্গল সাধিত হইতেছে । অতএব এইরূপ মহোপকারী পবিত্র নমাজের প্রতি অবহেলা করা কাহারও কর্তব্য নহে । ইহাতে দেহ, মন ও প্রাণ সমুদয়ই বিশুদ্ধ থাকে । এই নিমিত্তই ইহার প্রতি খোদায়ে পাকের আদেশ । অতএব ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করা আমাদের কর্তব্য । এই পবিত্র নমাজ আদির ক্রিয়াসমূহ ও যাবতীয় বিবরণ জনাব মোলবি আবদুর রহিম সাহেব কৃত “নমাজতত্ত্ব” ও “ইসলাম” আদি সুবিখ্যাত গ্রন্থে সুন্দররূপে ও বিস্তীর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে । অনেকে হয়ত আপন মানসিক দুর্বলতা বশতঃ পবিত্র নমাজ কালে সাংসারিক চিন্তাসমূহকে মন হইতে বিদূরিত করিতে পারেন না । তাঁহার সেই চিন্তাসমূহ নমাজের সময়ে আসিয়া পড়ে । এই অলিক চিন্তার গতিরোধ করিতে পারা যায় না বলিয়া ঈশ্বরাদেশের অবহেলা ও ত্রুটি করা অর্থাৎ নমাজ না পড়া কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে । এই পবিত্র আদেশের বশবর্তী হইলে, খোদা ও রসূলের প্রতি ভক্তি ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকিবে ও তদসহ মানসিক সবলতা দৃঢ়তর হইতে থাকিয়া এই পবিত্র নমাজ সময়ের অলিক চিন্তাসমূহ হইতে অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইবে । কোন আদেশ সম্পূর্ণরূপে তামিল না করা অপেক্ষা অসম্পূর্ণভাবে তামিল করিলে স্বভাবতঃ হাকিমে কিঞ্চিৎ দয়া ও অনুগ্রহ করিয়াই থাকেন কিন্তু কোন আদেশের সম্পূর্ণ অবহেলা ও অবমাননাকারীর প্রতি কখন কোন হাকিমই দয়া করেন না । যদিও কেহ মানসিক দুর্বলতাবশতঃ পবিত্র নমাজকালে মনকে নিশ্চিন্ত করিতে না পারায় সে নমাজে কোন

ফল নাই বরং অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে এই ভাবিয়া মিথ্যা ভয় করেন তাহা তাঁহার ভ্রম ও দোষ । এই ভাবিয়া এই পবিত্র আদেশের বিপরীত কার্য্য করা অর্থাৎ নমাজ ত্যাগ করা কোনই জ্ঞানবান ব্যক্তির কার্য্য নহে । কোন ঈশ্বরভক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—

উর্দু ।

“জাহেদ ডরাতা হার মুঝে নারে জহীমসে
কেয়া মায় বন্দা নহি হওঁ খোদায়ে রহীমকা”

ইহার অর্থ এই যে নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ আমাকে নরকের ভয় দেখাইতেছেন, তাহাতে আমি অবশ্যই বলিতে পারি যে, আমি কি সেই পরম দয়ালু ও দয়ারসাগর ঈশ্বরের সৃষ্টজীব নহি ? তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি আমার অসংখ্য দোষ দেখিয়াও দয়া করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেছেন না । তিনি অবশ্যই ইহার পরও আমার প্রতি দয়া করিবেন । তাঁহার আদেশের অসম্পূর্ণতা জন্য কখনই তিনি জহন্নমের অর্থাৎ নরকের কঠোর দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না । আমরা অনেকে এই সব বিষয় উত্তমরূপে জানিয়াও আপন সংসারস্থখে একরূপভাবে নিমগ্ন থাকিতেছি যে, আপন সাংসারিক সময়কে ক্ষণকালের জন্যও আপন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সেই মহান সর্ববশক্তিমান ঈশ্বরের আদেশ পালনে অবহেলা এবং আমার পাক পয়গম্বরের দঃ আদেশের অবমাননা করিয়া এই পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করি

সকলেই স্বীকার করিবেন । অজ্ঞ ও মূর্থ ব্যক্তিগণ যাহারা কিছুই জানে না ও বুঝে না তাহাদের দ্বারা অবহেলা বা ত্রুটি অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া সকলেরই নিকট গণ্য । এই জ্ঞানকৃত অপরাধ ও অজ্ঞানকৃত দোষের দণ্ডবিধানের তারতম্য যখন আমরা ইহসংসারের বিচারেই বিচারকের নিকট দেখিতে পাই তখন আমরা আপন জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সর্বপ্রধান বিচারক ঈশ্বরের সমীপে কেননা কঠোরতর দণ্ডের অধিকারী হইব । এই পবিত্র কার্য্য জন্য অন্ততঃ পাঁচ মিনিট মাত্র সময় হইতে উর্দ্ধ সংখ্যা সময় বিশেষে ১০।১৫ মিনিট মাত্র সময় অপেক্ষা অধিক সময় কোন ক্রমেই লাগিতে পারে না । এই অতি সামান্য সময়ের জন্য কিঞ্চিৎ অলসতা ত্যাগ করিয়া আমরা আপন আপন খোদা ও রসুলের আদেশ পালন করিলে, কেহ আমাদেরকে ভাল না বলিয়া কখনই মন্দ বলিতে পারিবে না । ইহাতে আমাদের পরকালের সুখ ও ইহকালের অশেষ প্রকার মন্দ কার্য্য হইতে রক্ষা পাইয়া অপরিসীম শান্তি লাভ হইতে পারিবে । অধিকাংশ সময়ে আমাদেরকে বিধর্ম্মাবলম্বীগণের সঙ্গে ও সহবাসে থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের গুণ অধিকার করা এবং তাহাদের আচার ও ব্যবহার অনুকরণ করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে ভাবা ও আপন খোদা ও রসুলকে ভুলিয়া যাওয়া এবং তাহাদের পবিত্র আদেশ তামিল না করা কখনই আমাদের পক্ষে পবিত্র ইসলামের পরিচয় হইতে পারে না, স্বধর্ম্ম-পরায়ণতায় সুদৃঢ় দেখিতে পাইলে কখন কোন ধর্ম্মাবলম্বীও আমাদেরকে মন্দ বলিতে পারিবেন না বরং অন্তরের সহিত

ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে ভাল বাসিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না । অপরের সহিত মিসিতে হয় ভাল, কিন্তু আপন কর্তব্যে ত্রুটি করা সৎ ও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ; স্বধর্ম্মে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইলে বিজ্ঞ বিধর্ম্মাবলম্বিগণ ও প্রকাশ্যে যদিও নহে অন্তরের সহিত অবশ্যই অবিশ্বাস করিবেন । এরূপস্থলে আপন ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নহে । অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষগণ আপন আপন পাছুকা পা হইতে স্থলন না করিয়া পবিত্র মসজিদে যাইতে পারেন এবং পবিত্র নমাজ ক্রিয়া সম্পন্নও করিতেও পারেন । তদনুসারে আমাদের মধ্যেও কাহারও কোন বিশেষ কারণ হইয়া উঠিলে বা থাকিলে কিম্বা পাছুকা নূতন এবং কোন অপবিত্র দ্রব্যে বা স্থানে সংযোষিত কি ব্যবহৃত না হইলে তিনি সেই পাছুকা পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র নমাজ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন ।

৭। খোদায়ে পাক ও রসুলে মকবুলের দঃ আদেশ অনুসারে বৎসরান্তে পবিত্র বকরিদের দিবস হস্তগত গচ্ছিত অস্থাবর, ধনসম্পত্তির ও পশ্বাদির মূল্যের উপর শতকরা ২।০ আড়াই টাকা হিসাবে দান করা কর্তব্য । ইহাকেই জকাত কহে । জকাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন নাই । বকরিদের দিবসেই যে জকাত দিতে হইবে অন্য কোন দিবসে জকাত দিলে যে হইবে না, এমন নহে, তবে যে যার হিসাব রাখিবার জন্য বৎসরের হিসাবে একদিন নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হয় । প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই এই আদেশ পালন করিতে বাধ্য । কখনই ইহার অবহেলা বা ত্রুটি করা কর্তব্য নহে । নমাজ

যে রূপ ফজ্জ, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহাও তেমনি ফজ্জ হইতেছে । বৎসরান্তে যাহার ৪০ টাকা উদ্ধৃত থাকিবে না তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ ফজ্জ নহে ।

৮ । বৎসরান্তে জকাত দিলে এত টাকা সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে বাহির হইয়া গেল, প্রতিবৎসর এরূপে টাকা বাহির হইয়া গেলে সমূহ সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া অযথা ও মিথ্যা চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দেওয়া শয়তানের কার্য্য । তাহাতে খোদা ও রসুলের দঃ বিরুদ্ধবাদী হইতে হইবে । জকাত দিলে কখন কাহারও ধন কমিবে না । খোদা ও রসুলের দঃ প্রতি-আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে, তাঁহাদের আদেশ অবশ্য ভক্তি সহকারেই পালন হইবে, তদ্বারা তাঁহারাও ভক্তের প্রতি কৃপা না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের সামগ্রী জকাতে খোদা ও রসুল দঃ আপন ভক্তকে অসংখ্যরূপে ও প্রকারে তাহার প্রতিশোধ দিতে থাকিবেন । কখন সে ভক্তের ধন কমিবে না ; বরং নানা কারণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ও তাঁহার ধন দীর্ঘ স্থায়ী হইতে থাকিবে । জকাত না দিলে খোদা ও রসুলের দঃ বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাওয়ায় কখনই তাঁহার সে ধনের স্থায়ীত্ব হইবে না । নানা কারণে অতি শীঘ্র সেই ধনের বিনাশ হইয়া যাইবে । ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ চক্ষের উপরই দেখিতে পাওয়া যায় ।

৯ । জকাত বাহির করিলে প্রথমতঃ নিজের দরিদ্র আত্মীয় অর্থাৎ যাহারা অপরের নিকট যাত্ৰা করিতে সংকুচিত হইবেন অগ্রে তাঁহাদিগকে সমুদয় করা চাই, দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাসিগণের

মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহাদিগকে প্রদান করা আবশ্যিক, শেষে অন্য দরিদ্রকে দিবার বিধি । ইহাই পবিত্র কোরাণের ব্যবস্থা । এইরূপে জকাত দিলে আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের মধ্যে সকলেই সুখী হইতে পারিবে ও সতত তাহারা মুখাপেক্ষি হইয়া ঈশ্বর সমীপে শুভ কামনা করিতে থাকিবে । দান ও খয়রাতের এরূপ মহান ও সুন্দর ব্যবস্থা পৃথিবী মধ্যে আমার এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্য ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মে নাই ।

১০ । পবিত্র বকরিদের দিবস অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে কোরবাণী অর্থাৎ বলি বা উৎসর্গ দেওয়া “ওয়াজেব” হইতেছে । ইহা খোদার নামেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহা আমার ইমাম আজমের (বর্ণনা পরে আছে) নিকট ওয়াজেব ও অন্যান্য তিন ইমামের নিকট শূন্য হইতেছে । সুন্নৎ অপেক্ষা বেশী তাকিদ যাহাতে থাকে, তাহাকেই ওয়াজেব কহে । এই কোরবাণীর জন্য আমার রসূলে পাকের দঃ সবিশেষ তাকিদ আছে, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, হাদিস শরিফ হইতেছে যে

আরবী ।

“মনকানা লছ শায়াতন ওলম

এদাহ ফলা একরাবল্লা মোসল্লানা”

ইহার অর্থ এই যে যাহার আর্থিক সম্বল থাকে, সে যদি কোরবাণী না দেয়, তবে সে যেন আমার মসজিদের দিকে না আসে । এইরূপ গুরুতর আদেশকে অবহেলা বা ত্রুটি করা কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে, তাহাতে গুনাহগার হইতে হইবে ।

এই নিমিত্ত ইহা আমার ইমাম আজমের নিকট ওয়াজেব বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গৃহস্থিত প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী, বালকও বালিকার নামানুসারেই এই কোরবাণী হওয়া আবশ্যিক ও বিধি। ছাগ ও মেঘ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে নামে এক একটী জন্তু কোরবাণী হইবে। গো, মহিষ ও উষ্ট্র হইলে সাত জনের নামে এক একটী জন্তুর কোরবাণী হইতে পারিবে। এই কোরবাণীর ক্রিয়া বকরিদের দিবস ও তৎপরে তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইতে পারিবে, ইহা হজরত ইব্রাহিম দঃ এর স্মৃতি হইতেছে।* তাঁহারই অনুকরণে আমার পাক পয়গম্বর দঃ এই আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদেশ ও খোদায়ে পাকের আদেশ একই ধরিতে হইবে, কারণ খোদা তাঁহাকে কোন বিষয় আদেশ করিতে না বলিলে তিনি আদেশ করিতেন না। খোদাওন্দ করিম আমার রসূলে পাকের দঃ প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন, কোরান শরিফে আছে।

* পবিত্র কোরবাণীর ক্রিয়া সর্ব প্রথমে হজরত ইব্রাহীম দঃ এর সময়ে আরম্ভ হয়। জনাব রসূলে করিম অহমদে মুজতেবা মহম্মদ মুস্তফা দঃ হজরত ইব্রাহীমের দঃ বংশেই উদ্ভব এবং হজরত মুসাওইসা ও এই বংশ হইতে সন্তত। জনাব রসূলে করিম দঃ হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরৎ ইস্মাইলের দঃ বংশ এবং হজরৎ মুসা ও ইসা দঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হজরৎ ইসাহাকের দঃ বংশ। হজরৎ ইসাহাকের দঃ পুত্র হজরৎ ইয়াকুব দঃ, ইহার দুই স্ত্রী হইতে ১২জন পুত্র। প্রথম স্ত্রী হইতে ১০জন ও দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে ২ জন অর্থাৎ হজরৎ ইউসুফ দঃ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনিআমিন দঃ। এই হজরৎ ইউসুফ দঃ কে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে ৪ ভ্রাতার যুক্তি করিয়া কূপে ফেলিয়া দিয়াছিল। অপর ৬ ভ্রাতার মধ্যে কোন এক ভ্রাতার বংশে হজরৎ মুসা দঃ ও অন্ত কোন ভ্রাতার বংশে হজরৎ ইসার দঃ জন্ম। হজরৎ ইয়াকুবের আর এক নাম ইসরাইল হইতেছে, এই নিমিত্ত হজরৎ মুসা দঃ ও হজরৎ ইসার দঃ বংশ বনি ইসরাইল অর্থাৎ ইসরাইলের পুত্র বলিয়া পবিত্র কোরানশরিফে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

আরবী ।

“কসলে লেরনেকা উনহরু”

ইহার অর্থ এই যে আপন পরওর দেগারের উপাসনা কর এবং কোরবাণী দেও ।

১১ । পবিত্র ইদের দিবস গৃহস্থিত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা এমন কি দাস ও দাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত ফিৎরা অর্থাৎ দান করা সুন্নৎ হইতেছে । ইহা জনাব রসুলেকরিমের দঃ আদেশ ইহা প্রচলিত সেরের হিসাবেওজনি/৩৥ সাড়ে তিন সের হিসাবে মনুষ্কের সংখ্যানুযায়ী আমাদের দেশে চাউল দান করা আবশ্যিক । জনাব রসুলে করিম দঃ বলিয়াছেন ।

হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ দুই স্ত্রী বিবি সারা ও বিবি হাজরা । ইহাদের সম্বন্ধে ও হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ সম্বন্ধে কেতাবে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যে হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ পিতার নাম আজরবুৎ পরন্তু । তিনি শাম দেশে কোনও এক প্রদেশে বাস করিতেন, তখাকার বাদশাহাত্রেই নমরুদ নামে অভিহিত হইত । তৎকালিক নমরুদ সজ্জিণ কাকের ছিল এবং তাহার প্রজামাত্রেই কাকের ছিল । সেই প্রজাগণ নমরুদকেই ঈশ্বর বলিত, তৎকালে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ নক্ষত্রের গণনায় জানিতে পারিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইতি মধ্যে অশ্বদেঙ্গে কোন এক জনের একটা সন্তান জন্ম হইবে সে নমরুদের ঈশ্বরত্ব লোপ করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের একেশ্বরবাদিত্ব প্রচার করিবে এই কারণে নমরুদ অনেক গর্ভবতী স্ত্রী-লোকের গর্ভ নষ্ট করিয়া দেয় ও অনেক শিশুসন্তানগণকে হত্যা করে । সেই ভয়ে হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ মাতা আপন গর্ভ গোপন রাখিয়া কোন দুর্বর্ত্তী পর্ব্বতের গুহার গিয়া সন্তান প্রসব করেন ও সেই স্থানে আপন শিশু-সন্তানকে গোপনে রাখিয়া আঁসেন । সময়ে সময়ে তখায় গিয়া আপন সন্তানের তত্ত্ব লইতেন ও স্তনপান করাইতেন । ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন যারে কাহার সাধ্য, তিনি হজরৎ জিবরাইল দ্বারা হজরৎ ইব্রাহীম দঃ কে পর্ব্বত-গুহার মধ্যে প্রতিপালন করেন পাঁচ বৎসরকাল পর্য্যন্ত তখায় থাকেন পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে দেশে আনেন, তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ে নমরুদের অনুগামী কাকের ছিলেন, তিনি দেশে আসিবার পর ক্রমে নিরাকার ঈশ্বরের পরিচয় প্রকাশ করিতে লাগেন । নমরুদের সহিত বিবাদ হইতে আরম্ভ হয়

আরবি ।

“অস সদকতো রক্ষু ল বলা”

ইহার অর্থ এই যে সদকা অর্থাৎ দান করিলে মানুষের আপদ ও বিপদ সমূহ দূর হয় । দান খয়রাত যতই করা যায় ততই মঙ্গল । এই নিমিত্ত এই নির্দিষ্ট দিবসে খাচু দ্রব্যের দানের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, দানকরা সব ধর্ম্মেই আছে, কিন্তু এরূপ বিধিঅনুযায়ী আদেশ যুক্ত ব্যবস্থা কোন ধর্ম্মেই নাই অতএব এই পবিত্র দিবসের দানের আদেশ পালন না করিলে আপন ধনের স্থায়ীত্বও শরীরের সুখ সম্বন্ধে আশা করা যাইতে পারে না, নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে পারে এবং ঈশ্বরের নিকট গুনাহগার হইতে হইবে ।

তাহার প্রায় ১০১১ বৎসর বয়সের সময়ে নমরুদ তাহাকে প্রচ্ছলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে । ঈশ্বর রক্ষা করিলে অগ্নির ক্ষমতা কি যে কাহাকেও দক্ষ করে । হজরৎ-ইব্রাহীম্ দঃ কে সেই অগ্নি মধ্যে একাধিক্রমে চল্লিশ দিবসকাল রাখিয়াছিল তিনি তাহাতে নির্বিঘ্নেই ছিলেন । তাহাতেও কাফেরগণ তাহাকে যাহুকর বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং অসংখ্য সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করে, তখন ঈশ্বর আপন অসাধারণ ও অসীম ক্ষমতাবলে কীটাকীট মসকের সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য মসক নমরুদের ও তাহার সৈন্তগণের উপর প্রেরণ করেন, তাহাদেরই দংশনে নমরুদের সৈন্তসামন্তাদি প্রাণে বধ হইয়া যায় ও একটি মসক নমরুদের নাসিকান্ত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়া চল্লিশ দিবসকাল পর্য্যন্ত সেই মসক তাহার মস্তকে ছিল যখন দংশন করিত তৎকালে মস্তকে প্রহার করিতে হইত এইরূপে মসকের অসহ্য যন্ত্রনায় কাতর হইয়া কাফেরের মৃত্যু হয় । ইহার পর অনেকেই হজরৎ ইব্রাহীমের ধর্ম্ম অবলম্বন করে । তাহার খুড়তুত ভগ্নি বিবিসারা ও তৎকালে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন (একেশ্বর বাদিত্বকেই ইসলামধর্ম্ম কহে) তাহার পর তাহার সহিত তাহার বিবাহ হয় । কিছুদিন পরে ধর্ম্মবিস্তার উপলক্ষে ইহারা উত্তরে স্থানান্তরে যাইতে ছিলেন পশ্চিমধ্যে মিসরদেশে আসিয়া উপস্থিত হন তৎকালকার পাদশাহাত্রেই কেরাউন নামে অভিহিত হইত । তৎকালিক কেরাউন

১২। অন্যান্য নমাজ যেমন ফর্জ ও সুন্নৎ হইতেছে সেইরূপ পবিত্র ইদ ও বকরাইদের নমাজও জনাব রসুলে মকবুলের দঃ আদেশ অনুসারে সুন্নৎ অপেক্ষাও গুরুতর অর্থাৎ ওয়াজেব হইতেছে। তিনি স্বয়ং এই সব নমাজ আদায় অর্থাৎ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ও আপন উন্মৎগণের প্রতি আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে এরূপ বুঝা যাইতে পারে যে বৎসরান্তে পবিত্র রমজান শরিফের কঠোর ত্রত প্রতিপালন করত আমাদের পরম শত্রু রিপু সমূহকে দমন করিয়া মহা আনন্দ ও উৎসবের সহিত সমূহ আত্মীয়, স্বজন ও স্বজাতীয়গণ সহ একস্থানে একত্রিত হইয়া জগতের মঙ্গলাদির জন্য জগৎপাতা জগদীশ্বরের গুণগান করা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং এইরূপ সমবেত হওয়ায় পরস্পরে সম্মিলন হইয়া থাকে, পরস্পর বহুল পরিমাণে মানসিক আনন্দের স্রোত বৃদ্ধি হইয়া উঠে ও পরস্পরের সাক্ষ্যাতে এবং

অত্যন্ত কাকের ও অত্যাচারী ছিল। কোন স্থানে কাহারও হুম্মরী কস্তা বা স্ত্রীলোকের কথা শুনিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রতি বল প্রয়োগ পূর্বক তাহার সতীত্ব নাশ করিত। মিসরদেশে হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ যাইবার কিছু পূর্বে সেই অঞ্চলের কোন এক সম্ভ্রান্ত ও সম্ভ্রতিপন্ন ব্যক্তির কস্তার সৌন্দর্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া ও রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে ধরিয়া লইয়া যায়। কখন কামতরে তাঁহার প্রতি আপন কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই ঐধর তাহার হস্তধরকে অবশ করিয়া দিতেন ক্রমে হাত সরাইয়া লইলে অথবা সরিয়া গেলে ভাল হইয়া যাইত। এই প্রকারে কিছুকাল আপন আলয়ে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন কিন্তু কখনই সকল কাম হইতে পারে না। তাঁহারই নাম বিবি হাজরা ছিল। এই সময়ে হজরত ইব্রাহীম দঃ ও আপন স্ত্রী-সহ তথায় গিয়া উপস্থিত হন। বিবি সারাও রূপলাবণ্যে অত্যন্ত হুম্মরী ছিলেন কাকের ফেরাউণ তাঁহার রূপলাবণ্যের কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকেও আপন আলয়ে ধরিয়া

স্নেহালিঙ্গনে মনোমালিন্য দূর হইয়া গিয়া সৌহৃদ্যের ও একতার মূল ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করাই খোদা ও রসুলের পাকের দঃ প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু উদ্দেশ্য তত্ত্ব না করিয়া আপন রসুলের আদেশ পালন করিতে হইবে এই ভাবিয়াই আদেশ পালন করা কর্তব্য। এই মহোপকারী নমাজ পাকের প্রতি কখন অবহেলা বা কাহেলী করা কাহারও কর্তব্য নহে। একতাই ইহার প্রধান অঙ্গ কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন।

“একতা পরম নিধি যতনের ধন।

একতার বলে বস হয় ত্রিভুবন ॥

সিন্ধুবন্ধে সেতু যথা থাকে বিরাজিত।

পারাবারে পার করে পথিক যেমত ॥

বিপদ সাগর সেতু একতা রতন।

যতনে বিপদে করে উদ্ধার তেমন ॥

অতএব ভ্রাতৃগণ হয়ে একমন।

একতা রতনে কর সকলে যতন ॥”

লইয়া যায় এবং তাঁহার সহিত ও কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনাকালে পূর্ববৎ তাহার সেই দশা হইয়া পড়িত এক্ষণে সে তাঁহাদের নিকট কোন প্রকারেই সকল-কাম হইতে না পারিয়া এই স্ত্রী-স্বয়ংকে যাত্নকর বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং উভয়কেই হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ কে প্রদান করে, বিবি হাজরা ও হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ অনুগামী হইতে ইচ্ছুক হওয়ার তিনি উভয় স্ত্রী-লোকসহ পুনরায় শ্রামদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে বিবি সারার গর্ভে কোন সন্তান বা সন্ততির জন্ম হয় নাই। বিবি সারার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছিল সাংসারিক কার্যসমূহে বিবি সারার অনুমতি লইয়া কার্য করিবার জন্য হজরৎ ইব্রাহীমের উপর খোদাওন্দ করিমের আদেশ ছিল। এই নিমিত্ত হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ বিবি সারার

১৩। পঞ্জগানা নমাজ যেমন ফজ্জ, পবিত্র জুমার নমাজও খোদাতালা মুসলমানগণের প্রতি তেমনই ফজ্জ করিয়াছেন, এবং এই দিবসের নমাজ কালে খোৎবা পাঠ ও শ্রবণ ফজ্জ হইতেছে ইদাইনের খুৎবা সুন্নাহ, জুম্মার খুৎবা ফজ্জ হওয়ায় সেই খুৎবাতে আরবি, ফার্সী বা উর্দু কোন ভাষায় লিখিত পত্র অর্থাৎ কবিতা পাঠনিষেধ। জহরের সময়ে চারি রেকাত ফজ্জ নমাজ আছে, তাহারই তুলনায় জুমার দিবস ফজ্জ নমাজ দুই রেকাত ও দুইটী খুৎবা দুইরেকাত ফজ্জ নমাজের তুল্য হইয়া একত্রে চারিরেকাত ফজ্জ নমাজ ও জুমার দিবস হইতেছে। পত্র বা কবিতা পাঠে কোন নমাজ হয় না এই নিমিত্ত নমাজের

কোন কথাতেই কখন কোন আপত্তি করিতেন না বাহা বলিতেন তাহাই করিতেন। বিবি সারার সন্তান সন্ততি না থাকায় বিবি হাজরাকে পবিত্র নিকাহে আবদ্ধ করিবার জন্ত বিবি সারা হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ কে অনুরোধ করেন। তাহাতে বিবি হাজরার সহিত হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ পবিত্র বিবাহ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে বিবি হাজরার গর্ভেই হজরৎ ইস্মাইলের দঃ জন্ম হয়। হজরৎ ইব্রাহীম্ পুত্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বিবি সারার কোন সন্তান বা সন্ততি নাই ও হজরৎ ইব্রাহীম্ বিবি হাজরার পুত্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেছেন দেখিয়া বিবি সারার অন্তঃকরণে যন্ত্রনা হইতে আরম্ভ হইল, তিনি সেই ইয্যার বশবর্ত্তিণী হইয়া হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ কে আদেশ করেন যে তুমি এই মুহর্ত্তে হাজরাকে ও তাহার পুত্রকে কোনও দূরদেশে ও বনে ছাড়িয়া দিয়া আইস, অগত্যা বিবি সারার কোন কথাতে হজরৎ ইব্রাহীমের ওজর বা আপত্তি করিবার অধিকার বা ক্ষমতা ঈশ্বরের নিকট হইতে পান নাই এই নিমিত্ত তিনি ওজর বা আপত্তি করিতে না পারিয়া হজরৎ ইব্রাহীম্ তাহাই করিলেন। উপস্থিত মকানগরীতে তিনি তাহাদিগকে রাখিয়া আসেন। তথায় যদিও এক সময়ে কাবাশরিফ ছিল কিন্তু তৎকালে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কাবাশরিফের কোন চিহ্ন মাত্রও ছিল না। ঈশ্বর কর্তৃক হজরৎ আদমের সময়ে এই স্থানে কাবাশরিফের সৃষ্টি হয়। এইস্থানে হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ যখন হজরৎ ইস্মাইল দঃ কে রাখিয়া যান তখন তাহার বয়স প্রায় দুই বৎসর মাত্র ছিল। তৎকালে তথায় কোন স্থানে জলের আশ্রয় ছিল না। হজরৎ ইব্রাহীম্ কিঞ্চিৎ জল দিয়া গিয়াছিলেন,

তুল্য খুৎবা যাহা ফরজ স্বরূপ গণ্য, তাহাতে পঢ় বা কবিতা নিষেধ
 হইয়াছে—ইহাতে আলোমাণ গণের মতভেদ দেখা যায়—
 ইদাইনের নমাজের খুৎবাতে পঢ় বা কবিতা নিষেধ করিতে পারা
 যায় না, বকরাইদের দিবস পবিত্র কাবা শরিফে হজব্রত সমাপন
 হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা আমার পবিত্র ইসলাম জগতে
 মহা আনন্দের দিবস ; ইদ ও বকরাইদ যেমন আনন্দের দিন
 পবিত্র জুমার দিবস ও আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন ।
 খোদাতুন্দ করিম এই দিবসেই জগতের যাবতীয় শুভ ও
 সুখকর কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং এই দিবসের প্রতি তিনি
 অশেষ কজিলত প্রদান করিয়াছেন, এই দিবসে যে নেক কার্য
 করা যাক না কেন খোদাতুন্দ করিম তাহার শুভফল দিয়াই
 থাকেন, তাহাই আমার পাক পয়গম্বরের দঃ নিকট ইহার আদর

কএক-দিবস পরে জল ফুরাইয়া যাওয়ায় তাঁহার জলের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগেন,
 একদিবস বিবি হাজরা আপন শিশু সন্তানকে একস্থানে শয়ন করাইয়া নিজে জলের
 অন্বেষণে যান, চারিদিকে নানা স্থানে ভ্রমণ ও অন্বেষণের পর কোথাও জল না পাইয়া
 অত্যন্ত হতাশ হইয়া আশ্রমে ফেরত আসিয়া দেখিতেছেন শিশু যেরূপ নিদ্রিত ছিল
 তদ্রূপ নিদ্রিতই আছে এবং তাহার পদপার্শ্ব হইতে এক প্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়া তথা
 হইতে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে । বিবি হাজরা জলাশয় অবলোকন পূর্বক
 অত্যন্ত প্রফুল্লিত চিত্তে ঈশ্বরের মহিমাকে শত ধন্যবাদ দিয়া জলস্রোতকে প্রস্তুত দ্বারা
 বেঠন করিয়া দেন তাহাই এক্ষণে মক্কাশরিফে পবিত্র চাহ জম্ জম্ নামে খ্যাত হইয়াছে
 ও কূপের আকারে পরিণত হইয়াছে । আদিকালে কাবাশরিফের সৃষ্টিকালে তথায়
 জলাশয় ছিল বলিয়া কথিত । হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ স্ত্রী ও পুত্রকে নির্বাসন করিয়া
 নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না । সময়ে সময়ে বিবি সারার অনুমতি লইয়া পুত্রকে
 দেখিতে আসিতেন । বিবি হাজরার বসতি, হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ গতিবিধি ও
 জলাশয় দেখিয়া ক্রমে তথায় লোকের বসতি হইতে আরম্ভ হয় তাহাকেই এক্ষণে
 মক্কাশরিফের দঃ স্ত্রী ও পুত্রকে নির্বাসন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না । সময়ে সময়ে বিবি সারার অনুমতি লইয়া পুত্রকে

অত্যন্ত অধিক । এই দিবস পবিত্র নমাজ সমাপন না করা পর্যন্ত আপন আপন ব্যবসায় আদি সাংসারিক কার্য হইতে বিরত থাকিবার নিমিত্ত খোদাওন্দ করিম আপন কলামমুজিদে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন ।

১৪ । পবিত্র নমাজের মধ্যে যে সকল নিষেধ আজ্ঞা ও ব্যবস্থা আছে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যিক ; নচেৎ গুনাহগার হইতে হইবে । যথা ঠিক সূর্য উদয়ের সময়, ঠিক দুই প্রহরের সময়, ঠিক সূর্য অস্তের সময়ে (যাহাকে হিন্দুগণ ত্রিসন্ধা কহেন তাঁহাদের সেই আরাধনার সময়) সিজদা নাই অর্থাৎ কোন নমাজ হইতে পারে না । ফজরের নমাজের সূন্নৎ ও ফরজের মধ্যে, আসরের নমাজের পর মগরবের নমাজের

নিকটে বাস করেন তৎকালেই ঈশ্বরাদেশে হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ হজরৎ ইস্মাইল দঃ কে খোদার রাহে কোরবানী করিবার আদেশ হয় (ইহার বিবরণ সচরাচর প্রতি বৎসর বকরীদের দিবস বকরীদের নমাজের খোৎবাতে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়) তৎকালে হজরৎ ইস্মাইলের দঃ বয়স প্রায় বার বৎসরের ছিল । তাহার পর বিবি সারার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয় তাঁহারই নাম হজরৎ ইসহাক দঃ এই হজরৎ ইসাকের দঃ বংশে হজরৎ মুসা দঃ ও হজরৎ ইসা দঃ হইতেছেন এবং হজরৎ ইস্মাইলের দঃ বংশে আমার পাকপরিগম্বর জনাব রসূলে আবেরে জম্মা মহম্মদমুস্তফা দঃ হইতেছেন । হজরৎ ইব্রাহীম্ দঃ মকানগরীতে থাকিয়া ঈশ্বরাদেশে কাবারশরিককে পুনঃস্থাপিত করেন, তাহাও আবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল জনাবরসূলে করিমের দঃ সময়ে সংস্কার হয় এবং তাঁহার পর ও আবার সংযোগ ও পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে এইরূপে এই কাবারশরিক একাধিক্রমে দশবার সংস্কার হইয়াছে । জনাবরসূলে করিমের দঃ পূর্বে মকানগরী কুফর স্থান হইয়াছিল এবং কাবা শরিকও কাকেরগণের নানাপ্রকার স্বাকার দেব ও দেবীর আগার ও উপাসনা স্থান হইয়াছিল (জনাবরসূলে করিম্ দঃ আপন আদিপুরুষ হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ নিম্নলিখিত দশটি বিষয় অনুকরণ করিয়া ও তাহা প্রতিপালন জন্ত আপন মতাবলম্বিগণের উপর আদেশ করিয়া যান এই নিমিত্ত আমরা তদসমূহ আদেশ ও ব্যবস্থা প্রতিপালনে বাধ্য নচেৎ আমাদিগকে গুনাহগার হইতে হইবে । হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ পর হজরৎ ইস্মাইলের দঃ বংশধরগণ মকানগরীর

সময় পর্য্যন্ত, মগরবের নমাজের করজ ও সূন্নতের মধ্যে এই তিন সময়েও কোন প্রকার নমাজ হইতে পারে না । পঞ্জগানা নমাজ ব্যতীত শেষ রাত্রিতেও নমাজ পড়া যায়, তাহাকে তাহাজ্জুদ নমাজ কহে । উহা ফর্জ বা সূন্নৎ নহে, নফল হইতেছে, কিন্তু উহাতে বিস্তর সওয়াব আছে । শেষ রাত্রিতে নিদ্রা ভগ্ন করা সম্বন্ধে যখন খোদার আদেশ আছে (ইহার বিবরণ পশ্চাতে দেওয়া হইয়াছে) তখন শেষ রাত্রির নমাজে যে অধিক সওয়াব না হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই । শেষরাত্রে খোদার দরগাহে অর্থাৎ সন্নিধানে যাহা প্রার্থনা করা যাইবে, তাহা তিনি কবুল করিবেন বলিয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ তাহা প্রমাণ

কাবাশরিফকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহা ত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করেন ও হজরৎ ইসহাকের দঃ বংশধরগণ হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ সাবেক বাস স্থানদেশ (যাহাকে এসিয়াটিক তুরস্ক কহে) অঞ্চলে গিয়া হজরৎ সালেমানের দঃ কৃত বায়তুল মোকাদ্দেস অর্থাৎ মসজিদে অকসা (এক্ষণে যাহাকে ইংরাজগণ জেরুজেলেম বলেন) নামিত মসজিদকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহার সংস্কার করেন ও তথায় অবস্থিতি করেন । এই নিমিত্ত হজরৎ মুসা দঃ ও হজরৎ ইসার দঃ মতাবলম্বিগণ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উক্ত মসজিদের মাস্তা করিয়া আসিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের তীর্থস্থান । ইহা এক্ষণে তুরস্কের মহামাস্তা সুলতান খলিফতুল মুসলেমিনের ইসলামরাজ্য ভুক্ত হইতেছে । হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ পূর্বে যে কাবাশরিফ ছিল তৎকালে তাহার নাম বয়তুলমামুর ছিল হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ সময় হইতেই ইহার নাম কাবা হইয়াছে ও নগরের নাম মকা হইয়াছে । হজরৎ ইব্রাহীমের দঃ যে সকল কার্যকে আমার পাক-পয়গম্বরহুলে করিম্ দঃ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন ও আমাদিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

১। কোরবানী দেওয়া ।	২। ত্বকছেদ অর্থাৎ খৎনা দেওয়া ।
৩। মেসওয়াগ করা অর্থাৎ দাতন করা ।	৪। উজুকালিন নাকে জল দেওয়া ।
৫। কুলকুচা করা ।	৬। প্রস্তাবের পর জল ব্যবহার করা ।
৭। নখ কর্তন করা ।	৮। গোপ কর্তন করা ।
৯। বগলের লোম মুণ্ডন করা ।	১০। অধস্থানের লোম মুণ্ডন করা ।

করিতেছে । এই নমাজ পড়িতে হইলে, এশার নমাজের ফরজ ও সুন্নৎ নমাজ পড়িয়া বিতরের নমাজ বাকি রাখিতে হয়, পরে শেষ রাতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নমাজ পড়িবার পর শেষে বিতরের নমাজ পড়িতে হয় । কারণ বিতরের নমাজ রাত্রির নমাজের মধ্যে শেষ নমাজ হইতেছে । তাহাজ্জুদের নমাজ ৮। ১০। ১২ রেকাত পর্য্যন্ত পড়া যায় । ইহাতে পবিত্র হাদিস সরিফের মতভেদ আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা অর্থীৎ যত পড়া যাইবে তাহাই দুর্বল অর্থীৎ ঠিক । কোনও প্রকারের নফল নমাজ পড়িতে হইলে এক সময়ে ২।২ রেকাতের বেশী নিয়ত করা যাইতে পারেনা, এই তাহাজ্জুদের নমাজও সেইরূপে পড়িতে হয় । এই তাহাজ্জুদ কেন প্রত্যেক নমাজের প্রত্যেক রেকাতে ২।২ সেজদার আদেশ ও ব্যবস্থা আছে তাহার কম হইতে পারেনা । প্রথম সেজদার পর বেস সোজা ভাবে বসিয়া তসবিহ পড়িয়া তাহার পর দ্বিতীয় সেজদা করিতে হয়, তাহা না করিয়া ভূমি হইতে মাথা অঙ্গ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় সেজদা করিলে তাহা এক সেজদার মধ্যে গণ্য, কিন্তু এক সেজদার দ্বারা নমাজ পড়িলে গুনাহগার হইতে হইবে । কেতাবে খবর আছে, নমাজের প্রত্যেক রেকাতে প্রথমে “সূরায়ে ফাতেহা” অর্থীৎ অলহম্দো সূরা পাঠ করিতেই হইবে তাহা অগ্রে পাঠ না করিলে নমাজ হইবে না, তাহার পর অন্য কোন সূরা বা আয়েৎ পাঠ করা চাই । প্রথম রেকাতে ছোট সূরা বা আয়েৎ পড়িয়া দ্বিতীয় রেকাতে বড় সূরা বা আয়েৎ পড়া নিষেধ । প্রথম রেকাতে পরের সূরা

দুই রেকাত নমাজের মধ্যে কোন একটি মাত্র সূরা বা আয়েৎ বাদ দিয়া নমাজ পড়া অন্তায় । ক্রমিক ভাবে অথবা দুই বা অধিক সূরা বা আয়েৎ বাদ দিয়া নমাজ পড়িতে পারা যায় । কোন নমাজের সময় কোন বিশেষ সূরা বা আয়েৎ মনে মনে নির্দিষ্ট করিয়া নমাজ পড়া অনুচিত । যখন যে সূরা বা আয়েৎ হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় তাহাই পাঠ করা কর্তব্য ; ইহা কেবল বিতরের নমাজেই হইতে পারেনা । সতত কোন একই সূরা বা আয়েৎ পাঠ করিয়া নমাজ পড়া যাইতে পারেনা । প্রথম রেকাতে কোন সূরার প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় রেকাতে অন্য কোন সূরার শেষঅংশ পাঠ করা অন্তায় । নমাজকালে কোন আয়েৎ, বড় হইলে কমপক্ষে এক রেকাতে এক আয়েৎ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যায় ; নচেৎ আয়েৎ ছোট হইলে কম পক্ষে তিন আয়েৎ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যায়, বেশি যতই হউক তাহাতে কোন দোষ নাই । তাহাজ্জুদের নমাজে সূরায়ে ফাতেহার পর প্রত্যেক রেকাতে ৩৩ বার “সূরায়ে এখলাস” অর্থাৎ “কুলহুঅল্লা” পড়িবার ব্যবস্থা । বিতরের নমাজের সময় সচরাচর প্রথম রেকাতে সূরায়ে “সবেব হিসমা” বা সূরায়ে “ইল্লা অনজলনা” পাঠ করা চাই । এই দুই সূরার কোন এক সূরা পাঠ করাই আবশ্যক, ইহাতে ও মত ভেদ আছে, তবে যাহা পড়া যায় তাহাই ভাল । দ্বিতীয় রেকাতে সূরায়ে “কুলইয়াআইয়োহল,” তৃতীয় রেকাতে সূরায়ে “কুলহুঅল্লা” ও পরে “দোয়া কনুদ” পাঠ করা আবশ্যক । দোয়া কনুদ শিক্ষা না থাকিলে তাহার পরিবর্তে তিনবার “কুলহুঅল্লা” পড়িলেও নমাজ হইবে । এই

দোয়ায় কনুদে ১৪টী ওয়াও অক্ষর আছে তাহার মধ্যে একটী ওয়াও অক্ষরের ভ্রম হইলে বিশেষ গুনাহগার হইতে হইবে । এই বিতরের নমাজের পর আরও দুই রেকাত নমাজ পড়া আবশ্যক, তাহাকে “তশফি অলিলবিতর” কহে । উহা বসিয়া পড়া যায়, তাহার পাঠে বিস্তর সওয়াব আছে বলিয়া কেতাবে খবর দিতেছে । এতদ্ব্যতীত সূর্য্য উদয়ের পর বারটার মধ্যে আরও নমাজ আছে তাহাকে চাস্ত ও ইশরাক আদি নমাজ বলা যায় । তাহা সকলই নফল । কোন দূরদেশে বা বিদেশে গেলে, তিন দিবসের পথের অতিরিক্ত অর্থাৎ ৩৬ ক্রোশ অন্তর কোন স্থানে আসা গিয়াছে জানা গেলে এবং সেই স্থানে ১৫ দিবসের কম সময় থাকিতে হইবে ইহাও জানা থাকিলে তথায় যে যে সময়ে চারি চারি রেকাত ফরজ নমাজ আছে সেই সময়ে ৪।৪ রেকাত নমাজের পরিবর্তে সেই মুসাফেরকে ২।২ রেকাত ফজ্র নমাজ পড়িতেই হইবে, ইহাকে “কসর” কহে কসর শব্দের অর্থ কম, খোদায়ে পাক মুসাফেরের প্রতি দয়া ও কৃপা করিয়া তাঁহার ফরজ নমাজ কম করিয়া পড়িবার আদেশ আপন কলাম মুছিদে প্রদান করিয়াছেন । চারি রেকাত নমাজ পড়িবার ক্ষমতা আছে বলিয়া দুই রেকাত না পড়িয়া চারি রেকাত ফরজ পড়িয়া লওয়া কোন মোসাফেরের উচিত নহে । তাহাতে খোদার আদেশের অবমাননা হইবে, ও গুনাহগার হইতে হইবে যে সময়ে তিন রেকাত বা দুই রেকাত নমাজ আছে, তাহা কম করিতে পারা যায় না, কারণ তৎ সম্বন্ধে কোন আদেশ নাই । বিদেশে স্ত্রলৎ নমাজ সমূহ বরাদ্দ অনুসারে পড়িত পারিলে ভাল,

একবারে না পড়িলেও কোন দোষ হইতে পারে না,—ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । বিদেশে পবিত্র রোজার ব্যবস্থাও ঠিক এইরূপ । যে মুসাফেরকে কোন এক স্থানে ১৫ দিবস অপেক্ষা বেশি দিন থাকিতে হইবে যদি ইহা তিনি জানিতে ও বুঝিতে পারেন তবে তথায় তাঁহার কসর নমাজ চলিবে না, তখন তিনি তথায় মুকিম অর্থাৎ বাসেন্দা বলিয়া গণ্য, তাঁহাকে প্রথম হইতেই পুরা নমাজ পড়িতে হইবে । মুসাফের ও মুকিমের জমাতে নমাজ পড়িবার ব্যবস্থা এই রূপ যে ইমাম যদি মুসাফের হন ও মুকতেদি যদি স্থানীয় ব্যক্তি হন তবে ইমাম অগ্রে জানাইয়া দিবেন যে আমি মুসাফের হইতেছি ও তিনি নিজে কসর নমাজ পড়িবেন, মুকতেদিগণ আপন আপন পুরা নমাজের নিয়ৎ করিবেন ও পুরা নমাজ পড়িবেন । উভয়ে মুসাফের হইলে উভয়ে কসর নমাজ পড়িবেন । ইমাম যদি বাসেন্দা হন ও মুকতেদি যদি মুসাফের হন, তবে মুকতেদিও বাসেন্দা ব্যক্তির ন্যায় পুরা নমাজের নিয়ত করিবেন ও পুরা নমাজ পড়িবেন । কসর নমাজের সময় ইমাম মুসাফের হইলেও মুকতেদি মুকিম অর্থাৎ বাসেন্দা হইলে, ইমাম আপন দুই রেকাত নমাজ পড়িয়া সেলাম ফিরিলেই মুকতেদিগণ দাঁড়াইয়া উঠিবেন ও অবশিষ্ট নমাজ যেরূপ ভাবে ইমামের পশ্চাতে থাকিয়া নির্বাহ করিতে হয় সেই প্রকারেই অবশিষ্ট দুই রেকাত নমাজ সম্পন্ন করিবেন কিন্তু দাঁড়াইবার সময় তৎকালে সুরায়ে ফাতেহা পাঠ করা অনুচিত । ইমামের পশ্চাতে দাঁড়াইলে যেমন বিনা পাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় তদনুরূপ সুরায়ে ফাতেহা না পড়িয়া

তাহা পাঠ করিতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক সেই সময়কাল প্রত্যেক রেকাতের সময়ে দাঁড়াইয়া যেমন ইমামের পশ্চাতে রুকু ও সজুদ করিতে হয় তেমনই কেবল রুকু ও সজুদ করিবেন । রুকু ও সজুদ কালে যে যে তসবিহ পাঠ করিতে হয় তাহা পড়িতেই হইবে । এই প্রকারে মুকিম মুকতেদি মুসাফের ইমামের পশ্চাতে আপন নমাজ সম্পন্ন করিবেন, ইহাই আমার ইমাম আজমের ব্যবস্থা । এসম্বন্ধে হাদিস শরিফের বহুল প্রমাণ রহিয়াছে । আমার ইমাম আজমের ব্যবস্থা অনুসারে ইমামের পশ্চাতে নমাজ পড়িলে মুকতেদি কোন সূরা বা আয়েৎ পাঠ করিতে পারে না । মুসাফিরের পশ্চাতে নমাজ আরম্ভ করিবার কালে ইমামের একতেদা করা হইয়াছিল, পরে ইমাম না থাকিলেও সে একতেদা কখন ভগ্ন হইতে পারে না ; অতএব ইমাম উপস্থিত থাকিলে যেরূপে নমাজ শেষ করা যায় ইমামের অনুপস্থিতিতেও তদনুরূপেই সম্পন্ন করা যুক্তিসংগত । এইরূপে মুকিম ইমামের পশ্চাতে যদি অন্য কোন মুকিমও নমাজের যে কোন সময়ে এমনকি সর্বশেষ রেকাতের সিজদার পর সেলামের পূর্বে ও আসিয়া সামিল হয় অর্থাৎ ইমামের পশ্চাতে নমাজ পড়িবার একতেদা করিয়া সামিল হয় তাহা হইলেও ইমামের সেলামের পর সেই মুকতেদি সেলাম না ফিরাইয়া আপন নমাজের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে ও বিধিমত নমাজ সম্পন্ন করিবে, কিন্তু কোন রেকাতেই সূরায়ে ফাতেহা ও কোন আয়েৎ না পড়িয়া কেবলমাত্র যে যে সময়ে ইমামের পশ্চাতে দাঁড়াইতে যত সময় লাগিতে পারে বসিয়া লইয়া সেই

সেই সময়ে তদুপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকু ও সজুদ আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেই তাহার নমাজ পূরা হইয়া যাইবে । ইহাই আমার পবিত্র হনফি মতের ব্যবস্থা বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহাই স্বীকার করে । কিন্তু আমার হনফিগণের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি ইহার পোষকতা করেন না, ইহার এখতেলাফ মত দেন ।

১৫ । প্রত্যহ ফজরের নমাজের জন্য উজু করিবার পূর্বের মেসওয়াগ অর্থাৎ দাতন করিয়া উজু করা কর্তব্য, সুবেহ সাদেক হইলেই ফজরের নমাজের সময় হয়, সূর্য্য অস্তের পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত পশ্চিম অঞ্চলের আকাশে সূর্য্যের আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মগরবের নমাজ পড়া যাইতে পারে, তাহার পর কজালিয়া গণ্য হইবে । মগরবের নমাজের সময়ের পর হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এশার নমাজের প্রশস্ত সময় হইতেছে, তাহার পরেও যে এশার নমাজ কজা হইবে এমন নহে, শেষ রাত্রে সোবেহ সাদেক হইবার পূর্বের অর্থাৎ সোবেহ কাজেবের সময় পর্য্যন্ত এশার নমাজ পড়িতে পারা যায় । সূর্য্য উদয়ের পূর্বের পূর্বদিকের আকাশে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করিবার উপক্রম কালকে সোবেহ সাদেক কহে, তৎপূর্বের সেই দিকের আকাশে যে ঈষৎ অন্ধকার থাকে তাহাকেই সোবেহ কাজেব কহে । সোবেহ অর্থ সকাল, সাদেক অর্থ সত্য ও কাজেব অর্থ মিথ্যা । সোবেহ কাজেব সময়ে আকাশ ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া তাহার পরক্ষণেই আবার কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এই নিমিত্ত যে শুভ্র বর্ণ মিথ্যা তাহাকেই সোবেহ কাজেব কহে ।

১৬। পবিত্র নমাজ জন্য দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র পাক অর্থাৎ পবিত্র রাখা নিতান্ত আবশ্যিক, তবে কাহারও বস্ত্রের অভাব থাকিলে সে তাহার অপবিত্র বস্ত্রেই নমাজ করিতে বাধ্য। এই সব বিধি ও ব্যবস্থা জন্য খোদায়ে পাকের যে আদেশ আছে তাহা পালন করা অতি আবশ্যিক, মলত্যাগের পর সকলেই এবং মূত্রত্যাগের পর অনেকেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। মলত্যাগের পর জল ব্যবহার করিলে সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে কিন্তু মূত্রত্যাগের পরেই সামান্য জল ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্তব্য নহে, কারণ মূত্রত্যাগের পর উঠিয়া দাঁড়াইলে অথবা দুই চারি পদ বিচরণ করিলেই মূত্রদ্বারে আবার মূত্রবিন্দু আসিয়া পড়ে। মূত্রত্যাগের পর জল ব্যবহার হইয়া গেলে তাহার প্রতি জলব্যবহার-কারিগণ কেহই লক্ষ্য করেন না। সেই মূত্রবিন্দু পরিধেয়বস্ত্রে লাগিয়া যায় তদ্বারা সেই বস্ত্র ও শরীরকে শুদ্ধ বলিয়া কোন প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে হণফি মতাবলম্বিগণের মধ্যে মূত্রত্যাগের পর প্রথমে কুলুথ অর্থাৎ মৃত্তিকা লোপ্ত্র ব্যবহার করিয়া দুই চারি পদ বিচরণ ও পরে জল ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। শরীর ও বস্ত্রের বিশুদ্ধতার জন্য এরূপ পরিক্ষীত ফলযুক্ত আদেশ ও ব্যবস্থা আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। এইরূপে মল-ত্যাগের পর অগ্রে লোপ্ত্র ব্যবহার করিয়া পরে জল ব্যবহার করিবার আদেশও আছে, ইহার দ্বারা হস্তে মলসংযোগ প্রায় হইতেই পারে না, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মল বা মূত্র ত্যাগ করা

যায়, পবিত্র নমাজের সময় তাহা পরিবর্তন করিতে পারিলে উত্তম, তবে অভাব পক্ষে বস্ত্রের বিশুদ্ধতা জন্য উপরি লিখিত ব্যবস্থা অনুসারে মল ও মূত্রাদি হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যিক । স্ত্রী-সহবাস ও স্বপ্নবিকারের পরক্ষণেই স্নান বিধি, স্নানকালে শরীরের একটি মাত্র লোমকূপের স্থানও যেন শুষ্ক না থাকে নচেৎ শরীর অশুদ্ধই থাকিবে । স্বজোরে বীর্য নিষ্কিপ্ত হইলেই স্নানবিধি কিন্তু রেতঃপাত হইলে স্নানের ব্যবস্থা নাই, কেবল জল ব্যবহার ও বস্ত্র পরিবর্তন করিলেই নমাজ হইবে । স্বপ্ন-বিকারের কেবল মাত্র মিথ্যা স্বপ্নে স্নান অনাবশ্যক কিন্তু তাহার আলামত অর্থাৎ বীর্যের চিহ্ন বস্ত্রে দেখা গেলে স্নান আবশ্যক, স্ত্রী-সহবাস কালে বীর্যস্খলন না হইলেও স্নান আবশ্যক, নচেৎ নমাজ হইতে পারে না ।

১৭। পবিত্র হজব্রত সমাপন করা প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের প্রতি খোদার আদেশ আছে, ইহা তাঁহাদেরই জন্য ফরজ্জ । এই ব্রত পবিত্র বকরাইদের নমাজের দিবসেই সম্পন্ন হয় । ইহা দরিত্রের জন্য ফরজ্জ নহে । ঈশ্বর সঙ্গতি দিলে ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করা আমাদের পক্ষে প্রধান কর্তব্য । সংসারের মায়া ও মমতায় জড়িত হইয়া ইহাতে অবহেলা করা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের কর্তব্য নহে, তাঁহাদের প্রতি মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে । পবিত্র কাবা শরিফের জেয়ারত অর্থাৎ দর্শন ও তথায় পবিত্র বকরাইদের নমাজ আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাই হজ্জ । ইহার মূলে ও ইসলাম জগতে পবিত্র একতার কারণ নিহিত রহিয়াছে । এইরূপ প্রত্যেক নমাজ ও রোজা আদির

মূলে আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মের একতার বন্ধন আছেই আছে । নমাজ কালে এই পবিত্র কাবা শরিফের প্রতিই নিয়ৎ অর্থাৎ বন্দনা করিয়াই নমাজ পড়িতে হয় ও সেই দিকেই সিজদা করিতে হয় অতএব এই কাবা শরিফের জেয়ারৎ যে কতই সুখকর ও আনন্দদায়ক এবং পরকালের পক্ষে যে কতই শুভ তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে । এই হজ সম্বন্ধে প্রকৃত ও বিস্তারিত বিবরণ খাঁ বাহাদুর সৈঃ নওয়াব আলি চৌধুরী সাহেব কৃত “হজ বিধি” ও “ইদজ জোহা” নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । একবার মাত্র এই পবিত্র হজ ত্রত সমাপন করিতে পারিলে এই পাপময় সংসারের মিথ্যা মায়া ও প্রবঞ্চনাদি দুষ্ক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইবার পথ করিতে পারা যায়, ইহাই পবিত্র ত্রতের উদ্দেশ্য । এই মহান ত্রত সমাপনের পরও যিনি পুনরায় সংসারের মিথ্যা মায়া ও মমতায় জড়িত হইয়া পড়িবেন ও ঈশ্বরের ভয় না করিয়া পুনরায় দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত হইবেন তাঁহার ইহকাল ও পরকাল কোথাও সুখ হইবে না । খোদার নিকটে মুখ দেখানই তাহার দায় হইয়া পড়িবে ।

১৮ । জনাব পয়গম্বরে খোদা মহম্মদ মুস্তফা দঃ কে ঈশ্বর উন্মি অর্থাৎ বিদ্যাহীন করিয়াছিলেন, তিনি কোন ভাষাতে লিখা বা পড়া জানিতেন না কখনও কোন গুরু বা শিক্ষকের নিকট কোন বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই । তাঁহার বিদ্যাহীনতা প্রযুক্ত লোকে সমস্ত কোরাণ মুখস্থ করিয়াই রাখিয়াছিলেন । জনাব রসুলে করিমের দঃ রহ্লৎ অর্থাৎ স্বর্গারোহণের প্রায় ২০।২৫ বৎসর পরে জনাব ওসমান রজি অল্লা অনছর খেলাফতের

কালে অর্থাৎ ধর্ম রাজ্যের সময়ে তিনি বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া অসংখ্য হাফেজে কোরাণ অর্থাৎ কোরাণের মুখস্থকারী ও পণ্ডিত মণ্ডলিকে একত্রিত করিয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ পুস্তকাকারে পরিণত করেন । লোকের ভুল ও ভ্রান্তি আদি দোষে অনেকে বিস্তর, বেশি ও কমি করিয়া ফেলিয়াছিলেন । তাহা তৎকালেই সংশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । তৎকালে কোরাণ শরিফের সম্বন্ধে যেমন গোলমাল হইয়াছিল তেমনই পবিত্র হদিস শরিফ সম্বন্ধে ও গোলযোগ হইয়া গিয়াছিল । জনাব রসূলা মকবুল দঃ যখন যে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাকেই হদিস শরিফ কহা যায় । ইহাও শ্রোতৃগণের উপর নির্ভর করিয়া হদিস শরিফের প্রবলতা ও দুর্বলতার বিষয় নির্বচন হইয়াছে, তজ্জন্যই পণ্ডিত মণ্ডলির মধ্যে বিস্তর মতভেদ হইয়া পড়ে ও হইয়া আসিতেছে । এই জন্মই আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মের নমাজ, রোজা আদির প্রক্রিয়া সমূহ এবং আরও অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া চারি প্রধান মতে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে ও সেই মতের বিভিন্নতা বশতঃ এতাবৎ সেই চারি মতের প্রচলন হইয়া আসিতেছে । ইহার প্রধান বিভাগ কর্তাকে মুজতেহিদ অর্থাৎ ইমাম বলা যায় । ইহাদের পরস্পরের মতভেদ অনুসারে আচার এবং ব্যবহারের ও বিস্তর বিভিন্নতা রহিয়াছে এবং পরস্পরের কার্য্য কলাপের ও বিস্তর ইতর বিশেষ আছে । ফলে ইহারা সকলে অর্থাৎ এই চারি সম্প্রদায়ই সুন্নৎ জমাত হইতেছেন অর্থাৎ জনাব মহম্মদ মুস্তফার দঃ প্রকৃত কার্য্যের ও আদেশের অনুগামী । পবিত্র মক্কা শরিফে এই চারি ইমামের চারি

মোসল্লা অর্থাৎ জমাত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে মূল ধর্ম সম্বন্ধে কাহার ও কিছুই বিভিন্নতা নাই এই চারি মতের মধ্যে যে মতই অবলম্বন করা যাক না কেন তাহাই ঠিক ও দুরন্ত । এই ইমাম মহাপুরুষগণের নাম (১ম) ইহাম আজম আবুহনিফা রজি অল্লাহ অনহ (২য়) ইমাম মালিক রজি অল্লাহ অনহ (৩য়) ইমাম শাফই আবদুর রহমান রজি অল্লা অনহ (৪র্থ) ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল রজি অল্লাহ অনহ । ইহাদের মধ্যে প্রথম ইমাম আবুহনিফা রজি অল্লা অনহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন, তাহাই ইহার খেতাব ইমাম আজম অর্থাৎ বড় ইমাম হইতেছে । সন ৮০ হিজরিতে কুফা নগরে ইহার জন্ম হয় । ইহার সহিত অনেক সুহাবায়ে করিম অর্থাৎ জনাব রসুলে করিমের দঃ সমসাময়িক ও সহচর ব্যক্তি গণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় এবং অনেক মোহাদেস অর্থাৎ হাদিস শরিফের বর্ণনাকারী ও লেখকের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল । এই ইমাম চারি জনকে ঈশ্বর কোরাণ ও হাদিস সম্বন্ধে এত অধিক বিদ্যা ও ক্ষমতা দিয়া ছিলেন যে তাঁহারা আপন আপন বিদ্যা বলে ইমাম অর্থাৎ প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছেন । দ্বিতীয় ইমাম মালেক মদিনা শরিফে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনিই ৩য় ও ৪র্থ ইমামের শিক্ষাগুরু হইতেছেন । এই চারিজনকে জীবদ্দশায় পরস্পরে সাক্ষাৎ হওয়া কেতাবে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ইসলাম জগতে ইহাদের মধ্যে জনাব ইমাম আজমের মতাবলম্বী অধিক । ঈশ্বর তাঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন তেমনই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষাও করিয়াছেন । পবিত্র মক্কা ও

মদিনা শরিফে ও অন্যান্য তিন ইমামের মতাবলম্বী অনেক আছেন কিন্তু এই ভারত খণ্ডে এবং অন্যান্য স্থানে ইহাদের তত আধিক্য নাই ।

১৯ । ইংরাজি সন ১৫৭০ খৃঃ অব্দে ২৯শে আগষ্ট তারিখে সোমবার রাতে অর্থাৎ রবিবার দিবস গত হইবার পর রাতে জনাব রসুলে খোদা অহমদে মুজতেবা মহম্মদ মুস্তফা দঃ এর জন্ম হয় । ২৫ বৎসর বয়স্কালের সময়ে বিবি খোদায়জার সহিত সর্ব প্রথমে পবিত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন । ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে নবুয়ৎ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ খোদায়ে করিম তাঁহাকে তৎকালে আপন পয়গম্বর বলিয়া প্রচার করেন । তখন হইতে প্রকাশ্যভাবে মক্কাবাসিগণকে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার জন্য উপদেশ দেন । মক্কাবাসিগণ তখন নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া স্বাকার দেবোপসনা করিত । জনাব রসুলে করিমের দঃ উপদেশে তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি বিস্তর অন্যায় ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, এমন কি এক রাতে তাঁহার প্রাণ বধ করিবার জন্যও ষড়-যন্ত্র করিয়াছিল সেই রাতে তিনি আপন প্রধান সহচর হজরত আবুবকর সিদ্দীক রজি অল্লাহ অনহুসহ বাহান্ন কি তিপান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে খোদায়ে পাকের আদেশ অনুসারে পবিত্র মক্কা নগরী হইতে পবিত্র মদিনা শরিফে হিজরত করেন । সেদিন খৃঃ ৬২২ অব্দ ২রা জুলাই শুক্রবার দিবস ছিল । মদিনাবাসিগণ একান্ত আগ্রহ সহকারে জনাব রসুলে করিম দঃ কে আশ্রয় দেন ও ক্রমে পবিত্র ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠ পোষকতা

করেন । মক্কাবাসী কাফেরগণ মদিনা শরিফ পর্য্যন্ত বারম্বার গিয়া ও তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই । জনাব রসূলে করিমের দঃ হিজরতের পর মক্কাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানগণ কাফেরগণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মক্কা ত্যাগ পূর্ব্বক মদিনা শরিফে আসিয়া বাস করেন, ক্রমে কাফেরগণের অত্যাচার অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিলে খোদায়ে পাকের আদেশ অনুসারে জেহাদ অর্থাৎ ধর্ম্ম যুদ্ধ হয় । এইরূপে কয়েক বারই যুদ্ধ হইয়াছিল । এই প্রকারে দশ বৎসর কাল পবিত্র মদিনা শরিফে থাকিয়া জনাব রসূলে করিম দঃ পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার করেন, অবশেষে ইংরাজি সন ৬৩২ খঃ অর্বে ৮ই জুন তারিখ ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে (হিজরি সনের গণনানুসারে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে) পবিত্র দেহ ত্যাগ করেন, সেই দিবস হিজরি সনের রবিওল আউল মাসের ১২ই তারিখ ও সোমবার ছিল ; ঠিক এইবার ও তারিখেই তিনি ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন । লোকে প্রতি বৎসর এই তারিখ ধরিয়াই ফাতেহয়ে দোয়জ দোহম করিয়া থাকেন । জনাব রসূলে করিমের দঃ মদিনা শরিফে আসিয়া বাস করাকেই হিরজরৎ কহে । এই সময় হইতেই আমার পবিত্র ইসলাম জগতে সালের গণনা হইয়া আসিতেছে । এই জন্য এই সালকে হিজরি সাল বলা হয় । জনাব মহমদের দঃ সঙ্গে ও পরে যাঁহার মক্কা হইতে মদিনায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে “মহাজেরীন” বলা যায় । জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ ধরিয়া কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্রে অনুচিত বলিয়া রসূলে পাকের

হিজরতের দিবস ধরিয়াই ইসলাম সনের গণনা আরম্ভ হইয়াছে ।

২০। হজরত ইসা দঃ অর্থাৎ খৃষ্টানগণের পয়গম্বর যিশুখৃষ্টের জন্মকাল হইতে ইংরাজি সালের গণনা হইয়া আসিতেছে । ডিসেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে তাঁহার জন্ম হয়, ৭ দিবস কাল পর্য্যন্ত তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদ পায় নাই । হজরত ইসার দঃ মাতা বিবি মরিয়ম অবিবাহিতা ও কুমারী বালিকা ছিলেন, খোদায়ে পাক জগতবাসিগণের মধ্যে আপন অপার মহিমা প্রদর্শন হেতু বিনা সংঘমে কুমারী বালিকার গর্ভে জগৎ বিখ্যাত অসাধারণ সন্তান উৎপত্তি করিবার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য হজরত ইসার দঃ জন্ম করেন । বিবি মরিয়ম আপন গর্ভ বৃদ্ধিতে পারেন নাই, কিছুকাল পরে তাঁহার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাঁহার পিতা লোক লজ্জার ভয়ে তাঁহাকে লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যান । এক দিবস মাঠে এক বৃক্ষ তলে হজরত ইসার দঃ জন্ম হয় । জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ আপন আপন বিজ্ঞাবলে জানিতে পারিলে তাঁহার জন্ম প্রচার হইয়া পড়ে । সেই প্রচারের দিবস ১লা জানুয়ারী ছিল । জন্ম দিবসকেই ইংরাজগণ ক্রিসমস কহেন, এই নিমিত্ত অল্পদেবে সাধারণে ২৫শে ডিসেম্বরকে “বড় কিশমিশ” ও ১লা জানুয়ারিকে “ছোট কিশমিশ” বলিয়া থাকে, এইরূপে ১লা জানুয়ারি হইতেই ইংরাজি সালের গণনা হইয়া আসিতেছে । তিনি ইহজগতে মাত্র ৩৩ বৎসর কাল ছিলেন ।

২১। আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় পুরুষের

মধ্যে সর্বপ্রথমে জনাব হজরত আবুবকর সিদ্দিক রজি
আল্লাহ অনহ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবি খোদায়জা অফা অনহা
পবিত্র ইসলাম ধর্ম কবুল করেন । বিবি খোদায়জা অতুল ধন
সম্পত্তির অধীশ্বরী ছিলেন । জনাব রসূলে করিম দঃ রুখা ধনের
প্রত্যাষী না থাকায় তিনি সেই সমূহ অসংখ্য ধন বিলাইয়া দিয়া
জনাব রসূলে করিমের দঃ পত্নীত্বে পরিনীতা হন । তাঁহার ইমান
আনিবার অনেক পূর্বের জনাব রসূলে করিমের অসাধারণ
বুৎপত্তি ও অলৌকিকতার পরিচয় পাইয়া বিবি খোদায়জা
পবিত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন । বিবাহ কালে বিবি
খোদায়জার বয়স্ক্রম প্রায় ৪০ বৎসর ছিল । ইঁহারই পবিত্রগর্ভে
জনাব রসূলে করিমের দঃ খ্যাতনামা ও প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা
বিবি ফাতেমা খাতুন জিন্নতের জন্ম হয় । জনাব রসূলে করিমের
দঃ আরও সন্তান সন্ততি হইয়াছিল । তাঁহারা সকলেই
অকালে দেহত্যাগ করেন । বিবি ফাতেমা একাই জনাব রসূলে
করিমের দঃ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন । জনাব রসূলে
করিম দঃ বিবি খোদায়জার জীবদ্দশায় অন্য কোনও স্ত্রীর
পানিগ্রহণ করেন নাই । জনাব রসূলে করিমের দঃ প্রায়
৫০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবি খোদায়জার মৃত্যু হয়, তাহার পর
তিনি অন্যান্য স্ত্রীর পানিগ্রহণ করেন । জনাব রসূলে করিমের
সর্বসমেত ১৪ জন পত্নী ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে পরম
পূজনীয়া ও প্রাতঃস্মরণীয়া বিবি আয়েশা সিদ্দিকারজি আল্লাহ
অনহাকেই (হজরত আবুবকর সিদ্দিক রজি অফা অনহর কন্যা)
কুমারী বিবাহ করিয়াছিলেন । অপর স্ত্রীগণ সকলেই দোহা

ছিলেন। প্রথম ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে অর্থাৎ যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে আদৌ বিবাহ করিলেন না। তাহার পর অর্থাৎ ২৫ বৎসরের সময় যদি বিবাহ করিলেন তাহাও তিনি অর্দ্ধ বৃদ্ধা, তাহার পর ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত সেই এক মাত্র স্ত্রী সহবাসেই কালাতিপাত করিলেন, তৎপরে নিজ বৃদ্ধাবস্থার আরম্ভ কালে এমন কি বৃদ্ধাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীগণকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। তৎকালে তাঁহার জীবনের ও শারীরিক শক্তির অবশ্যই শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছিল, এরূপ অবস্থায় এত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবার মর্ম্ম একমাত্র ঈশ্বর ও রসুলে করিম দঃ ব্যতীত অন্য কেহই বুঝিতে পারেন না। ইহার গুঢ় রহস্য ভেদ করা সাধারণ মনুষ্যের অসাধ্য। এই স্ত্রীগণের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধ বৃদ্ধা ও দুইজন অত্যন্ত বৃদ্ধাও ছিলেন। আপন মতাবলম্বীগণের মধ্যে স্ত্রী জাতিকে সপত্নীত্ব শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া ও পত্নীরূপে পরিণীতা ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকগণের পরকাল উদ্ধার করিয়া দেওয়াও উদ্দেশ্য হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত রসুলে করিম দঃ পুরুষ হইয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষাদান করিতে গেলে স্ত্রীজাতিগণের জ্ঞাতব্য সমূহ বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন না ও পাছে শত্রুগণ তাঁহার পবিত্র ও নিষ্পল চরিত্রে কোন দোষ দেয় এই নিমিত্ত তদুপযুক্ত অন্যান্য স্ত্রীকে আপন পরিণীতারূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষাদান করিতেন।

২২। জনাব রসুলে করিমের দঃ নিকট প্রথমে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জনাব

হজরত আবুবকর সিদ্দিক, হজরত উমর ফারুক, হজরত ওসমান গনি ও হজরত আলি করম অল্লাহ অজল্ সর্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ইঁহারাই হজরত জনাব রসূলে করিমের দঃ প্রধান সহচর ছিলেন । খোদায়ে পাক ইঁহাদিগের সম্মান অত্যন্ত অধিক করিয়াছেন । ইঁহাদের মধ্যে হজরত আবুবকরের কন্যা বিবি আয়েশা সিদ্দিকা ও হজরত উমরের কন্যা বিবি হফজার সহিত জনাব রসূলে করিমের দঃ বিবাহ হইয়াছিল । অপর দুইজন সহচর জনাব রসূলে করিমের দঃ জামাতা হইতেন । ইঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র হজরত আলি করম অল্লাহ ওজল্ জনাব রসূলে পাকের দঃ জ্ঞাতি অর্থাৎ খুড়তুত ভ্রাতা হইতেন, ইঁহারই সহিত বিবি ফাতেমার বিবাহ হয় । ইঁহাদের পুত্র জনাব ইমাম হসন ও ইমাম হোসেন রজি অল্লাহ অনহ । তদ্যতীত মোহসেন নামিত আরও এক পুত্র হইয়া ছিলেন, অকালেই তাঁহার মৃত্যু হয় । এই বংশ হইতেই সৈয়দ বংশের উৎপত্তি । জনাব রসূলে করিমের দঃ সংক্ষিপ্ত কুর্সী নামা অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল ।

১। ফেহর ওঃ কোরেশ

২। গালীব

৩। লোতইয়া

৪। কয়াব

৫। মুররা

৬। কেলাব ওঃ ইকিম

৭। কোসইয়া ওঃ মোজ্জমা

৮। অক মুনাফ ওঃ মুগিরা

৯। হাশিম ওঃ অমরু

১০। অবদুল মোতল্লিব ওঃ শয়বতুলহমদ

আবদুল্লা অবিলাহব আবুতালিব আব্বাস হমজা

রসুলে খোদা

অহমদে মুজতেবা

মহম্মদ মুস্তফা—দঃ

বিবি ফাতেমা

খাতুন জিন্নৎ

হজরত আলি হজরত জাফর

করম অল্লাহ ওজহ

হজরত

ইমামহসন

রজিঅল্লাহ

অনহু

হজরত

ইমামহোসেন

রজিঅল্লাহ

অনহু

হজরত

মোহসেন

হজরত জয়নল আবেদিন

রজিঅল্লাহ অনহু

এই কুর্সীনায়ায় লিখিত প্রথম ব্যক্তির নামানুসারেই এই

বংশের নাম কোরেশবংশ বলিয়া পবিত্র কোরাণশরীফে খ্যাত হইয়াছে । ১০ম ব্যক্তির দ্বাদশপুত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫ জনার নাম অত্র স্থলে দেওয়া গেল । করবলায়ুকে জনাব হজরতহসনের বংশ লোপ পায় । তথায় কেবল মাত্র হজরত হোসেন রজিঅল্লা অনহর পুত্র জনাব হজরত জয়নল আবেদিন-কে খোদা রক্ষা করিয়া ছিলেন । তাঁহা হইতেই এক্ষণে খোদাওন্দ করিম সৈয়দবংশকে জগৎময় বিস্তারিত করিয়াছেন । জনাবরসূলে করিমের দঃ পরলোক গমনের পর ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত চারি অসহাব অর্থাৎ সহচর খলিফা অর্থাৎ ধর্ম্য রাজ্যের রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । প্রথমে হজরত আবুবকর সিদ্দিক রজিঅল্লাহ অনহ, ইনি জনাব রসূলে করিম্ দঃ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন । ২য় হজরত উমররজি অল্লাহ অনহ, ইনি হজরত আবুবকর রজি অল্লাহ অনহ অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন । ৩য় হজরত ওসমানগনি রজি অল্লাহ অনহ, ইনি হজরত উমর অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন । ৪র্থ জনাব হজরত অলিকরম্ অল্লাহ অজহ, ইনি সর্বাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন । জনাব হজরত ওসমান রজি অল্লাহ অনহর দ্বারা আবদুল্লা নামের একজন ইহুদি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহার অন্তর নাপাক ছিল, এমন কি সে অন্তরে কাফের ছিল । সে আপন ঈর্ষা বশতঃ কিছুদিনের পর আপন অনুচর বর্গের দ্বারা গুপ্ত-মন্ত্রণা করিয়া হজরত ওসমান দঃ কে শহিদ অর্থাৎ হত্যা করে । তাঁহার পর হজরতআলি খেলাফৎ প্রাপ্ত হন ও জনাব হজরত ওসমানের দঃ শাহাদৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ

করেন । আবদুল্লা বড়ই ধূর্ত ও চতুর ব্যক্তি ছিল সে তৎকালে আপন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া হজরত আলির দঃ বিচক্ষণতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে হজরত অলিকে সম্মুখ করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্তুতিবাদ ও অশেষ গুণাবাদ করিতে আরম্ভ করে, আরও প্রকাশ করে যে, প্রথম তিনজন খলিফা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মাসনের উপযুক্ত ছিলেন না, তাঁহারা অন্যায়রূপে হজরত অলিকে বঞ্চিত করিয়া খলিফা হইয়া ছিলেন, নচেৎ হজরত অলিই একমাত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী । হজরত অলিই পয়গম্বর হইতেন । হজরত জিবরাইল ভ্রমবশতঃ হজরত মহম্মদের দঃ নিকট অবতীর্ণ হইয়া কোরাণ শরিফ নাজেল করেন, তত্রাচ হজরত আলির নামে আরও দশ পারা কোরাণ শরিফ ছিল হজরত ওসমানের সময়ে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । আবদুল্লা একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিল ও অনেকেই তাহার অনুচর ছিল । এইরূপে সে হজরত আলির দঃ হাত হইতে রক্ষা পাইবার বাসনায় আপন অনুচরবর্গসহ হজরত আলির সুস্থন্ধে বিস্তর অলিক ও অযথা স্তুতিবাদ করিতে থাকে । আবদুল্লার অনুচর অর্থাৎ তাহার শিষ্যমণ্ডলীগণ আপনাদিগকে “শিয়য়ে অলি” অর্থাৎ অলির দল বলিয়া ঘোষণা করিত । কিন্তু হজরত অলি দঃ একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন, অশেষ ক্ষমতাশালী ও সুবিচারক ছিলেন, তিনি তাহাদের চাটুবাक্যে মুগ্ধ ও প্রতারিত না হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে এবং সুবিচারে হজরত ওসমানের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত অনেকেই তাঁহার দ্বারা নিহত হয় কিন্তু আবদুল্লার চতুরতা প্রযুক্ত ও ভাগ্যগুণে এবং শরা শরিফ

অনুসারে উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে হজরত অলি দঃ আবদুল্লা কিছুই করিতে পারেন নাই, সে অব্যাহতি পাইয়া যায়। সে কিন্তু হজরত অলির পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিতে এবং তাঁহার অযথা স্তুতিবাদ করিতে ক্ষান্ত থাকে নাই। সেই আবদুল্লার দ্বারা ও তাহারই সময় হইতে “শিয়া” নামিত এক সম্প্রদায় মুসলমানের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে ও বিস্তর শাখা ও প্রশাখা হইয়া গিয়াছে। ইহারা হজরত অলি ব্যতীত অপর অসহাব তিন জনকে মানেন না। কেহ বা হজরত মহম্মদ মুস্তফা দঃ কে ও মানেন না, বলে হজরত অলিই রসূল ছিলেন, কেহ বা হজরত অলির মহত্বগুণে তাঁহাকে খোদার পুত্র এমন কি খোদা বলিতেও ত্রুটি করে না (নউজবিলা মিনহা) ইহারা সূন্নৎ নমাজ পড়ে না, কেবল ফরজ নমাজ পড়ে তাহাও তাহাদের ইচ্ছানু উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও অন্যান্য অনেক প্রকার মত-বিশিষ্ট সম্প্রদায় হইয়া গিয়াছে। এই শিয়াসম্প্রদায় কেবল মাত্র হজরত অলির ভক্ত। বিখ্যাত করবলা যুদ্ধে মহরমমাসে বোগদাদের তৎকালীন রাজা এজিদের সহিত হজরত অলির কনিষ্ঠ পুত্র জনাব হজরত ইমাম হোসেন রজি অল্লাঅনহুর যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি ও তাঁহার অনুসঙ্গিগণ সহিদ হন ; শিয়াগণ সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রতি বৎসর মহরমমাসে প্রকাশ্যভাবে অত্যন্ত শোক ও বিলাপ করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনাতে এজিদ ও তাহার সৈন্যদ্বারা বেরূপ নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছিল তাহা বর্ণনাশীত। এজিদ দিনদার মুসলমান হজরত মা'বুয়ার পুত্র ছিল। হজরত

মাবিয়া একজন সাহাবায়ে রসূল করিম দঃ ছিলেন তাঁহার পুত্র সু-পুত্র না হইয়া কু-পুত্র হইয়াছিল। জনাব রসূলে করিমের দঃ সময়েই বগদাদনগর ইসলাম্রাজ্য-ভুক্ত হইবার পরই হজরত মাবিয়া তখাকার খেলাফতের পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র এজিদ সিংহাসন লাভ করে, সে অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় ছিল। ইসলাম্রাজ্যকালে রাজা অর্থাৎ খলিফার মান্য অপেক্ষা ইমামের মান্য অত্যন্ত অধিক ছিল, সকলেই ইমামকে আপন আপন অস্তুরের সহিত ভক্তিসহকারে সম্মান করিত। এজিদের রাজ্যকালে জনাব হজরত ইমাম হোসেন রজিঅল্লাহ অনহু ইমাম ছিলেন, তাহাতে আবার জনাব পাক পয়গম্বর মহম্মদ মুস্তফা দঃ এর নওয়াসা অর্থাৎ দৌহিত্র অর্থাৎ নাতি হইতেন, এই নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে অস্তুরের সহিত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, ইহা শয়তান এজিদের প্রাণে সহ্য না হওয়ায়, হজরত ইমাম হোসেন রজিঅল্লা অনহুকে বধ করিয়া নিজে ইমাম হইবার কল্পনা করে ও মুরিদ হইবার বাহানা করিয়া অপরের দ্বারা পত্র পাঠাইয়া মদিনা শরিফ হইতে তাঁহা-দিগকে আনাইয়া লয়। ফেরাত নদীর পার্শে করবলা প্রান্তরে আসিয়া তাঁহারা অবস্থিতি করিয়া ছিলেন সেই স্থানেই এই যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই সময়ে প্রকাশ্য শোক ও বিলাপ করা আমার স্মরণে জমাতের মধ্যে অন্তায়, কিন্তু শিয়াগণের মধ্যে ন্তায়। মহরম শব্দ কোন ঘটনা বা কার্যকে বুঝায় না, ইহার অর্থ শোককেও বুঝায়। আরবি ভাষাতে বৎসরের বার মাসের মধ্যে প্রথম মাসের নাম মহরম, যথা—১। মহরম,

২। সফর, ৩। রবিওল-আউল, ৪। রবিওসসানী, ৫। জমা-
দিওল আউল, ৬। জমাদিওসসানী, ৭। রজব, ৮। শাবান,
৯। রমজান, ১০। শওয়াল, ১১। জিকদ, ১২। জিলহজ।
এই মহরমমাসে করবলার যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই সেই ঘটনাকে
শিয়াগণ মহরম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রসিদ্ধ লেখক জনাব
মৌলবি মির মোশররফ হোসেন সাহেব লিখিত বিখ্যাত “বিষাদ
সিন্দু নামক গ্রন্থে এই জগৎবিখ্যাত ঘটনা সম্বন্ধীয় আশুলবৃত্তান্ত
সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এই জগৎবিখ্যাত যুদ্ধে জনাব
রশুলে করিমের দঃ কন্যা ফাতেমা জহরার গর্ভজাত এবং জনাব
হজরতআলি করম আল্লা ওজহর ওরষজাত হজরত ইমাম-
হোসেনের পুত্রগণের মধ্যে কেবল মাত্র ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমের
শয্যাগত পীড়িত হজরত জয়নাল আবেদিন জীবিত ছিলেন।
এক সময়ে এই ভারতবর্ষে তৈমুরাদি সম্রাটগণ শিয়াধর্মাবলম্বী
ছিলেন বলিয়া তাঁহাদেরই কার্যের অনুকরণে এতাবৎকাল
ভারতবর্ষের সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত অজ্ঞব্যক্তিগণ শিয়াগণের
শোকোচ্ছাসের পরিবর্তে আমোদোচ্ছলে মহরমের সময়
তাজিয়াদারী আদি কার্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই
আমোদের স্থলে নানা স্থানে নানা প্রকার অশান্তিকর ঘটনা
ঘটিয়া সমাজের মধ্যে বিস্তর অনিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আমার
স্বল্প জমাতভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই মহরমমাসে কোরাণ-
শরিফ পাঠ, দান, খয়রাত, রোজা, নমাজাদি সংকার্য্য করাই
শ্রেয়।

২৩। শিয়াগণের ন্যায় আমার মুসলমান ধর্মের মধ্যে

অনেক শাখা ও প্রশাখা হইয়া গিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে এক দলকে “ওহাবী” কহে আরবদেশে মদিনা শরিফের সম্মিধ্যে নজদ নামিত নগর আছে, তথায় আবদুল ওহাব নামিত একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়াছিল । এক শত বৎসরের অধিক হইল এক সময়ে মহামান্য তুর্কির শুলতান খলিফতল ইসলামের রাজধানীতে কোন প্রকার বিপ্লব হইয়া যায়, আবদুল ওহাব সেই সুযোগে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার মানসে স্বীয় অনুচরবর্গসহ আপনাকে পয়গম্বর বলিয়া ঘোষণা করে এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনাশরিফের বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে বিধর্ম্যাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে এবং অনেককে শহিদ করিয়া দেয় । তাহার এক মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম মহম্মদ, সে আপন পিতার মতানুযায়ী আরবিভাষায় এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে ওহাবিগণের ধর্ম পুস্তক বলিয়া গণ্য । ইহারা আমার সূক্ষ্ম জমাত ভুক্ত ইমাম্ চারি জনার মধ্যে কাহারও অনুকরণ অথবা বশ্যতা স্বীকার করে না । এই চারিজনার মতানুযায়ী যাহার যে কার্যকে আপনাদের মতানুসারে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করে তাহারা তাহাই করে । ইহারা আমাদের পরম দয়ালু ও ধর্মপরায়ণ, ইংরাজরাজ্য ভারতখণ্ডকে “দারুলহরব” অর্থাৎ অধর্ম রাজ্য বলিয়া প্রকাশ করে । ইহারা আমাদের শান্তি-প্রিয় ইংরাজরাজ্যের প্রধান শত্রু বলিয়া গণ্য । প্রকৃত প্রস্তাবে ও কেতাব অনুসারে ইংরাজ রাজকে কোন প্রকারেই “দারুল-হরব” বলা যাইতে পারে না, তদনুরূপ ইহাকে “দারুল-

ইসলাম” ও বলা যায় না, কারণ এখানে ইসলামের শরাজারি নাই, অতএব ইহা একরূপ “দারুল একিণ” হইতেছে । এই ধর্মপরায়ণ ইংরাজজাতি আপন রাজ্য, কেবল মুসলমান কেন, কোন ধর্মের কাহাকেও কোন প্রকার ধর্মকার্যে কখনও কোনই বাধা দেন নাই । কখন কাহারও ধর্মের কোন প্রকার বাধা দিবেন না বলিয়াই রাজ্যের আরম্ভকাল হইতে আপন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন । এই সুবিশাল ভারতখণ্ডের মধ্যে সকলেই আপন আপন ধর্মকার্য স্বাধীনভাবে ও অবাধে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন । এই ওহাবীগণের ধর্ম, সূন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন । ইহারা কেবল হাদিসশরীফের অর্থের উপর জোর দিয়া ও যাহাকে আপনাদের বিবেচনায় প্রবল বলিয়া স্থির করে তদনুসারেই কার্য করে । ইহারা আপনাদের ধর্ম-গুরু পূর্ব-কৃত অপরাধ ও উপস্থিত রাজ-দণ্ডের ভয়ে এক্ষণে আপনাদিগকে আর ওহাবী বলিয়া স্বীকার না করিয়া আপনাদিগকে “অহলে হাদিস বলিয়া” প্রকাশ করে, কেহবা আপনাকে “মহম্মদি” বলিয়াও জানায় । জনাব ইমাম আজমরজি অল্লা অনহু অনেক বিষয়ের ভাল, মন্দ, শুভ ও অশুভ আদি ভাবিয়া এবং অকলন ও দলিলুন সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচনা করিয়া আপন মতের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন ; ইহাকে তাহারা অন্যায় ভাবিয়া জনাব ইমাম আজমের মতাবলম্বী হনফিগণের সহিত অধিকতর শত্রুতা করিয়া থাকে । ইহারাও আমাদের অন্যান্য তিন ইমামের মতানুসারে নমাজে “রফায়েদেন” করিয়া থাকে, ইমামের অধিনে নমাজ পড়িবার সময় ইমামের সুরায়ে

ফাতেহা পাঠ শেষ হইবার পর প্রত্যেকে 'আমিন' শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে । ইমামের সুরায়ে ফাতেহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে মুকতেদিগণ ও তাহা পাঠ করিয়া থাকে, এই সব ক্রিয়া আমার হনফি মতানুসারে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনুচিত । এই আহলে হদিস নাম ধারণ করা তাহাদের পক্ষে অন্যায়, কারণ মুসলমান মাত্রেই হদিস শরিফকে মানেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন, অতএব আহলে হদিস সকলেরই কেবল তাহাদেরই নহে । ওহাবী বলিতে গেলে তাহাদের আদিগুরু আবদুল্লা ওহাব আসিয়া পড়ে ও তৎকৃত কার্য্যের জন্য দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে হইবে, এই নিমিত্ত ইহারা এক্ষণে আর ওহাবী বলিয়া স্বীকার করিতেছে না । ফলতঃ বিবেচনা করিতে গেলেই ইহারা এক প্রকারে শিয়াগণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ । অনেক কার্য্যকে ইমাম আজম সাহেব আকূল অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন এ নির্বোধগণের বুদ্ধি ও বিবেচনা নাই বলিয়াই ইমাম আজম সাহেবের মতের পোষকতা না করিয়া তাঁহার সহিত শত্রুতা করে । শিয়াগণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নিষ্ঠা ও প্রবৃত্তি নিতান্ত স্বাভাবিক, ওহাবীগণের তাহা নহে । ইহারা চারি অসহাবকে মানে রসুলে খোদাকে মানে, তবে ইহারা আমাদের কোন বিশেষ ইমামের বশ্যতা স্বীকার করে না । এই নিমিত্ত তাহাদিগকে “গএর মোকাল্লেদ” বলা যায় । ইহাদের সমন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার মেদিনীপুর নিবাসী শাহ আবদুল জলিল কাদরী সাহেবের লিখিত “সেরাজুল ইমান ফিবয়ানি তস্বিছল ওহাবিয়ান” নামিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । শিয়া-

গণের মধ্যে “রাফজি” ও “খারজি” আদি নামের অনেক সম্প্রদায় হইয়া গিয়াছে । কেবল মুসলমানগণের মধ্যেই যে মতের বিভিন্নতা প্রযুক্ত এত শাখা ও প্রশাখা হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই এইরূপ মতের বিভিন্নতা আছে । খৃষ্টান ধর্ম্মে ৭২, ইহুদিগণের মধ্যে ৭১ সম্প্রদায় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধাদি ধর্ম্মেও এই অসংখ্য অসংখ্য সম্প্রদায় রহিয়াছে । ইহাও ঈশ্বরের একটি মহৎ লীলা, কোনস্থানেই এক নাই, তিনি একাই এক, সর্বত্রই এক অপেক্ষা অধিক । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ৭৩ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি স্বর্গবাসী হইবেন, ইহার মধ্যে যে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি স্বর্গবাসী হইবেন ও কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি স্বর্গবাসী হইবেন না তাহা ঈশ্বর ব্যতীত কেহই জানেন না । জগতে এই সমূহ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্তম্ভৎ জমাতভুক্ত হনফি মতাবলম্বী মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, ধরিতে গেলে কেবল হনফিগণ তিনভাগ ও অপর ৭২ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা এক ভাগ মাত্রও হইতে পারে কিনা সন্দেহ । শিয়াগণ ও ওহাবিগণ “রফায়েদেন” করেন ও “আমিন” শব্দ কিঞ্চিৎ জোরে উচ্চারণ করেন বলিয়া আমার স্তম্ভৎজমাত ভুক্ত হনফিগণের মধ্যে অনেকে দোষ ধরেন, তাহাদের এই কার্য্য দোষের মধ্যে গন্য হইতে পারে না, কারণ আমার স্তম্ভৎ জমাত ভুক্ত হনফি সম্প্রদায় ব্যতীত অপর তিন সম্প্রদায়ে এই কার্য্যের বশবর্ত্তী হইতেছেন । নমাজের সময় হস্ত উত্তোলন করাকেই রফায়েদেন কহা যায় । ইহা

এক প্রকার আমার হনফি সম্প্রদায়েও রহিয়াছে। যথা প্রত্যেক নমাজের প্রারম্ভে, বিতরের নমাজের সময়ে, ইদয়েনের নমাজের সময়ে এবং জনাজার নমাজের সময়ে আমরাও ইহা তামিল করিয়া থাকি, কিন্তু শিয়াগণ ও অপরে প্রত্যেক নমাজের রুকু ও সজুদ আদি ক্রিয়ার পূর্বে ইহা সম্পন্ন করেন। এই প্রথা প্রচলনের কারণ এই যে, জনাব রসুলে করিমের দঃ আমলে কোন এক সময়ে নবদিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কাকের ধর্ম ত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলামধর্ম অবলম্বনের পরও আপনাদের বহুকালের পূজ্য পুতুলিকাকে ভুলিতে না পারিয়া লুকাইয়া রাখিয়া পবিত্র নমাজের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। জনাব রসুলে করিম দঃ আপন ক্ষমতা বলে তাহা জানিতে পারিলেন, কোন প্রকারে তাহাদের মনে কষ্ট না দিয়া প্রত্যেক নমাজের সময়ে রুকু ও সজুদ আদি ক্রিয়া কালে রফয়েদেনের ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং তদসহ স্বয়ং ও তাহা সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে নমাজের সময়ে এ ক্রিয়ার আর আবশ্যক হয় না এবং নিজেও তাহা আর করেন না, কিন্তু এই আদেশ ও ব্যবস্থা রদ হইবার জন্য জনাব রসুলে পাকের দঃ কোন বিশেষ হাদিস শরিফ বিপক্ষগণ পান নাই বলিয়াই প্রকাশ করেন। তজ্জন্মই তাঁহারা সেই কার্যটি এতাবৎ কাল সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমার ইমাম আজম জনাব আবু হনিফা রজি অল্লাহ অনহু এই আদেশ ও ব্যবস্থাকে সাময়িক আদেশ বলিয়া ধরিয়াছেন। উহা রদ হইবার নিমিত্ত পৃথক আদেশ অনাবশ্যক। যে কালে এই

কার্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল সে কাল এখন আর নাই অতএব তদনুরূপ রক্ষায়েদেন সহকারে নমাজ সম্পন্ন করা অনুচিত বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মহা মহা বিদ্বান ব্যক্তিগণ মান্য করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন । শিরাগণের মধ্যে এই রক্ষায়েদেন ব্যতীত আরও অন্যান্য অনেক গর্হিত কার্যের প্রচলন রহিয়াছে, যাহা আমরা স্মরণে জমাতভুক্ত চারি সম্প্রদায় হইতে বহিভূত, তন্মধ্যে অনেকেই নিতান্ত ঘৃণিত, অব্যবহার্য ও দোষণীয় । তাহাদের মধ্যে অনেকে রসুলে মকবুল দঃ কেও স্বীকার করেন না । জগতে এই প্রকার ইসলামের বিরোধী ও বিধর্ম্যাবলম্বী অনেকই আছেন । তাঁহারা কোন প্রকারেই মুসলমান মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না । পরদ্বার গমন ইহাদের মধ্যে এক প্রকার পাপ নহে । ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্ম সম্পর্ক ও সম্বন্ধের বিচার ইহাদের মধ্যে এক প্রকার নাই । ইহাদের মধ্যে “মোতা” নামিত এক প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তদ্বারা কিছু সময় নির্ধার্য করিয়া এমন কি ২।১ রাত্রে জন্ম ও (বেশ্যাগমনের ন্যায়) কোন একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া লইতে পারেন ; সেই সময় অতীত হইলেই তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না । তৎপরে সেই স্ত্রী অপর একজনকে বিবাহ করিতে পারে, এইরূপে তাঁহার শত সহস্র বিবাহ হইলেও কোন দোষ হয় না । তদনুরূপ পুরুষেও বেশ্যা গমনের ন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক অথবা ঋণকালের জন্মও নব, নব, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন । হজরত সাদি একস্থানে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“জনে নওকুন আর দোস্ত হর নও বাহার
কে তকবিম পারিনা ন আয়েদ বকার”

ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক নও-বাহার অর্থাৎ প্রত্যেক বসন্তকালে বৃক্ষলতাদির পুরাতন পাতা পড়িয়া গিয়া নূতন পাতা হওয়ায় যেমন তাহার নূতন বাহার হয় অর্থাৎ সুন্দররূপ ধারণ করে তেমনই নব নব স্ত্রী গ্রহণ করাও কর্তব্য যথা পঞ্জিকা পুরাতন হইয়া গেলে যেমন কোন কাজে আসে না আবার হাল সনের নূতন পঞ্জিকা ক্রয় করিতে হয় তেমনই স্ত্রীর পরিবর্তন ও একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার শিয়া ভায়াগণ হজরত সাদির এই পবিত্র বচনের মুরিদ হইতেছেন। একটি স্ত্রীর ১০টী সন্তান ১০ জন পিতার নামে পরিচিত হইবে। এই প্রথা প্রচলন হইবার কারণ এই যে কোন এক জেহাদের সময়ে জনাব রসুলে করিম দঃ আপন সৈনিক পুরুষগণকে দীর্ঘ-কাল দেশত্যাগী হওয়া বশতঃ স্ত্রীমানুরাগী হইতে দেখিয়া পাছে তাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায় তখন ক্ষণ কালের নিমিত্ত তাহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্ম সেই সব সৈনিক পুরুষকে নিকটবর্তী নগরে বা পল্লীতে এইরূপ বিবাহের স্ত্রী পাওয়া গেলে এই ব্যবহারের আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন। তাহা চিরকালের জন্য বলবৎ থাকা কোন প্রকারেই যুক্তি সংগত নহে। শিয়াগণের ন্যায় পবিত্র নমাজের কার্যে ওহাবিগণের সহিত আমাদের বিস্তর অনৈক্যতা আছে। নমাজের সময়ে ইমামের পশ্চাতে নিয়ৎ করিবার

পর ইমাম যখন উচ্চঃরবে সুরায়ে ফাতেহা পাঠ করেন, ওহাবী মুকতেদিগণ ও প্রত্যেকে মৃদুস্বরে তাহা পাঠ করে। আমার হনফি মতে মুকতেদিগণের তদনুরূপ পাঠের কোন আবশ্যক নাই বলিয়াই ব্যবস্থা। ইমামের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লওয়ার পর মুকতেদির পক্ষে সুরায়ে ফাতেহা বা যে কোনও আয়েতে কোরাণ পাঠ করা অন্যায় তদ্বারা ইমামের বশ্যতার অবমাননা হইয়া পড়ে। এইরূপে ইমামের উচ্চঃরবে সুরায়ে ফাতেহা পাঠ শেষ হইলেই ওহাবিগণের মধ্যে ইমাম ও মুকতেদি সকলেই উচ্চঃরবে “আমীন” শব্দ সমন্বরে উচ্চারণ করে। এইরূপ উচ্চঃরবে এই শব্দ উচ্চারণ করা অন্যায়। ইহা কোরাণের শব্দ নহে, রসুলে পাকের ব্যবস্থা মাত্র। সুরায়ে ফাতেহা পাঠ শেষ হইলেই তাহার ভাব ও অর্থ অনুযায়ী এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া খোদায়ে পাকের অভিমতে মত দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য, তবে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেই যে তাহার ভাব বুঝাইবে নচেৎ মনে মনে তাহা উচ্চারণ করিলে যে ঈশ্বর জানিতে পারিবেন না এমন নহে। আমার হনফি মতে “আমিন” শব্দ প্রত্যেককে মনে মনে পড়িবার ব্যবস্থা। এই প্রকারে ওহাবিগণের বিস্তর ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায় এবং হনফিগণ তাহাদের ভ্রম ধরেন ও জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করেন বলিয়া ওহাবিগণ জনাব ইমাম আজম সাহেবকে এবং তাঁহার মতাবলম্বী হনফিগণকে প্রাণের শত্রু স্বরূপ বিবেচনা করে, এই জন্য এই উভয় সম্প্রদায়ে বিস্তর বিরোধ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সৌজন্য ।

১। সতত সত্য কথা বলাই আবশ্যক ও সত্যবাদীকে ভালবাসা উচিত ।

২। কখনই মিথ্যা কথা কথা উচিত নহে ও মিথ্যাবাদীকে ভালবাসা এবং মিথ্যাবাদীর সহিত প্রণয় করা কর্তব্য নহে । যে মিথ্যা কথা বলিতে পারে সে মিথ্যা কার্যও করিতে পারিবে, অতএব তাহার নিকট হইতে দূরে থাকাই উচিত ।

৩। মিথ্যা সম্পর্কীয় কোন কার্যের সংশ্রবে থাকা কর্তব্য নহে, যে মিথ্যায় কাহারও কোন উপকার বা অপকার নাই তাহার নিকট হইতে ও দূরে থাকা উচিত । মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ, ইহাতে জগতের ও নিজের অশেষ অমঙ্গল হয়, সম্মানের হানি হয় ও আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায় ।

৪। কোন মিথ্যা কথা বলিলে অপরের উপকার হইবে জানিতে বা বুঝিতে পারিলেও সে মিথ্যার সংশ্রবে থাকা কর্তব্য নহে ।

৫। সতত অপ্রিয় সত্য কথা বলা উচিত নহে । কাল-বিশেষে এরূপ সত্য না বলিলেও নয়, এমনও সময় হইতে পারে কিন্তু তাহাও ত্যাগ করা কর্তব্য ।

৬। সত্য বলিলে নিজের অনিষ্ট বা মন্দ হইবে বুঝিতে পারিলেও সত্যকথা বলিতে কখন ভোলা উচিত নহে । ঈশ্বর সত্যবাদীকেই ভালবাসেন । মোলানা সাহি বলিয়াছেন :—

পার্শী ।

“রাস্তী মুজ্জিবে রেজায়ে খোদাত্ত
কস নদিদম্ কে গুম গুম অজ্জাহরাস্ত”

ইহার অর্থ এই যে সত্যবাদী হইলেই ঈশ্বরের প্রিয় হয় । এমন কখন কাহাকেও দেখা যায় নাই যে, সে সত্য পথ হইতে পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার সত্যবাদিত্বগুণে তাহার কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটিয়াছে ।

৭। মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, এই মহান্ মন্ত্র মনোগধ্যে সতত স্মরণ রাখিলে ঈশ্বর অবশুই তাহাকে সত্যবাদী করিবেন ও ইহার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিলে কখনই সে মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না, ইহাতে জগতের অশেষ অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে ।

৮। কাহাকেও কোন কার্যের জন্য অথবা কিছু প্রদান করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলে নিজ বাক্যকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিবার জন্য যথা সময়ে অথবা তৎপূর্বে যে কোন প্রকারে হয় আপনবাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করা উচিত, অর্থাৎ সেই কার্য করা কর্তব্য । ইহাতে লোকে ভালবাসিবে ও ভক্তি এবং বিশ্বাস করিবে । এইরূপে সত্য ব্যবহারে ও সত্যবাদিত্ব-গুণের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া অনেকে অতি দীন হীন অবস্থা হইতে অতি উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইতে দেখা গিয়াছে । সত্যবাদীকে লোকে যেমন ভালবাসে ও ভক্তি করে তেমনই অনেক সময়ে অনেকে ভয় ও করিয়া থাকে ।

মিথ্যাবাদকে কেহ কখন ভয় ও ভক্তি করে না। মিথ্যা কথা বলিলে জ্বানের তামির অর্থাৎ বাক্যের সফলতা হয় না। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি যতই দোয়া, দরুদ বা এবাদৎ বন্দেগী করুন না কেন তাহাতে তাঁহার কোনই ফল হয় না। সংসারে লিপ্ত থাকিলে অধিক কথা বলিতে হইবে ও অধিক কথা বলিতে হইলে মিথ্যা কথাও মুখ হইতে বহির্গত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে এই নিমিত্ত অনেক সাধু ও ফকির বনে ও নির্জন্মে গিয়া আপন আরাধনা ও তপস্যা করিতে থাকেন, এমন কি অনেকে বাক্যলাপ ও বন্ধ করিয়া দেন। মিথ্যা কথা না বলাই মিথ্যার সংশ্রবে না থাকাই জগতে থাকিয়া শত সহস্র আরাধনা ও উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। কেবল এই কারণেই ফ্রিমেশন নামিত এক সম্প্রদায় (থিষ্ট ধর্মাবলম্বী) যাঁহারা কেবল একমাত্র ঈশ্বরোপাসক, বেশি কথা না বলাই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম, কারণ বেশী কথা বলিতে গেলে মিথ্যা কথা ও কথিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই প্রকারে জগতে এমন কোন ধর্ম নাই যে, তাঁহারা মিথ্যাকে মন্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই অতএব এই মিথ্যা কথনরূপ সর্ববাদী সম্মত নিকৃষ্ট ব্যবহার হইতে দূরে থাকাই প্রত্যেক ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

৯। সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে সত্য কথার উপরে হটক বা মিথ্যা কথার উপরে হটক পর নিন্দা অর্থাৎ যাহাতে অপরের সম্মানের হানি হইতে পারিবে তদ্রূপ কোন কথা কাহারও সম্মুখে বলা মহাপাপ, কাহারও সহিত কোন কারণে মনোমালিন্য বশতঃ কোন কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়া উঠিলে তাহার

অসাক্ষাতে না বলিয়া সাক্ষাতে ২।৪ কথা বলিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইয়া দেওয়া একরূপ মন্দ নহে, কিন্তু অসাক্ষাতে একটি মাত্র কথা বলাও উচিত নহে। তাহাকেই গিবৎ অর্থীৎ পর-নিন্দা কহে। সর্ব শাস্ত্রে ইহা মহাপাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পবিত্র কোরাণ শরিফ ও ইহার অশেষ প্রমাণ দিতেছে “সুন্নায়ে হোজরাত” তাহার প্রমাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরোপকারিতা।

১। নিজের স্বার্থ বা অপরের উপকার জন্ম কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করা কর্তব্য নহে।

১। জীব দয়া করাই মনুষ্যজীবনের প্রধান ধর্ম, “অহিংসা পরম ধর্ম” এই মহাবাক্য প্রত্যেক ধর্মের মূলমন্ত্র হইতেছে, অতএব জীব মাত্রকেই দয়া করা কর্তব্য। যাহার শরীরে দয়া নাই তাহাকে জালেম অর্থীৎ অত্যাচারী কহে। জালেমের ইহকাল ও পরকাল কোথাও সুখ নাই। তিনি ইহকালে নিজ মনের আক্ষেপে ও ক্রোধে দগ্ধ হইতে থাকেন, পরকালে নিজের নিষ্ঠুরতাজনিত পাপের জন্ম সর্ব শাস্ত্রানুমোদিত ঈশ্বরের আদেশ ও ব্যবস্থা অনুসারে চিরকাল নরকাগ্নিতে পুড়িতে থাকিবেন।

৩। অপরের দোষ জানিতে পারিলে অথবা দেখিতে পাইলে ইচ্ছাপূর্বক তাহা প্রকাশ করিয়া কখন কাহারও সম্মানের হানি করা উচিত নহে, যদিও কোন সময়ে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হয় তথাপি তাহা গোপন করিয়া মিথ্যাবাদী হওয়া কর্তব্য নহে ।

৪। নিজ জীবনের ও ধনের অনিষ্ট হইতে পারে জানিতে পারিলেও পরের উপকার করিতে কখনই ক্রটি করা উচিত নহে, এইরূপ কার্য্য জ্ঞাত ঈশ্বর কখনই কাহারও কোন অনিষ্ট করেন না ।

৫। পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া নিজ মনোমধ্যে ধারণা করা কর্তব্য । শারীরিক ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা পরের দুঃখ বা কষ্টকে মোচন করা উচিত ।

৬। যে কার্য্য করিলে জনসাধারণ অথবা অধিক সংখ্যক লোকে সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে তাহার বিপরিত কোন কার্য্য করা অন্যায অর্থাৎ বাহাতে অধিক সংখ্যক লোকে সুখী ও সন্তুষ্ট হইতে পারে তাহাই করা কর্তব্য ।

৭। কোন কার্য্য করিলে একজন বা ২।১০ জন লোকে সন্তুষ্ট হইবে কিন্তু অসংখ্য লোকে অসন্তুষ্ট হইবে এমত অবস্থায় অসংখ্য লোকের নিকট অপ্রিয় হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তৎকালে আপন হিতাহিত জ্ঞান ও সত্য বা মিথ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক ।

৮। নিজের সুখ ও সচ্ছন্দতা হেতু কি আপন ইচ্ছা পূর্ণ জ্ঞাত পরের মনে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ও পরের

ধনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং অপরের সম্মানের প্রতি ঈর্ষা করা নিতান্ত অন্যায্য ।

৯ । জীবের জীবন নিরাকার পদার্থ । ইহা জীবের সৃষ্টি-কর্তা সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের পবিত্র নূর অর্থাৎ জ্যোতির অংশ স্বরূপ, এই নিমিত্ত ইহার ধ্বংস বা লয় ও ক্ষয় নাই, অতএব প্রত্যেক জীবেরই স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান বুঝিয়া লইতে হইবে । পবিত্র কোরাণ শরিফের “সুরায়ে কাফ” তাহার প্রমাণ দিতেছে । অতএব অযথা ও অন্যায্যরূপে কখন কোন জীবের কষ্ট দিলে স্বয়ং ঈশ্বর সেই কষ্ট অনুভব করিবেন । এজন্য কখন কোন জীব অযথা বা নিজ স্বার্থ বা সুখের জন্ত কাহাকেও কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অন্যায্য । এই জীব সম্বন্ধে কোন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন,—

পাশী ।

“গর ন বুদে জাত হক্ অনর অজুদ

আব ও গিল রা কয় মলক্ কয়দে সজুদ”

ইহার অর্থ এই যে, যদি মনুষ্যদেহে ঈশ্বরের অংশ না থাকিত তবে এই মৃত্তিকা নির্মিত অপদার্থ দেহকে কেন ফেরেস্তাগণ অর্থাৎ ঈশ্বরের দূতগণ সেজদা করিতেন । পবিত্র কোরাণ শরিফে ইহার ইতিহাস এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জগতের সৃষ্টির পর খোদায়েপাক যখন মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিবার বাসনা করিলেন, তখন তাঁহার প্রধান ও পবিত্র দূত হজরত জীবরাইল দঃ কে আদেশ করিলেন যে, পৃথিবী হইতে একমুষ্টি মৃত্তিকা আনয়ন কর, তদনুসারে হজরত জীবরাইল দঃ এক মুষ্টি মৃত্তিকা

লইয়া গেলেন । ঈশ্বরের সৃষ্টি কোশলে সেই মৃত্তিকাতে মনুষ্য আকারের এক দেহ গঠিত হইল । পরে তাহাতে ঈশ্বর জীবন-দান করিলেন, সে জীবিত হইয়া দাঁড়াইল । তিনিই মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ হজরত আদম হইলেন, তৎকালে ঈশ্বর আপন দূত-গণকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা সকলে ইহার অর্থাৎ আদমের সম্মুখীন হইয়া ইহাকে সিজদা কর । ফেরেস্তাগণ তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিলেন অর্থাৎ আদমকে সিজদা করিলেন, কেবল অজাজীল নামক একজন ফেরেস্তা আপন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মৃত্তিকা নির্মিত দেহকে অবজ্ঞা করিল ও সিজদা করিল না । এই অপরাধে সে ঈশ্বর সন্নিধান হইতে তৎক্ষণাৎ স্বর্গচ্যুত হইল ও ভূতলে নিষ্কিন্তু হইল, লানতের তওক অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতার তক্তী তাহার গলায় পড়িল, সে আর কখন স্বর্গ পাইবে না । সেও তাহার বংশজাত এবং অনুচরবর্গগণ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি অবধি হজরত আদম দঃ হইতে জগতের লয় পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতিকে কুপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছে । সে ঈশ্বরের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে বর পাইয়াছে । ইহাদিগকেই শয়তান কহা যায় ।

১০ । ঈশ্বর আপন সৃষ্টিকোশলে মনুষ্যজাতিকে যে প্রকারে সৃজন করিয়াছেন ও যে প্রকারে আপন পবিত্র জ্যোতির অংশ তাহাতে প্রদান করিয়াছেন তন্নিমিত্ত যে আমাদের আদি পুরুষ হজরত আদম অথবা তাঁহার বংশধর কোন না কোন মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করা আমাদের উচিত নহে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

উদ্দৃষ্ট।

“আদম কো খোদা মং কহো আদম খোদা নহি
ওলেয়কিন খোদাকে নূর সে আদম জুদা নহি”

ইহার অর্থ এই যে মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিও না। মনুষ্য ঈশ্বর নহে, তবে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি হইতে মনুষ্য পৃথক নহে।

১১। নিজের ধন ও জন অপেক্ষা অপরের ধন ও জনের প্রতি বিশেষ আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করা কর্তব্য।

১২। ভিত্তারী দুঃখী বা কোন প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কখন কোন প্রকার বিরক্তিতাব প্রকাশ করা উচিত নহে। আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা যথা-সাধ্য আর্থিক ও শারীরিক সাহায্যে তাহাকে সমুদ্বর্ত্ত করিয়া বিদায় দেওয়া কর্তব্য। পবিত্র কলম শরিফে খুদ খোদাওন্দ করিম প্রকাশ করিয়াছেন :—

আয়েত শরিফ, আরবি।

“ফ অম্মক এতিমা ফলা তকহর ও অম্মস সায়েলা
ফলা তনহর ও অম্মা বেনেমামতে রবেব কা ফহদিস”

ইহার অর্থ এই যে এতিম অর্থাৎ অসহায়ের প্রতি অত্যাচার করিও না ও ভিক্ষকের প্রতি রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিও না এবং ঈশ্বর যে তোমাকে দান করিয়াছেন, তুমি তাহার বর্ণনা কর। এই মর্মে আমার রসুলেপাক বলিয়াছেন, হাদিস শরিফ :—

আরবি।

“মা অফলহা মন রদস সায়েলা”

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি প্রার্থীকে বঞ্চিত করেন কখনই তাহার মঙ্গল হইবে না।

১৩। মিষ্ট বাক্যের সহিত দান, ক্ষমার সহিত বীরত্ব, গর্ব-শূন্য জ্ঞান ও স্বার্থ শূন্য ধন ইহাই মনুষ্য জীবনের গৌরব স্থল। ইহার বিপরীত কোন কার্যকর কাহারও কর্তব্য নহে। তাহাতে লোক সমাজে নিন্দনীয় ও ঈশ্বর সমীপে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

১৪। দয়া ও দান করিবার নিমিত্ত কখন সুপাত্র ও অপাত্রের বিচার করা উচিত নহে। মোলানা সাহেব বলিয়াছেন :—

পার্সী।

“গিরেহ বর সরে বন্দ অহসাঁ মজন
কে ই জরক শয়দস্ত ও আঁ মকরো ফন”

ইহার অর্থ এই যে কাহারও কোন উপকার করিতে হইলে অর্থাৎ কাহাকেও কিছু দিতে হইলে তৎকালে তাহার দোষ বা গুণ ধরিয়া বিচার করা অথবা ফন্দিফরের ও ছলনা করিতেছে বলিয়া বাহানা করিয়া কিছুই না দিবার উদ্দেশে থলির মুখ বন্দ করা অর্থাৎ না দেওয়া উচিত নহে। এমন কি দানের সময়ে স্বজাতি বা বিজাতি সম্বন্ধের ধারণা মনোমধ্যে করা অনুচিত। জনাব রসুলেকরিম দঃ আদেশ করিয়াছেন, হাদিস শরিফ :—

আরবি :

“লা এর হমুল লাহো ফিল আখেরতে মন লা

এর হমুন নাসা মিলল মত্ত মিনি ওলকাফেরিং”

ইহার অর্থ এই যে স্বধর্মাবলম্বী ও বিধর্মাবলম্বীর বিবেচনা না করিয়া দান করিলেই তোমার পরকালে উপকার হইবে ।

১৫ । দানে কখন কোন দানগ্রাহীর ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে তাহার প্রতি কখন কোন রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । মিষ্ট বাক্যে ও বিনয়-ব্যবহারে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দেওয়া উচিত । জীবে দয়া করিলেই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইতে পারা যাইবে ।

১৬ । কখন কোন ভিখারী ও প্রার্থী যেন নীরাশ বা ক্ষুন্ন-মনাঃ হইয়া বাটী হইতে ফিরিয়া না যায় । অন্তরিক ভক্তি ও মিষ্ট বাক্যের সহিত তাহার আদর করা উচিত এবং যে প্রকারে হয় তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দেওয়া কর্তব্য । সর্ব শাস্ত্রে বলে যাহা দান করা যায় ঈশ্বর তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে তাহার দশগুণ প্রদান করেন, অতএব ভিখারীকে যাহা দেওয়া যায় তাহার দশগুণ ঈশ্বরের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু ভিখারী নীরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে নিজের পূর্ব সঞ্চিত শতগুণ পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়াছেন :—

উর্দূ ।

“খাদেমে মিসাঁ কঁ যো হো ওহ ফিল হকিকত শাহ হায় ।

মরতবা ইনসান সে বালা হায় সগে দরবার কা ॥”

ইহার অর্থ এই যে যিনি দীন ও দরিদ্রের সেবা করেন তিনিই

প্রকৃত সুখী অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় অতএব কেবল নামের মনুষ্য হওয়া অপেক্ষা স্বয়ং হুজুরের অর্থাৎ ঈশ্বরের দরবারের কুকুর হওয়াই ভাল । এই নিমিত্ত দীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করা অপেক্ষা সৎকার্য আর কি হইতে পারে ।

১৭। কোন অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয়, কুটুম্ব ও রাহী, মোসাফেরের যত্ন ও সেবা করিতে কখন ত্রুটি বা অবহেলা করা উচিত নহে । যে কোন প্রকার হয় আদর অভ্যর্থনার দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য । পবিত্র কোরাণ শরিফের অনেক স্থলে এবিষয়ের আদেশ আছে । এম পারার “সূরায়ে নেসা” ইহার প্রমাণ দিতেছে । নিজে যাহা খাওয়া যায় তাহাকেও তাহাই খাওয়ান কর্তব্য এমন কি উভয়ে এক স্থানে আহার করা উচিত । এই উদ্দেশে কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়া গিয়াছেন,—

পাশী ।

“হরকে খিদমৎ কর্দ উমখদুম শুদ

হরকে খুদরা দিদ উ মহরুম শুদ”

ইহার অর্থ এই যে যিনি আত্মাভিমानी হইলেন তিনিই ঘৃণিত হইলেন ও যিনি পরের খেদমৎ অর্থাৎ সেবা করিলেন তিনিই পূজনীয় হইলেন । পরের সেবা করিলে স্বয়ং ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন অতএব ঈশ্বর যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তিনি কেননা পূজনীয় হইবেন ।

১৮। যে ব্যক্তি দান, খয়রাত ও আবশ্যিক মত নিয়মিতরূপে ব্যয় না করেন, ধন সম্পত্তি ও উপযুক্ত সম্বল থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আপন সম্মান রক্ষার্থে তদুপযুক্ত ব্যয় না করেন অথবা

যিনি কখন পরের উপকার করেন না তাঁহাকেই কৃপণ কহে ।
খুদ রসুলেপাক দঃ বলিয়া গিয়াছেন হাদিস শরিফ হইতেছে যে,—

আরবি ।

“অস সখিও হবিবুল্লাহে ও লওকানা ফাসেকা

অল বখিলো ওহু ওল্লাহে ও লওকানা জাহেদা”

ইহার অর্থ এই যে, দানশীল ব্যক্তি ঈশ্বরের বন্ধু ও কৃপণ ব্যক্তি ঈশ্বরের শত্রু হইতেছেন । কৃপণের ইহকাল ও পরকালে কোথাও সুখ নাই, ইহকালে নিজের মানসিক চিন্তায় নিয়তই দগ্ধ হইতে থাকেন এবং পরোপকারিতা ও সৌজন্যতাগুণের অভাবজনিত দোষে ও পাপে পরকালে ঈশ্বর আদেশে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকেন ইহাই সর্ব শাস্ত্রের ব্যবস্থা । মহাজ্ঞানি সাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পার্সী ।

“বখিল অরচে বাশদ জাহেদে বহরো বর

বহস্তি নবাশদ বহুকমে খবর”

ইহার অর্থ এই যে, কৃপণ ব্যক্তি যতই এবাদৎ ও বন্দেগী করুন না কেন, শাস্ত্রে আছে যে তিনি কখনই স্বর্গবাসী হইবেন না । এই মর্মে আমার রসুলে করিম পাক পয়গম্বর দঃ সাহেব বলিয়া গিয়াছেন হাদিস শরিফ হইতেছে যে,—

আরবি ।

“অল বখিলো বইছুম মিনল্লাহে ও

বইছুম মিনল জন্নতে ও করিবুন এলন নার”

ইহার অর্থ এই যে, কৃপণ ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে ও স্বর্গ হইতে দূরে,

কিন্তু নরকের সন্নিকটে হইতেছেন । অর্থ উপার্জন করিয়া সেই অর্থে দান, খয়রাত ও পরোপকার করায় মনোমধ্যে যে অপরি-সীম ও অতুলনীয় সুখ উৎপন্ন হয় কৃপণ ব্যক্তি সেই সুখ হইতে বঞ্চিত থাকেন । যাহার যে পরিমাণ ধন থাকুক না কেন তদ্বারা পরিমিতরূপে দান, খয়রাত ও পরোপকার না করিলে কোন প্রকারেই সেই ধনের স্থায়িত্ব হইবে না ইহাই ঈশ্বরের আদেশ ও ব্যবস্থা । দান, খয়রাত ও পরোপকার নিঃস্বার্থ ভাবেই করা উচিত, স্বার্থ নিহিত থাকিলে কোনই ফল হয় না । স্বার্থশূন্য দান ও খয়রাত করা অপেক্ষা না করাই মঙ্গল । লোকে বলে :—

বাঙলা ।

“মাগিয়া আনিয়া বিলিয়া যায়

তাহার ফল হাতে হাতে পায়”

এই উদ্দেশে মওলানা সাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“নীম নানে গর খোরদ মর্দে খোদায়

বজলে দর বেশাঁ কুনদ নিমে দিগর”

ইহার অর্থ এই যে তিনিই নিঃস্বার্থপূর্ণ মহাপুরুষ, যিনি অর্ধেক খণ্ড রুটী খাইতে পাইলেও তাহার অর্ধেক অপরকে প্রদান করেন ।

১৯ । দান, খয়রাত, নমাজ, রোজা এবাদৎ ও বন্দেগী অথবা অন্য যে কোন প্রকারের সৎকার্য্য হউক না কেন তাহা কখনই কোন মনুষ্যকে দেখাইবার অথবা জনসমাজে প্রশংসনীয় ও আদর-ণীয় হইবার উদ্দেশ্য মনোমধ্যে রাখিয়া তাহা সম্পন্ন করা কখনই কর্তব্য নহে । লোককে দেখাইয়া লোকের নিকট প্রশংসাজন

ইহা নিজে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিলে সেই সৎকার্যের পরিণাম কুফল ব্যতীত সুফল নহে। দান, খয়রাত ও পরোপকার করিবার কালে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কোন সৎকার্য করিলে বাম হস্তে যেন তাহার কোন সন্ধান করিতে না পারে, এইরূপ সংগোপনে সৎকার্য বা পরোপকার করা কর্তব্য। পরোপকার করিবা মাত্রই তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ব্যবস্থা। তাহা মনে রাখা বা কাহারও নিকট প্রকাশ করা কিম্বা নিজের মনকে স্মৃতিত করাকোন প্রকারেই উচিত নহে ; কোন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“নেকি কুন ব দরিয়া অন দাখত”

ইহার অর্থ এই যে সৎকার্য কর ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ভুলিয়া যাও ও তাহার প্রতি আর কোন আশা করিও না। অতএব কোন সৎকার্যে যেন কোন প্রকার স্বার্থ নিহিত না থাকে, নিঃস্বার্থভাবে সৎকার্য করা অবশ্য কর্তব্য, এইরূপে নমাজের বিষয় ধরিয়া মওলানা সাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“কিলিদে দরে দোজখ অন্ত অঁা নমাজ

কে দর চশম্ মরহুম গোজারী দরাজ”

ইহার অর্থ এই যে মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশে নমাজ পড়িলে সেই নমাজ এক সময়ে নরক গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কপাট খুলিয়া দিবার জন্য কুলুপের চাবি হইয়া দাঁড়াইবে, অর্থাৎ সেই নমাজ স্বর্গে লইয়া যাইবার পরিবর্তে নরকে লইয়া যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভক্তি ও ভালবাসা ।

১। পিতা ও মাতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা পুত্রের ও কণ্ঠার কর্তব্য, ঈশ্বরের আদেশ ও তাহাই । এই ভক্তির কল্যাণে মনোমধ্যে অপরিসীম সুখ ও শান্তি স্থান পায় । সতত মনোমধ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিলে কষ্ট ও চিন্তা বিদূরীত হইয়া যায় । সুখ ও শান্তির নিকট শক্তি ও সম্বল তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা হয় । পিতা ও মাতা ভক্তির আকর হইতেছেন । পিতা ও মাতার কল্যাণে আমাদের উৎপত্তি ও উন্নতি । তাঁহাদের কঠোর পরিশ্রম, অশেষ যত্ন ও মায়ামমতাতে আমরা কতই সুখ ও সচ্ছন্দতায় কতই শৈশবকাল হইতে লালিত ও পালিত হইয়া ইহসংসারের মুখ দেখিতেছি এবং জ্ঞান উপার্জন করিয়া সুখ ও সচ্ছন্দতার-সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছি । এইরূপ আদরের পূজনীয় পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ক্রটি না হওয়াই কর্তব্য, পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদা তালা বলিয়াছেন :—

আরবি ।

“অতি ওল্লাহে ও অতি উর রসূলে ওবিল

ওয়ালে দায়নে অহসানা”

ইহার অর্থ এই যে, খোদা ও রসূলের বন্দেগি অর্থাৎ আদেশ পালন কর এবং পিতা ও মাতার উপকার কর ; অতএব খোদা ও রসূলের আদেশ পালন করা যেমন কার্য্য, পিতা ও মাতার

উপকার করাও ঠিক তাহাই হইতেছে । পরমপিতা পরমেশ্বরের এবাদৎ ও বন্দেগি যেমন প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য, তেমনই পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের আদেশ পালন ও তাঁহাদের সন্তোষের নিমিত্ত যাহাই করিতে হউক না কেন তাহাই করিয়া কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা মানুষ মাত্রের প্রধান কর্তব্য । পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য পবিত্র কোরাণ শরিফের অনেক স্থানে খোদায়ে পাকের বিস্তর তাকিদ দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহাদেরই আশীর্বাদে আমাদের ইহকাল পরকালের সুখ, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা । এই জন্যই লোকে বলে পিতা ও মাতার পদতলেই পুত্র ও কন্যার স্বর্গ ও নরক রহিয়াছে । এইরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ স্বর্গের জন্য কার্য্য করা মনুষ্যমাত্রের অবশ্য কর্তব্য । সর্ব শাস্ত্রেই আছে পিতা ও মাতার বর্তমানে তীর্থ অনাবশ্যক, এমন কি নিষেধ । আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পিতা ও মাতার সেবা করিলে সর্ব তীর্থের ফল পাওয়া যাইবে ।

২ । পিতা ও মাতা, পুত্র ও কন্যার সর্ব সর্বা । জন্ম অবধি ইহসংসারে আমাদের শেষকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া যায় তৎসমূহই পিতা ও মাতার কল্যাণে পাইয়া থাকি । পুত্র ও কন্যার জন্মকাল হইতে পিতা ও মাতা, পুত্র কন্যাকে যাবতীয় দান করিতেই থাকেন । পুত্র ও কন্যা, পিতা ও মাতার দানগ্রাহী পাত্র, তাঁহাদেরই দানে পুত্র ও কন্যার শারীরিক ও মানসিক বল এবং জ্ঞানের উৎপত্তি ও উন্নতি । দান করিবার পর দানগ্রাহীর নিকট হইতে পুনরায় পাত্রপকারের আকাঙ্ক্ষা করা দাতার

কর্তব্য নহে । কিন্তু দানগ্রাহীর কর্তব্য যে আপন অভাবকালে যে দাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া আজীবন ধৰ্ম্মী রহিয়াছি, যাঁহার নিকট অসহায় অবস্থায় অসীম ও অতুলনীয় দান গ্রহণ করিয়া এক্ষণে সহায়, সম্বল ও শক্তিশালী হইয়াছি সেই মহাজন পরম ভক্তি-ভাজন পিতা ও মাতাকে আপন কায়, মন, বাক্য, শক্তি ও সম্বলাদির দ্বারা তাঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপন ধর্ম্মের যতদূর পারা যায় সাধ্যমত পরিশোধ করা কর্তব্য । পিতা ও মাতার ধর্ম্ম পরিশোধ করা পুত্র ও কন্যার সাধ্য নহে, তত্ৰাচ আপন সাধ্যমত কর্তব্যের ক্রটি করা কোন পুত্র বা কন্যার পক্ষে কোন অংশেই উচিত নহে ।

৩। পিতা ও মাতার সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার যেরূপ সম্বন্ধ, স্ত্রীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধও তদনুরূপ এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাও তাহাই । স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যস্থলে জগৎপাতা জগদীশ্বরের শাস্ত্রানুমোদিত পবিত্র আদেশে পবিত্র বিবাহের বন্ধন রহিয়াছে । ঈশ্বর এই বিবাহবন্ধন যেমন অপরিলক্ষিত রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছেন, তেমনই বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অবিচ্ছিন্ন স্নেহ ও মমতার আদেশ করিয়া দিয়াছেন ; তন্নিমিত্ত বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীর দ্বারা সুখ ও সম্ভোগাদি কোন প্রকার সংশ্রব রাখা সর্বশাস্ত্রক্রমে একবারেই নিষিদ্ধ ; এমন কি বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নিকট হওয়া দূরের কথা দর্শন মাত্র ও সর্ব শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরের নিষেধ । এইরূপ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী স্নেহ ও প্রণয়ে আবদ্ধ থাকিয়া কালযাপন করাই সুখকর ও শ্রেয়ঃ । (স্ত্রী অশিক্ষিতা

থাকেন তাঁহাকে শিক্ষাদান করা অথবা স্ত্রী অজ্ঞ থাকেন তাঁহাকে জ্ঞানদান করা স্বামীর প্রধান কর্তব্য। স্ত্রী শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হইলে তাঁহার গৰ্ভজাত সন্তান ও সন্ততিগণ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান্ হইবেন। বিদ্যাহীন ও জ্ঞানহীন জননী হইলে সন্তান সন্ততিগণ প্রায় তদ্রূপই হইয়া থাকেন। তদনুরূপ স্বামীও বিদ্যাহীন এবং জ্ঞানহীন হইলে সন্তানসন্ততিগণের অবস্থাও তাহাই হয়। এই নিমিত্ত বিদ্যা ও জ্ঞান স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই পক্ষে অশেষ প্রয়োজনীয়। স্ত্রী ক্ষেত্র বিশেষ, অতএব ক্ষেত্র যেমন হইবে ফলও তেমনই ফলিবে, এই জন্য স্ত্রীশিক্ষা আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্রে ফজ্জ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। এই ফজ্জ আদায় করাও অতি অবশ্য কর্তব্য। যে গৃহে স্ত্রী শিক্ষিতা ও পরিশ্রমী তথায় কষ্ট স্থান পায় না, এমন কি যে দেশের স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিতা ও পরিশ্রমী তথায় কেহই দুঃখী নহে। স্ত্রীলোকগণের পরিশ্রমী হইবার ফল আপন গৃহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা, আপন গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সতত গচ্ছিত রাখা, পাকপ্রণালীর শিক্ষা ও সহজসাধ্য শিল্প শিক্ষা করা ইত্যাদি। স্ত্রী শিক্ষিতা হইলে যেমন সন্তানসন্ততিগণ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হয়, তেমনই স্ত্রী পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হইলে সন্তান সন্ততিগণ বলিষ্ঠ ও বলবান হইয়া থাকে।) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝাইয়া কালাতিপাত করিতে পারিলে অশেষ সুখ ও সচ্ছন্দতার কারণ হইয়া থাকে এবং পরস্পরে এক ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কেহ কাহারও ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী নাই, এই ধারণা মনোমধ্যে স্থান পাইলে উভয়ের সুখ,

ভালবাসা ও প্রণয়ের আর সীমা থাকে না । যে স্থানে মনের মুখ অখণ্ডনীয়রূপে বিদ্যমান তথায় কোন প্রকার কষ্টের অধিকার হইতে পারে না । হিন্দু শাস্ত্রে আছে, মনু বলিয়াছেন :—

সংস্কৃত ।

“সন্তুষ্টো ভাৰ্য্যা ভৰ্ত্তা ভত্ৰা ভাৰ্য্যা তথৈবচ ।

যশ্নিনেব কুলে নিত্যং কল্যানং তত্র বৈষ্ণবম্ ॥”

ইহার অর্থ এই যে, যে ঘরের স্ত্রীর উপর স্বামী এবং স্বামীর উপর স্ত্রীর অনুরাগ ও প্রণয় থাকে তথায় সর্ব প্রকার সৌভাগ্য নিবাস করে । যথায় অপ্রণয় ও কলহ থাকে তথায় দরিদ্রতা উপস্থিত হয় । আরও মনু বলিয়াছেন :—

সংস্কৃত ।

১। “যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

যত্রৈতাস্ত নপূজ্যন্তে সৰ্বাস্ত ত্রাহল্যাঃ ক্রিয়া ॥

২। শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্য ত্যাস্ত তৎকুলম্ ।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্দ্ধতে তদ্ধি সৰ্বদা ॥”

ইহার অর্থ এই যে,—(১) যে গৃহে স্ত্রীলোকের সহিত সদ্যবহার হয়, সে গৃহের পুরুষগণ বিদ্যায়ুক্ত হইয়া দেবতুল্য হন ও আনন্দে ক্রীড়া করিতে থাকেন এবং স্ত্রীলোকের সহিত সদ্যবহার না হইলে সে গৃহে সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হইতে থাকে । (২) যে গৃহে স্ত্রীলোক শোকাতুরা হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকেন, সে গৃহ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া পড়ে এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকগণ আনন্দ উৎসাহে সর্বদা পূর্ণ ও প্রসন্ন থাকেন, সে গৃহ সর্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ।

৪। স্বামী যে প্রকারে স্ত্রীর নিকট প্রণয় ও ভালবাসার জন্য ঐশ্বরিক বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীও স্বামীর নিকট সেই প্রকারে আবদ্ধ। পরস্পরের সুখ, সচ্ছন্দতা, দুঃখ ও কষ্টেরদিকে লক্ষ্য করিয়া কালযাপন করিলে পরস্পরের দুঃখ ও কষ্টের লাঘব হইয়াই পড়িবে এবং তৎসহ সুখ ও সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে। স্বামী যেমন প্রণয় ও ভালবাসায় স্ত্রীকে বশীভূত করিবেন, তদনুরূপ স্ত্রী ও আপন প্রীতিপূর্ণ ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় স্বামীকে আবদ্ধ করিতে পারিবেন, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। আপন আহার, নিদ্রা, সুখ ও সচ্ছন্দতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বামীর সেবা ও তাঁহার মনঃস্তুতির জন্য কার্য্য করা স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। সময় বিশেষে স্ত্রীজাতি ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিরত থাকিতে পারেন বলিয়া ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, (অর্থাৎ মাসিক স্ত্রীআচার-কালে) কিন্তু কোন কারণ বশতঃ স্বামীর সেবায় ত্রুটি কি বিরত থাকিবার নিমিত্ত খোদা ও রসূল স্ত্রীজাতিকে কোনই আদেশ বা ক্ষমতা দেন নাই। স্বামী দুষ্কৃত প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার অনায়াস ও অত্যাচারের ব্যবহারকে মনে স্থান না দেওয়া বরং অবহেলা করা স্ত্রীর কর্তব্য, তত্রাচ স্বামীর সেবার ত্রুটি করা অথবা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অবহেলা বা বিলম্ব করা স্ত্রীর কর্তব্য নহে। স্বামীর সেবাতে নিয়ত আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আদেশ প্রতিপালনে স্ত্রীর মনোমধ্যে যে অতুলনীয় আনন্দের উৎপত্তি হইবে তাহাই তাঁহার ইহকালে স্বর্গ সুখসম অপরিমীম সুখ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। যাঁহাদের স্বামী ও স্ত্রীতে আন্তরিক প্রণয় ও সম্ভাব আছে জগতে তাঁহারা সুখী

বলিয়া গণ্য, যাঁহার স্বামী ও স্ত্রীতে প্রণয় বা সন্তাব নাই জগতে তাঁহারা অসুখী ও দুঃখী । স্ত্রীর নিকট স্বামীর গুরুত্ব মহৎ । স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র পরম গুরু ও ভক্তিভাজন । নিয়ত কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা শত অপরাধিনীর ন্যায় অপরাধিনী জ্ঞানে আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে স্বামীর সেবা করাই স্ত্রীর কর্তব্য । স্ত্রীজাতির বিবাহের পর সংসারে সর্ব প্রকারের আশ্রয় স্থল কেবলমাত্র স্বামী, অন্য আর কেহই নাই, এরূপ অতুলনীয় মহাপুরুষের সেবাতে স্ত্রীজাতির মন, প্রাণ ও দেহ সমর্পন করাই ঈশ্বরের আদেশ । আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্রে মনুষ্য অপর মনুষ্যকে সিজদা করা নিষেধ । হাদিস শরিফে আছে এক সময়ে পরম পবিত্র রসুলেকরিম দঃ প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে, যদি মনুষ্য অপর মনুষ্যকে সিজদা করিবে এরূপ আদেশ ঈশ্বর আমাকে দেন, তাহা হইলে আমি কেবল মাত্র স্ত্রী-জাতিকেই আদেশ করিব যে, তাঁহারা যেন আপন আপন স্বামীকেই সিজদার করেন । রসুলে করিমের দঃ হাদিসপাক হইতেছে যে :—

আরবি ।

“লাও কুনতো অমরা অহদন আইঁ এস জোদা

লেঅহদিন লা অমরতো ইমরতন অনতস জোদা লেজওজেহা ”

অতএব বুঝা আবশ্যক স্ত্রীর নিকট স্বামীর মহত্ব কত । স্ত্রীর নিকট স্বামী এক প্রকার দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বরূপ ; কারণ ঈশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র সিজদা করিবার উপযুক্ত পাত্র, ও মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীর নিকট স্বামীই তদুপযুক্ত ; অতএব এরূপ মহাপুরুষের

সেবা করিতে ও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিলে স্ত্রী ইহকালেই আপন চিন্তানলে আজীবন দগ্ধ হইতে থাকিবেন এবং খোদা ও রসুলের আদেশের অবমাননাজনিত পাপে পরকালে চিরকাল নরকাগ্নিতে পুড়িতে থাকিবেন, ইহাই তাঁহার প্রতিফল । স্বামীর সাংসারিক অবস্থা যেরূপ হউক না কেন তাঁহার সেই অবস্থাতেই পরম সুখী বিবেচনা করা ও তাঁহার ভক্ত হইয়া থাকা এবং আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সতত খোদার শুকরানা করা অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকা স্ত্রীজাতির কর্তব্য । কোন না কোন কারণে বেসবর অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা কখনই কর্তব্য নহে । স্বামীর বর্তমানে স্ত্রীজাতির তীর্থ নিম্প্রয়োজন । স্ত্রীজাতি কেবল মাত্র স্বামীর সেবাতেই সমুহ-তীর্থের ফল পাইতে পারিবেন ও পরকালে স্বর্গবাসিনী হইবেন । কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি বা কোন দোষ বশতঃ অথবা স্ত্রীর বিবেচনায় অল্পদোষে বা বিনা দোষে যদি স্বামী কখন কুপিত হন বা কিছু বলেন তত্রাচ তাঁহার প্রতি রাগ করা কি কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিয়া স্বামীর মনে কষ্ট দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য নহে, তজ্জন্য কিছুই মনে না করিয়া অথবা মনোমধ্যে ক্ষোভ বা কোন আক্ষেপকে আসিতে না দিয়া সহাস্রবদনে ও প্রিয়বাক্যে অথবা প্রকারান্তরে স্বামীকে ভুলাইয়া দেওয়াই স্ত্রীর কর্তব্য । তাহা মনে রাখিয়া আক্ষেপ করা অথবা স্বামীর দোষ ধরা পতি-পরায়ণা স্ত্রীর কার্য্য নহে, কারণ স্বামী স্বাধীন ও স্ত্রী অধীনা, এ নিমিত্ত স্বামীর স্বাধীনতার উপর স্ত্রীর কোনই অধিকার নাই ।

নীচ হইয়া উচ্চের দোষ ধরা কোন প্রকারেই যুক্তি সঙ্গত নহে ।
কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন :—

পার্শ্বী ।

“থতায়ে বুজ্জরগাঁ গিরফতন থতাস্ত”

ইহার অর্থ এই যে গুরুজনের দোষ ধরাই দোষ । এই জন্য স্বামীকে কোন কারণ বা কার্য উপলক্ষে দোষী করা স্ত্রীর অধিকার নাই । বরং স্ত্রীর দোষ বশতঃ স্বামী কুপিত হইলে স্ত্রীর শতসহস্র এবাদৎ ও বন্দেগী (আরাধনা ও উপাসনা) করা উচিত, এমন কি তাঁহার ইহকাল ও পরকাল স্বামীর এক অভিসম্পাতেই নষ্ট হইয়া যাইবে । তদনুরূপ স্ত্রীর প্রতি স্বামী সতত সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁহারই এক আশীর্ব্বাদে স্ত্রীর ইহকাল ও পরকাল সমুজ্জ্বল হইতে পারিবে । অতএব এরূপ পূজনীয় গুরুজনের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় স্ত্রীজাতির অবহেলা করা কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে । স্বামীর স্বভাব ও চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ ঘটিলে অথবা থাকিলে যে প্রকারে হয় তাঁহার মন তুষ্ট করিয়া অথবা যাহাতে তাঁহার অপ্রিয় হইতে না হয় এইরূপ কোমলতা ও মধুরতাতে তাঁহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিলে অবশ্যই তাহাতে শুভফল লাভ করিতে পারিবেন । সরলতা ও নম্রতার দ্বারা স্ত্রী স্বামীর উপর যে প্রকারে অধিকার বিস্তার করিতে পারিবেন, কৰ্কশতা ও কঠোরতায় তদ্রূপ ফল কখনই পাইতে পারিবেন না বরং পরিণামে অপ্রিয় হইয়া গিয়া আপন ইহকাল ও পরকাল হারাইয়া বসিবেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্বামী স্ত্রীর পক্ষে এক প্রকার দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বরূপ । নাস্তিক-

গণ প্রকৃত ঈশ্বরের দোষ ধরিয়া থাকেন কিন্তু আস্তিকগণ কখনই তাহা মুখে আনিতে পারেন না, কারণ তাঁহার দোষ নাই, তিনি নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, অতএব মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বরের দোষ ধরাই অন্যায, তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তৎসমূহই আমাদের উপকার ও মঙ্গলের জন্য বুঝিয়া লইতে হইবে । তদনুরূপ স্ত্রীর দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বামী, স্ত্রীর পক্ষে তিনি যাহাই করুন না কেন তাহা স্ত্রীর পক্ষে দোষ নহে, অতএব তাঁহার কার্য্যে স্ত্রীর আপত্তি করা অথবা দোষ ধরা অন্যায । স্ত্রীর প্রতি ভাল করিলেও স্বামীর গুণ এবং মন্দ করিলেও তাঁহার গুণ বলিয়া স্ত্রীকে বিবেচনা করিয়া কালাতিপাত করিতে হইবে । ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক-গণের পরকাল যেমন মন্দ হইবার কথা তেমনই স্বামী-বিরোধিণী স্ত্রীলোকগণের দশাও তাহাই ঘটিবার ব্যবস্থা ।

এরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমতুল্য ব্যক্তির সেবা করিতে হইলে যাহার যে প্রকৃতি-বিশিষ্ট স্বামী হউন না কেন তাঁহার কদম-মোবারক অর্থাৎ পবিত্র চরণ দুইটী স্ত্রীর অন্তরে ত স্থান পাইবেই পাইবে, তত্রাচ প্রকাশ্যে সেই পবিত্র চরণদ্বয় স্ত্রী বক্ষে, চক্ষে ও মস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত । ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে অশরাফুল মখলুকাত অর্থাৎ সর্ব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব করিয়াছেন । ফলতঃ অন্যান্য জীব সমূহকে যেমন মনুষ্যের উপকারের জন্য নিকৃষ্ট জীবরূপে জন্ম দিয়াছেন তেমনই মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-জাতিকে আপন আপন স্বামীর সেবার জন্যই মনস্থ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । ইহাই যদি খোদা ও রহস্যের অভিমত না হইত তবে খুদ রহস্যলোপাক দঃ এরূপ বলিতেনু কেন,—

আরবি ।

“অইওমা ইমরা অতুন বাতত জওজেহা
অনহারাদিন দখলতিল জন্নতা”

ইহার অর্থ এই যে, যে স্ত্রীর উপর তাঁহার স্বামী সন্তুষ্ট থাকিবেন তিনি অবশ্যই স্বর্গবাসিনী হইবেন । ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে । আরও রসুলে খোদা দঃ আপন পবিত্র বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে :—

আরবি ।

“এজা দায়া অর রজলো অনরা অতহ
এলা ফরা শেহি ফলম তাতেছ ফবাতা,
গজবানন অলেয়হা লা নতহল
মলায়েকতো হত্বা তসবেহা”

ইহার অর্থ এই যে, যে সময়ে স্বামী স্ত্রীকে আপন শয্যায় আহ্বান করিবেন স্ত্রী যদি তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন না করেন ও স্বামী যদি তত্ত্বজ্ঞানিত কারণে একা অসন্তুষ্টচিত্তে থাকিবেন তবে সমস্ত রাত্রি ফেরেস্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের দূতগণ সেই স্ত্রীর উপর লানৎ অর্থাৎ অভিসম্পাত করিতে থাকিবেন । ফেরেস্তাগণের লানৎ খোদার গজবের তুল্য, এক্ষণে ভাবিয়া দেখা উচিত এক সময়ের আদেশের অবহেলায় স্ত্রীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞার ব্যবস্থা কিরূপ । কথিত আছে, জনাব মহম্মদ মুস্তফার দঃ সময়ে কোন এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে

গিয়াছিলেন স্ত্রী অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন, পতির আদেশ ও ইচ্ছার বিপরীতে কোন কার্য কখনই করিতেন না ; তিনি দোতলার উপরেই থাকিতেন, পিতা তাহার নিম্ন স্তরে থাকিতেন, দোতলা হইতে নিম্নে আসিবার জন্য তাঁহার পতি তাঁহাকে কোন আদেশ বা ক্ষমতা দিয়া যান নাই বরং নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, আপন পতির আদেশের বিপরীত নিম্নের স্তরে আসিয়া কি প্রকারে আপন পিতার সেবা করিবেন বা একবার পিতাকে দেখিবেন এই বাসনায় তিনি জনাব রসুলেকরিমের দঃ সমীপে কোন লোক দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে জনাব রসুলেকরিম দঃ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার পতির কোন আদেশের বিপরীত কোন আজ্ঞা বা ব্যবস্থা করিবার আমার ক্ষমতা নাই, এক্ষণে তিনি আপন পতির আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নে আসিতে পারেন না। এই প্রকারে সেই সতী ও সাধ্বী স্ত্রী অনুমতি না পাওয়ায় নিম্ন-স্তরে আসিয়া পিতাকে দেখিতে পাইলেন না। সেই রোগেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়া যায় ; তৎপরে এক সময়ে এক রাত্রিতে স্বপ্নে আপন পিতাকে দেখিতে পাইলেন ও তিনি আপন কন্যাকে জানাইলেন যে, তোমার পতিপরায়ণতাগুণে জগৎপাতা জগদীশ্বর আমার অসংখ্য গুনাহ অর্থাৎ পাপের ক্ষমা করিয়া দিয়া আমাকে স্বর্গবাসী করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ভাবা উচিত পতির মহত্ত্ব কত, পতির আজ্ঞা কিরূপ এবং পতিপরায়ণতার পরিণাম ফল কি প্রকার। আরও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন এক দেশে একজন অত্যন্ত বদকার, অত্যাচারী,

মাতাল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি-বিশিষ্ট মনুষ্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত পতিগতপ্রাণা ও পতির ভক্ত ছিলেন । পতির চরিত্রগুণে ভয়কে কখন মনোমধ্যে স্থান না দিয়া নিয়ত ভক্তিভাবেই আপন পতির সেবা ও মনঃতুষ্টি করিতে কখন কোন প্রকারেই তিলাঙ্ক বিলম্ব করিতেন না । এক সময়ে রাত্রে তাঁহার পতি আপন স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া বাড়িতে আসিলেন, তৎকালে স্ত্রী আপন আহারে বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে স্বামীর আদেশ হইল যে, এক পাত্র জল দেও, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ আহার ত্যাগ করিয়া একটি পাত্রে জল লইয়া শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন, এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামী নিদ্রাভিত্ত হইয়া গেলেন । স্বামীর সুখের নিদ্রা ভগ্নকরা মহাপাপ মনে করিয়া তাঁহার নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত জন্মাইলেন না, কিন্তু জলপাত্র লইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই রহিলেন, পাছে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় ও পুনরায় জল চাহিয়া বসেন এবং জল আনিতে যদি কোন প্রকার বিলম্ব ঘটিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় স্ত্রী আপন স্থানচ্যুত হইবার জন্য সাহসী হইতে পারিলেন না, সেই স্থানেই জলপূর্ণ পাত্রসহ দাঁড়াইয়াই রহিলেন ; রাত্রি অবসানপ্রায়, এমন সময়ে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন স্ত্রী শয্যাপার্শ্বে জলপাত্রসহ দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, পদদ্বয় স্ফীত হইয়া গিয়াছে, একান্ত চিন্তে ও সন্তোষ সহকারে আপন স্ত্রীর শুভ কামনায় ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলেন ; শেষ রাত্রির শুভলগ্নে ও পতিপরায়ণা সতী স্ত্রীর ভাগ্যগুণে পতির প্রার্থনা ঈশ্বর সমীপে তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইয়া গেল । ঈশ্বর তাঁহার

অন্তরাত্মা সমুজ্জ্বল করিয়া দিলেন, সতী সাধবী হইয়া উঠিলেন । পতিসাধনার ফল এক রাত্রের তপস্যাতেই প্রাপ্ত হইলেন ; ইহজগতে সকলের অন্তর ও বাহির এবং নিকটস্থ ও দূরস্থ বিষয় সমূহ দেখিতে ও জানিতে সক্ষম হইয়া পড়িলেন । একদা তিনি আপন গৃহের সন্নিকটস্থ কূপ হইতে অনবরত জল তুলিতেছেন ও ফেলিতেছেন, এমন সময়ে একজন পথিক আসিয়া তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, পথিক পিপাসার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিয়া বলিলেন, একি ব্যবস্থা ! আপনি এত কষ্ট করিয়া কূপ হইতে জল তুলিতেছেন ও ফেলিতেছেন, পিপাসায় কাতর ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎমাত্র জল-প্রদান করিতেছেন না ; তখন তিনি উত্তর করিলেন ইহা আশ্রমের পাখীকে মরিয়া যাইতে বলা ও পুনরায় তাহাকে জীবিত হইতে বলার কার্য্য নহে । তখন পথিক ভাবিলেন ইনি সাধারণ স্ত্রীলোক নহেন, ইনি আমার বিবরণ কি প্রকারে জানিতে পারিলেন । তাঁহার বিবরণ এই যে, তিনি একাধিক্রমে ৩৬ বৎসরকাল বনে জঙ্গলে থাকিয়া ফল মূল আহার করিয়া অত্যন্ত কঠোর তপস্যা ও সাধনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে এই বর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন যে, তিনি যখন যাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই যেন তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ ফলিয়া যায় অর্থাৎ বাক-সিদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । তিনি আপন ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে যাইতে ছিলেন, এক স্থানে কতকগুলি বক-পক্ষীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মৃত্যু কামনা করেন,

তৎক্ষণাৎ তাহারা মরিয়া যায়, কিন্তু এতগুলি জীবের অকারণ মৃত্যুর বিষয় মনে ভাবিয়া পুনরায় তাহারা যেন জীবিত হইয়া উঠে এই বাসনা করিলেন, তাহারা পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিল । ইহা যদিও সেই সাধবীর সম্মুখে ঘটে নাই সত্য, কিন্তু তিনি আপন তপস্শ্রাপ্ত ক্ষমতাগুণে জানিতে পারিয়া ছিলেন । তাহার পর তাঁহার জল তোলার কার্য শেষ হইলে, তিনি জল দিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন সেই সাধুপুরুষ জল লইতে সম্মত না হইয়া অত্যন্ত অনুনয় ও বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ও তুমি আমার কার্য কি প্রকারে জানিলে এবং এত কষ্ট করিয়া কূপ হইতে অনবরত জল তুলিয়া বৃথা ফেলিয়া দিবার কারণ কি ? অগ্রে আমাকে না জানাইলে আমি জল গ্রহণ করিব না । তখন তিনি আপন পরিচয় প্রদান করিলেন ও বলিলেন অমুকদেশে আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার গৃহে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় গৃহদাহ হইতে ছিল তাহা আমি জানিতে ও দেখিতে পাইয়া এই জল দ্বারা তাহার গৃহের অগ্নি নির্বাপন করিতেছিলাম । যে ক্ষমতাবলে আমি এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম ও এই কার্য করিতেছিলাম সেই ক্ষমতা অনুসারেই আমি আপনার কীর্তি জানিতে পারিয়াছিলাম । ইহা আমার ৩৬ বৎসরের সাধনার ফল নহে ; এই বলিয়া আপনার ইতিবৃত্ত তাঁহাকে জানাইলেন । ইহা শ্রবণ করিয়া সাধুব্যক্তি আপনার সাধনাকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্বক পুনরায় বনে গমন করিলেন । ইনিই মহাসাধু শেখ ফরিদ হইতেছেন । ইনি তপস্বীগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী বলিয়া গণ্য । ইহার ন্যায়

কঠোর সাধনা প্রায় কেহই করেন নাই, কিন্তু ইহাঁর তপস্যাও স্বামী সেবাবৎ তপস্যার নিকট লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে । এক্ষণে স্ত্রীলোকগণের ভাবা উচিত যে স্বামীর গুরুত্ব কত ও স্বামী-সেবার পরিণাম ফল কি । কোন না কোন কারণ বশতঃ স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইলে স্ত্রী যদিও স্বামীর প্রতি প্রকাশ্যরূপে কোন প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করেন অথচ তাঁহার মনে যদি সেই ভাবের স্থান পাইয়া থাকে ও নিজ স্বামীর ও ভাগ্যের দোষ এবং পরস্বামী ও পরস্ত্রীর সৌভাগ্যের জন্য নিজ মনোমধ্যে আক্ষেপ করিলে তিনি অবশ্যই ঈশ্বর সমীপে অসতী-রূপে পরিগণিত হইবেন ও তদ্রূপ পাপে ঈশ্বর সমীপে ধৃত হইবেন । আপন স্বামীর প্রতি অটল ভক্তি ও স্নেহের কল্যাণে ঈশ্বরানুগ্রহে স্ত্রী সর্বপ্রকারেই সুখী হইবেন । স্বামীর বিবেচনায় স্ত্রীর কোন দোষ বশতঃ স্বামী কুপিত হইয়া স্ত্রীকে কিছু প্রহার করিলেও কিছু বলিবার ক্ষমতা বা অধিকার স্ত্রীর নাই । পশুকে প্রহার করিলে যেমন তাহাদের বাক্য উচ্চারণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, স্ত্রীও স্বামীর নিকট তদ্রূপ । তবে পশুর-প্রতি অত্যাচার করা যেমন অন্যায় ও পাপ, তেমনই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিলে কি যন্ত্রণা দিলে ঠিক তেমনই পাপ ও অন্যায় । স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর ও এমন কি মনান্তর হইয়া উঠিলে পরস্পরে কলহ ও দ্বন্দ্ব হইতে থাকা উভয়পক্ষে অশেষ অমঙ্গলের কারণ । এই সব কারণে স্ত্রী সমস্ত বিষয়ই সহ্য করিতে বাধ্য । স্বামী যে স্থানে ও যে অবস্থায় থাকিবেন এবং যে প্রকারে কালাতিপাত করিতে থাকিবেন,

স্ত্রীকেও সেই স্থানে সেই অবস্থাতেই আপন স্বামী সহবাসে
 থাকিয়া স্বামীর সেবা করিয়া আপনাকে পরম সুখী ও চরিতার্থ
 জ্ঞান করিতে হইবে । স্ত্রীর যেরূপ রূপ হউক না কেন তিনি
 সৎগুণাম্বিতা হইলে তাঁহার স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া অত্যাচার বা
 অসদ্যবহার করিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকিবে না । ঈশ্বর স্ত্রী-
 জাতিকে এমন কোন ক্ষমতা দেন নাই যে, তাহারা আপন ইচ্ছামত
 এক স্বামী ত্যাগ করিয়া অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন ।
 কিন্তু এই সব বিষয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও ইচ্ছা স্বামীকেই
 দিয়াছেন । এই নিমিত্ত স্ত্রীজাতি সর্ব প্রকারেই স্বামীর নিকট
 অধীনা ও নিকৃষ্টা । কোন বিষয়ের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির অধিকার
 স্ত্রীজাতির নাই ; সমূহ বিষয় স্বামীর উপরেই নির্ভর করিতেছে ।
 কিন্তু স্বামী প্রবল, স্ত্রী দুর্বল, প্রবলের অত্যাচার দুর্বলকে সহ্য
 করিতে হয় সত্য, ফলতঃ ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ নহে,
 তাঁহার প্রতি দয়া ও সদ্যবহার করাই কর্তব্য । আবার অনেক
 স্থলে স্ত্রীর দোষেই স্বামী নষ্ট হইয়া থাকেন । স্বামী যে বিষয়ে
 ও কার্যে সুখী ও সন্তুষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন স্ত্রী যদি আপন
 মিথ্যা অভিমান ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া স্বামীকে প্রণয়পাশে
 আবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখেন ও তদনুরূপ
 কার্য্য করেন তবে স্বামী কখনই কুপথগামী হইয়া মন্দ হইতে
 পারিবেন না, তিনি অবশ্যই আপন স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ
 থাকিবেন । স্বামী আপন স্ত্রীর নিকট আপন ইচ্ছানুরূপ
 ব্যবহার না পাইলেই অন্য স্ত্রীর মিথ্যা কুহকে পড়িয়া আসক্ত
 হইয়া পড়েন । স্বামী স্ত্রীকে আপন ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার শিক্ষা

দিতে পারেন, তাহা না করিয়া অন্য স্ত্রীতে আশ্রিত হওয়া তাঁহার গুরুতর অন্যায় ও পাপ । উহাতে আপন দেহের প্রতি অত্যাচার করা হয় । পরের প্রতি অত্যাচার করিলে যেমন পাপ হয়, তেমনই নিজ দেহের উপর অত্যাচার করিলেও অকালে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সেই দেহের পতন হইয়া পড়ে । অন্য স্ত্রীলোক যখন পর পুরুষকে সেই পুরুষের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করিতে পারে, তদনুরূপ বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া আপন স্বামীর ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার না করা স্ত্রীর পক্ষে গুরুতর দোষ, এইরূপ বিচ্ছেদ, অনুতাপ ও আক্ষেপে স্ত্রীকে সতত মনকষ্টেই কালাতিপাত করিতে হয়, তদ্বারা তাঁহাদের শরীর ক্ষীণ হইয়া যায় ও আয়ুঃক্ষয় হইয়া পড়ে । এরূপ অবস্থায় সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইলে তাহাদেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না এবং অন্নায়ু হইয়া যায়, অতএব স্বামীর মন ও ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া সতত কার্য্য করা ও থাকা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য কার্য্য ।

৫। পুত্রের নিকট পিতা যেমন পূজনীয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তদ্রূপ পূজ্য । পিতা বা মাতার বর্ত্তমানে কি অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহ ও সাদর ব্যবহার করা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য । কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বিদ্যা শিক্ষা ও সচুপায় অবলম্বনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া জ্যেষ্ঠের কর্তব্য । কনিষ্ঠের পূজ্য ও পূজনীয় হইবার উপযুক্ত কার্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সদাসর্বদা করা কর্তব্য । ইহাতে অবহেলা বা ত্রুটি করা কোন অংশে তাহার উচিত নহে । পিতার সমতুল্য

স্নেহের চক্ষে কনিষ্ঠকে দেখা ও ভাবা জ্যেষ্ঠের উচিত । পরস্পরে কোন প্রকার বিদ্বেষভাব ধারণ করা বা কেহ কাহাকেও কোন প্রকারে নীরাশ বা বঞ্চিত করা কাহারও কর্তব্য নহে । তাহাকে গসব অর্থাৎ আত্মসাৎ করা কহে ; ঈশ্বরের নিকট ইহা মহাপাপ, জন সমাজেও নিন্দনীয় হইতে হয় এবং পরকালেও দণ্ডনীয় হইতে হইবে ।

৬ । প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা ও বন্ধুতা সকলই এক এবং ইহা এক নৈসর্গিক বিষয় । যে অন্তঃকরণে প্রণয় বা ভালবাসা নাই তাহা অচেতন পদার্থের মধ্যে গণ্য । ভালবাসা ও বন্ধুতাতে যে সুখ, সে সুখ জগতে কোথাও নাই । বন্ধুতাতে যে বিশ্বাস সে বিশ্বাস জগতে আর কাহারও সহিত হয় না । বন্ধু যে রূপ প্রিয় তদ্রূপ প্রিয় জগতে আর কেহই হয় না । মানুষ-জগতে সকলকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না কিন্তু বন্ধুর নিকট কেহ কখন কোন বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে পারে না, প্রাণ খুলিয়া অকপট চিত্তে আন্তরিক ভাল ও মন্দ সকলই বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, এই বন্ধুর আদর সর্বাপেক্ষা অধিকতর বলিয়াই খোদয়ে পাক আপন রশ্মুলে মকবুল মহম্মদ মুস্তফা দঃকে আপন পবিত্র কলাম শরিফে বন্ধু বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ভালবাসা ও বন্ধুতা জীব মাত্রেই আছে । মানুষের বন্ধু বিহীনে থাকা অসম্ভব, অতএব বন্ধু নির্বাচন করিয়া বন্ধুতা করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য । এই নিমিত্ত মহাজ্ঞানী মওলানা সাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“অগর কহতর রেজাল ওকতদ জেইশাঁ উঙ্গ কমগিরী
একা অফগাঁ, দোয়ম কমবোহ, সোয়ম বজ্জাত কশমিরী”

ইহার অর্থ এই যে, যদি বন্ধুতা করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের দুৰ্ভিক্ষ বা অভাব হয় অর্থাৎ বন্ধুতা করিবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি না পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থাতে আফগানিস্থানবাসী, কাশ্মীর-ডিয়াবাসী ও কাশ্মীরবাসী লোক পাওয়া গেলেও তত্রাচ তাহাদের সহিত বন্ধুতা কখনই কর্তব্য নহে । (তবে ইহা কোন দলিল নহে) ইহারা মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাস-ঘাতক হইতেছে । বন্ধুতা করিতে হইলে তাহার স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহারাদি সকল বিষয় অগ্রে তত্ত্ব করা কর্তব্য । দোষ দেখিতে পাইলে অথবা বুঝিতে পারিলে তাহার বন্ধুতা ত্যাগ করা উচিত । যে ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিতে গেলে লোক সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণিত হইতে হইবে, স্বভাব, চরিত্র, আচার ও ব্যবহারে দোষ ঘটিবে, এ প্রকার ব্যক্তির সহিত প্রণয় করা কোন প্রকারেই উচিত নহে । সদ্বংশজাত, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সচ্চরিত্র, নিরহঙ্কারী, দয়ালু, ধর্মশীল, সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তির সহিত প্রণয় ও ভালবাসা করা কর্তব্য । সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া বন্ধুর প্রধান পরিচয় । যাঁহার হৃদয়ে এই গুণ থাকে তিনিই প্রকৃত বন্ধু । মৌলানা শাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“দোস্ত আঁ দানম কে বিগিরদ দস্ত দোস্ত
দর পেরেশাঁ হাগে ও দর মন্দেগী”

ইহার অর্থ এই যে, অসময়ে যে বন্ধু উপকারে আসেন তিনিই

প্রকৃত বন্ধু । অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা হইলে তাহার পরিণাম মন্দই হইয়া উঠে, অতএব অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করা কোন অংশেই কর্তব্য নহে । উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত ভালবাসায় যে উপকার পাওয়া যায় তদ্রূপ উপকার আর কাহারও দ্বারা পাওয়া যায় না, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

উর্দু ।

“ফিল কিচড়মে ফঁসে কো চাহিয়ে হাতি কওয়া

ইয়ার দর মান্দে কো চাহিয়ে ইয়ারে দিলি”

ইহার অর্থ এই যে, হাতী দঁকে পড়িলে তাহাকে যেমন অন্য বলবান হাতীতেই তুলিতে পারে তেমনই অসময়ে যাহার যিনি আন্তরিক বন্ধু হন তিনিই তাহার উপকারে আসেন । অসং জনের সহিত প্রণয় থাকিলে সে সময়ে উপকার করা দূরে থাকুক তাহার দ্বারা অশেষ অপকারই হইয়া থাকে, তিনি অগ্রে বন্ধুর উপরেই হস্ত ক্ষেপণ করিবেন ইহাই তাঁহাদের স্বভাব । এই মর্মে কোন জ্ঞানি লোকে বলিয়াছেন :—

পার্সী ।

“অনার অগর পোখতা শওদ পারা কুনদ পোস্তরা

রজিল অগর বুজর্গ শওদ রজ দহদ দোস্তরা ।”

ইহার অর্থ এই যে, যেমন দাড়িম্ব ফলের ছাল দাড়িম্বের দানা গুলিকে আচ্ছাদিত করিয়া অর্থাৎ রক্ষা করিয়া রাখে কিন্তু সেই দানা গুলি যখন পাকিয়া উঠে তখন আপনাদের রক্ষাকারী ছালটিকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে । তেমনই ইতর লোকের সহিত বন্ধুতা করিলেও তাহার পরিণাম তাহাই হইয়া দাঁড়ায় ।

অশুপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা আপন বেশ ভূষা ও সম্বল আদির দ্বারা সভ্য হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করা দূরের কথা তাঁহাদের সহবাসে থাকা কৰ্ত্তব্য নহে । তাঁহারা পরের সম্মানের হানি করিয়া নিজ সম্মানের বৃদ্ধিরই চেষ্টা করিয়া থাকেন ও করেন । তাঁহাদের নিকট হইতে যতদূর অন্তরে থাকা যায় ততই মঙ্গল । কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পার্শ্ব ।

“সিফলা গর খুশ পোশ বাশদ নিজদ খুদ জায়েশ মদেহ
কফশ গর জররি বুয়দ বর সর নমি বায়েদ নেহাদ”

ইহার অর্থ এই যে, পায়ে পরিধানোপযোগী পাছুকা বিস্তর মণি-মুক্তা-খচিত মূল্যবান হইলেও যেমন কেহ তাহাকে মাথার উপর রাখে না—তেমনই সিফলা অর্থাৎ ইतरলোকে আপন আর্থিক সম্বল বশতঃ মূল্যবান বেশভূষায় ভূষিত হইলেও তাহাদের সহিত বন্ধুতা করা দূরের কথা তাঁহাকে নিকটে বসিবার জন্তও স্থান দেয় না, কারণ তাহাদের কার্যের পরিণাম ফল নিতান্ত অসন্তোষকর হইয়াই থাকে । তবে আর এক কথা, এই রূপে বন্ধু নির্বাচন করিতে গেলে নির্দোষ বন্ধু না পাওয়াই সম্ভব, তাহা হইলে বন্ধুবিহীন হইয়াই থাকিতে হইবে, এই মর্মে কোন বিজ্ঞলোকে বলিয়াছেন :—

পার্শ্ব ।

“ইয়ার বে আয়েব মজোর তা বমানি বেইয়ার”

ইহার অর্থ ঠিক এই—প্রণয় হইবার সময় কাহারও কোন

দোষ-জানিতে না পারিলেও পরে যদি দোষের বিষয় জানিতে পারা যায় অর্থাৎ যাহাকে অনেকেই ভাল বলে না, মন্দই বলে, তাহার সহিত বন্ধুতা ত্যাগ করা অথবা না করাই কর্তব্য।

৭। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী এক জন প্রধান বন্ধু। স্ত্রীর বন্ধুতাকেও প্রণয় বলা যায়। এই প্রণয়ে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা অসীম ও অতুলনীয়; তদ্রূপ প্রণয় অপর কাহারও নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে না। বন্ধুতার প্রধান সত্ত্ব, সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, ইহার জন্ম স্ত্রী যেমন একজন প্রধান অনুসঙ্গিনী, তদ্রূপ প্রায় আর কেহই হইতে পারে কি না সন্দেহ। তবে এই প্রকার গুণের আশা পতিপরায়ণা ও পতি-গতপ্রাণা সতী এবং সাধ্বী স্ত্রীলোকগণের নিকটই করা যাইতে পারে। বর্তমান শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার গুণে এবং পুরুষ-জাতির ব্যবহার দোষে, আজকাল স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অনেক-কেই সর্বগুণাশ্রিত হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। স্বীকার করা যায়, অনেকেই সতী, সাধ্বী এবং পতিপরায়ণা আছেন কিন্তু পতিগতপ্রাণা হওয়া আজকাল বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কেবল উপস্থিত শিক্ষা, সহবাস ও স্বাধীনতার ফল বিশেষ। আবার স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অনেকেই সময়, স্থান ও জন অভাবেও সতী ও পতিপরায়ণা হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট পতিগতপ্রাণাগুণের লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। যে স্ত্রী প্রকৃত পতিগতপ্রাণা, তিনিই স্বামীর প্রকৃতবন্ধু। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যিক, তাহা আজকাল দেখিতে পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে,

বিশেষতঃ, শিক্ষিত সমাজেই ইহার অভাব বেশী, ইহা কেবল স্ত্রী-শিক্ষার দোষ নহে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষার দোষ ; কারণ আজকালকার শিক্ষার মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, এ শিক্ষা না হইলে কখনই কাহারও চরিত্র গঠিত হইতে পারে না । স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকগণের রূপ লইয়া বিচার হয় না, গুণ লইয়াই বিচার হইয়া থাকে । ইহা পূর্বের বিচার, হালের বিচার নহে । হালের ব্যবস্থা তাহার বিপরীত । স্ত্রীলোকের গুণের বিচার সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞলোকে বলিয়া গিয়াছেন :—

হিন্দী ।

“চঞ্চল, বহু চিহ্নক না, বহু ভোজন ও বহু রেশ

এ চারো তুরঙ্গ কা গুণ হার তিরিয়া কা দোষ”

অর্থাৎ, এই চারিটি বিষয় ঘোড়ার পক্ষে বিশেষ গুণ কিন্তু স্ত্রী-লোকের পক্ষে মহা দোষ । কারণ চঞ্চলা, উচ্চভাষিনী, বহু-ভক্ষিনী ও সতত কুপিতা হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা অলক্ষণ । এই চারিটি দোষের মধ্যে কোন একটি দোষ যে স্ত্রীলোকের থাকিবে তাহাকেই অলক্ষণা স্ত্রী বলা যাইবে । এই চারিটি দোষের মধ্যে একটীও দোষ না থাকিলে তাহাকেই সর্বগুণান্বিতা স্ত্রী বলা যাইতে পারে ; কারণ ইহা থাকিলে অপর যে সকল গুণ আছে তাহা সেই স্ত্রীতে অবশ্যই থাকিবেই থাকিবে । স্ত্রীলোক কোন না কোন এক দোষে অলক্ষণা হইলে স্বামীর পক্ষে মহাদোষ ও অমঙ্গল । স্ত্রীর গুণ ও দোষেই স্বামীর সুখ ও দুঃখ, উন্নতি ও অবনতি । পবিত্র আত্মা মহা-পুরুষ সাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পানী ।

“জনে খুব করমা বরো পারসা

কুনদ মর্দ দর বেশ রা পাদশা”

ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী সংস্কার ও পতিপরায়ণা হইলে তাঁহারই গুণে তাঁহার তিথারী স্বামীও এক সময়ে রাজ সমতুল্য হইয়া উঠিতে পারিবেন । স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধ অঙ্গ বিশেষ, এই নিমিত্ত অর্দ্ধাঙ্গিনী শব্দের অর্থেই স্ত্রী বুঝায় ; ইহার তাৎপর্য এই যে সর্ব প্রথমে খোদাওন্দ করিম যখন আদি পুরুষ হজরত আদম দঃ কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার স্ত্রী মামা ইউয়া দঃ সৃষ্টি হন নাই, পরে এক দিবস হজরত আদম নিদ্রিত ছিলেন এমন সময়ে খোদায়ে করিম আপন মহিমা গুণে ও সৃষ্টি কোশলে হজরত আদমের বাম পসলী অর্থাৎ বাম পার্শ্বের পাঞ্জরের মধ্য হইতে মামা ইউয়ার উৎপত্তি করেন ও তাঁহাকে তাঁহার বাম পার্শ্বেই বসাইয়া রাখেন । হজরত আদমের দঃ নিদ্রা ভগ্ন হইবার পর আপন বাম পার্শ্বে স্ত্রীলোকের মোহিনী মূর্তি দেখিতে পাইয়াই তাঁহার অন্তরে কামের উদ্বিগ্ন হয় ও তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করেন, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের নিষেধ আজ্ঞা হয় ও আদেশ হয় যে, অগ্রে পবিত্র বাক্যে ইহাকে তুমি বিবাহ কর তৎপরে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিও নচেৎ স্পর্শ করিও না । তাহার পরক্ষণেই ঈশ্বর আজ্ঞায় তাঁহাদের পবিত্র পরিণয় কার্য সমাধা হইয়া যায় । আদি কালে পুরুষের অঙ্গ হইতে স্ত্রীর উৎপত্তি বলিয়াই স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা যায় ও ইংরাজিতে বেটর হাপ বলে । এই নিমিত্ত স্ত্রীর

দেহ, মন, প্রাণ, ইচ্ছা আদি বাবতীয় প্রবৃত্তি ও পদার্থ স্বামীর বলিয়াই স্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। তাঁহাতে (স্ত্রীতে) আমি বা আপন বলিয়া কোন পদার্থই নাই। সমূহ ও সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীতেই সমর্পণ করিতে হইবে তাহা হইলেই পতিগতপ্রাণা হইতে পারিবেন। আদি পিতা ও আদি মাতার সহিত ঈশ্বর পবিত্র বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই জগতে সত্য, অসত্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ভুক্ত মনুষ্যের মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই জন্য বিনা বিবাহে স্ত্রী সহবাস নিষেধ এবং পরস্ত্রী হরণ একটি মহা পাপ। এই নিমিত্ত অসত্য সমাজেও বিবাহের পূর্বে যে বাহা করুক না কেন, কেহ কাহারও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কুপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিলেই তাহার পাপের প্রতিফল প্রাণদণ্ডই করিয়া বসে।

৮। স্ত্রীর গুণে যেমন স্বামীর উন্নতি, তেমনই স্ত্রীর দোষে স্বামীর অবনতি, স্ত্রীর দোষে স্বামীর গৃহে রহমতের কেরেস্তার আগমন হয় না। হিন্দুগণ বলেন সে স্থানে লক্ষ্মী স্থান পান না। স্ত্রীর দোষ জনিত কারনে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই মধ্যে কাহারও মনে সুখ থাকে না। সুখ না থাকিলেই অশান্তি, অশান্তির স্থলে চিন্তার অধিকার অধিক, চিন্তা থাকিলেই আয়ুঃক্ষয় করিয়া দেয়। ইহাতে এত শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হয় যে আয়ু শেষ না হইলেও আক্ষেপ বশতঃ আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ায় অনেকেই আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া মরিয়া যায়। বাহাতে স্ত্রী দ্বারা মনের সুখের হ্রাস না হয়, স্ত্রীকে এইরূপই হওয়া উচিত। সতী স্ত্রীলোকের মধ্যে উপরি লিখিত চারিটি

দোষ না থাকিলেই তাঁহাতে আর যাহা থাকে তাহা গুণ বলিয়াই ধরিতে হইবে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোককে লজ্জাশীলা, পতিপরায়ণা ও পরিশ্রমী হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক, কারণ ইহাই স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা গুণের বিষয় । এই গুণেই স্ত্রীলোকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । স্ত্রীর এই গুণেই স্বামীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় । যে স্ত্রীতে এই সব গুণ থাকে তিনি সততই সুখী । তাঁহাকে কখন দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না । কখন তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে না । স্ত্রীলোকগণের এই গুণত্রয়ের মধ্যে ধর্মের ভয় না হইলে লজ্জাশীলতা ও পতিপরায়ণতা গুণের স্থান হয় না এবং শিক্ষা না হইলে ধর্মের ভয় হয় না । শিক্ষা অর্থাৎ বিদ্যার শিক্ষা, ইহা দুই প্রকার, মৌখিক শিক্ষা ও পুথিগত শিক্ষা, তন্মধ্যে পুথিগত শিক্ষাই সর্ব প্রধান শিক্ষা, তাহার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকগণের জন্য কেবল নীতি শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ, ইহারই দ্বারা ধর্মের ভয় ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়, অন্য কোন শিক্ষায় তাহা হয় না । অনেকের বিবেচনায় স্ত্রীলোকগণের পক্ষে লিখন শিক্ষা অপেক্ষা পঠন শিক্ষাই শ্রেয় । ধর্ম ভয় থাকিলেই স্বভাবতঃ তাঁহাকে পরিশ্রমী হইতে হইবে । এই প্রকারে স্ত্রীলোকে এই গুণত্রয়ে বিভূষিতা হইলে তাঁহার ও তাঁহার গর্ভজাত সন্তান ও সন্ততির পক্ষে অশেষ মঙ্গলের বিষয়, তদ্বারা সন্তান ও সন্ততিগণ বলিষ্ঠ, বলবান, বিদ্যান, বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান হইতে থাকেন । এই প্রকার স্ত্রীর সহিত আন্তরিক প্রণয় ও ভক্তি করা স্বামীর কর্তব্য, অনেক স্থলে তাহা না হইয়া অত্যন্ত অসদ্যবহার হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাঁহার ভাগ্য

সুপ্রসন্ন না হইয়া অপ্রসন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার দুঃখ ও কষ্ট লাগিয়াই থাকে।

৯। কামরূপী শয়তান (শয়তানের বর্ণনা পূর্বেই বলা হইয়াছে) সতত মনুষ্যের মনোমধ্যে বাস করিতেছে। কি পুরুষ, কি স্ত্রী উভয়েরই নিকট ইহার অধিকার আছেই আছে, বরং স্ত্রী জাতির উপর ইহার অধিকার পুরুষ অপেক্ষা বেশী বলিয়াই পণ্ডিতগণ বলেন। তবে স্ত্রী জাতি লজ্জার বশীভূতা ও পুরুষ নিম্নজ্জ ইহাই প্রভেদ। এই শয়তান কখন কাহাকে আপন অধিকারে আনিয়া কুপথগামী করিয়া ফেলে এই নিমিত্ত সকলেরই বিশেষ সাবধানতায় কালাতিপাত করা কর্তব্য ও এই জন্য শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার মানসে সরলমতি স্ত্রীলোকগণকে আরও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক। এই কারণেই স্ত্রীলোকগণের পর্দা অর্থাৎ অবরোধ প্রথার কঠোর আদেশ আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ঈশ্বর দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোক মাত্রেই এই পবিত্র আদেশের বশবর্ত্তিনী হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। পরপুরুষে অন্য স্ত্রীকে দেখা যেমন, একজন স্ত্রী অন্য পুরুষকে দেখাও তেমনই। কখন কে কি ভাবে ও কি উদ্দেশ্যে কাহাকে দেখে তাহা কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না; এই জন্যই পর্দার ব্যবস্থা। কোন স্ত্রীলোক এক সময়ে পরপুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সেই পুরুষের কোন এক অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের প্রতি তাঁহার মন আকর্ষিত হয়, কি তাহার কোন অঙ্গকে ভাল বলিয়া আপন মনে মনে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর

সমীপে অসতীক্ৰূপে গণ্য হইবেন । এই মর্মে হজরত মওলানা
সাদি অলেখ্যেহে রহমত বলিয়া গিয়াছেন—

পাশী ।

“জে বেগান গানশ চশ্ম জন কোর বাশ

চো বেকু শুদ অজ খানা দর গোরবাদ”

ইহার অর্থ এই যে, পর পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করা সম্বন্ধে
স্ত্রীলোকগণের চক্ষুকে অন্ধকরা কর্তব্য, যে স্ত্রীর চক্ষু ঘর
হইতে বাহিরে গেল অর্থাৎ পর পুরুষকে দেখিল তাহার মৃত্যুই !
শ্রেয় বা তাহার গোরে যাওয়াই মঙ্গল । ঈশ্বর মন লইয়াই বিচার
করেন । কোন না কোন পুরুষের দৃষ্টিতে পতিত হওয়া বা
পরপুরুষকে দেখা অথবা কোন প্রকার সমারোহ স্থলে
কিন্মা তাহার নিকটে গমন করিয়া কাহাকেও দেখিলে মনের
মধ্যে কোন না কোন প্রকার কুভাব ক্ষণকালের জগুও স্থান
পাওয়া অসঙ্গত নহে, এই নিমিত্ত ইহা স্ত্রীলোকগণের পক্ষে
নিষেধ হইয়াছে । পরপুরুষে দেখা অপেক্ষা, পরপুরুষকে
দেখা স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা পাপ । এইরূপে পরপুরুষের
প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পড়িতে স্ত্রীলোকের মন কলঙ্কিত হইয়া
গিয়া ক্রমে স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের হ্রাস হইয়া
যাওয়ায় প্রকাশ্যরূপে সতীত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারিবে ।
এই কারণেই ইহার কঠোরতা । এই পর্দার অভাব জনিত
দোষেই জগতে নিত্য নিত্য কত শত সহস্র দুর্ঘটনা ঘে
ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না । পবিত্র হৃদিস শরীফে
আছে, এক সময় এক অন্ধ ভিক্ষুক জনাব রসুলের করিমের দঃ

বাটির সদরে আসিয়া ভিক্ষা চাহে, তাহাতে রত্নলের করিমের দঃ কণ্ঠা উন্মল বরকাত শ্রীমতী ফাতেমা খাতুন জেরৎ ভিক্ষা দিতে যাইবার জন্ত পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, জনাব রত্নলে করিম দঃ তাঁহাকে উত্তর দেন যে ভিখারী অন্ধ হইতেছে সত্য কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন । এক্ষণে ভাবা উচিত ইহার মধ্যে কত বড় মহান আদেশ ও উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, এই পর্দা স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা গৌরবের বিষয় । ইহা সতীত্ব রক্ষার প্রধান উপায় । যে স্ত্রীতে পর্দা নাই, তাঁহার সতীত্বে সন্দেহ আসিয়া পড়ে । পর্দা রক্ষা করিতে গেলে লজ্জাশীলতার আবশ্যক, যিনি এই পর্দাকে ঈশ্বরের আদেশ ভাবিয়া লজ্জাশীলতা অধিকার করেন, তিনি অবশ্যই সতী ও পতিপরায়ণা হইবেন এবং সতী পতিপরায়ণা হইলেই তাঁহাকে অবশ্যই পতিগতপ্রাণা হইতে হইবে । পতিগতপ্রাণা হইতে হইলে, পতির সুখ ও সচ্ছন্দতাহেতু এবং তাঁহার মনস্তৃষ্টির নিমিত্ত তিনি অবশ্যই পরিশ্রমী হইবেন । এইরূপে স্ত্রী পরিশ্রমী হইলে, অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুণে গুণাবিতা হইলেই ক্রমে স্বামীর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি না হইয়া থাকিতে পারিবে না । এই প্রকার স্ত্রীই প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীকুলের রত্ন বিশেষ এবং ইহকাল ও পরকালে ই তিনি সুখী ।

১০ । পুরুষের নিকট কেবল মাত্র রূপোশি করিলে অর্থাৎ কেবল আপন চেহারাটী লুকাইলেই যে স্ত্রীলোকগণের পর্দা রক্ষার আদেশ প্রতিপালন হইয়া যায় তাহা নহে । স্ত্রীলোকগণের কণ্ঠস্বর নিকটস্থ লোক ব্যতীত অপর কেহ যেন

শ্রবণ করিতে না পারে। তদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকগণ পরস্পরেও লজ্জা রক্ষা করিতে বাধ্য। এই নিমিত্ত আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্রে ঈশ্বরের আদেশ রহিয়াছে; তাহাকেই সতর পোশী কহে। (সতরের বিবরণ পূর্বেই বলা হইয়াছে) ইহা পর্দার প্রধান অঙ্গ। বাধা হইয়া কোন স্ত্রীলোককে সাধারণের স্থলে বহির্গত হইতে হইলে তাহার সমস্ত শরীর অপরের চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। ঘরের মধ্যে থাকিবার সময়ে কেবল হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি গুলি অর্থাৎ পাঞ্জা দুইটি ও চক্ষু ও মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে পারেন। শরীরের অপর কোন অঙ্গ প্রকাশ্যভাবে স্বামী, পুত্র, কন্যা বা এমনকি সহচরীও যেন দেখিতে না পায়। সততই বস্ত্র দ্বারা সতর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে বাধ্য, কেবল মাত্র বিশেষ প্রয়োজন কালেই সতরের বস্ত্র উন্মোচন করিতে পারিবেন, তাহাও যেন অপরের দৃষ্টিতে না পড়ে, তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সতর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। কাহারও সতরে দৃষ্টি পড়িলে দর্শকের মনোমধ্যে তৎক্ষণাৎ কামরূপী শয়তান আসিয়া অধিকার করিতে পারিবে। অপরের সতরের প্রতি দৃষ্টি পড়া দূরের কথা স্বামীর সতরে স্ত্রীর দৃষ্টি অথবা স্ত্রীর সতরে স্বামীর দৃষ্টি কিম্বা যে যার নিজের সতরের প্রতি নিজের দৃষ্টিও নিষেধ, এই নিমিত্ত পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ইসলাম রাজ্যে স্ত্রীলোকগণ শাস্ত্রানুমোদিত বস্ত্র দ্বারা আপন আপন লজ্জা নিবারণ করিয়া

সময়ে এই ভারতে মুসলমান রাজ্য কালে তদ্রূপ ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক দেশে এখনও তাহাই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক স্থানেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইয়া ধর্মানুমোদিত বস্ত্রকে একবারেই ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন, কেহই তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না । সঙ্গ ও সহবাস দোষে এরূপ তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, স্ত্রীলোক-গণকে উলঙ্গ বলিলেই হয় । এই সব দেশে স্ত্রীলোকগণের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র শাড়ি । তাহার নিম্নে আর কেহ সচরাচর কোন প্রকার ইজার বা পাজামা পরিধান করেন না, নিদ্রিতা-বস্ত্রের বিবরণ মুখে আনা যায় না কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেই উলঙ্গ । শাড়ির নিম্নে যেমন কেহ কোন বস্ত্র ব্যবহার করেন না তদ্রূপ শরীরের উর্দ্ধাংশেও কোন প্রকার জামা বা পিরাহন পরিধান করা নিষেধ বলিয়াই তাঁহারা ভাবেন । তাহাতে আবার কেহ অনুগ্রহ করিয়া শাড়ির অঞ্চল খণ্ড মাথায় ও পৃষ্ঠ দেশে দেন নচেৎ অধিকাংশই তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র গলদেশ দিয়া বক্ষঃস্থলে ফেলিয়া রাখেন, তাহার উপর শাড়ির বাহারও প্রশংসা বর্ণনাতীত, ২।৪ ফেঁটা করিয়া শাড়িটা পরিধান করিলেও কিঞ্চিৎ দূর হইতে কটিদেশের অধোভাগে সমূহ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সচ্ছন্দে অপরের দৃষ্টিতে পড়িয়া যায় । কোন কোন মহিলা মহলে যে যত অধিক মূল্যের সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন তাঁহার প্রশংসা ততই অধিক । ইহারা একে বারেই ঈশ্বরের আদেশ ও সমাজে পরস্পরের মধ্যে লজ্জাশীলতাকে জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছেন । খোদা ও রসুলের দুঃ ভয় এক বারেই করেন

না । এই নিমিও কেবল মাত্র স্ত্রীলোকগণই যে সম্পূর্ণ দোষী ও ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় তাহা নহে, আমরা পুরুষ জাতিও স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী ও দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য, কারণ আমরাই আপন আপন মহিলাগণকে হাত তুলিয়া সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রদান করিতেছি ও তাহা পরিধান করাইয়া সতত তাঁহাদের সতর দর্শন করিতেছি । এইরূপ বস্ত্র বঙ্গ দেশীয় বারাজনা মহলেই শোভা পায়, কারণ পরপুরুষের মন ভুলাইয়া লওয়াই তাহাদের কার্য্য, সেই বারাজনা মহল হইতে আমরা ইহার শিক্ষা পাইয়া আপন পরিজনবর্গকে এক্ষণে তাহাদের সমশ্রেণী ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছি ও তুলিতেছি । এতদ্বারা আমরা যে আমাদের ইহকাল ও পরকাল একবারেই নষ্ট না করিতেছি তাহা কে না স্বীকার করিবেন । খোদাওনতাল্লা কবে যে এই রোগের বিনাশ করিবেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু ইহার বিনাসের অধিকারত তিনি আমাদেরই হাতে দিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র আদেশের সম্মান ও পরকালের ভয় করিয়া আপন আপন স্ত্রী ও কন্যা আদিকে এরূপ অপবিত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে না দিয়া পশুতুল্য করিয়া না দিলেই হয়, পশুর অঙ্গ নিয়তই দেখা যাইতেছে, তাহাতে উজু নষ্ট হইবার অথবা পাপ বলিয়া গণ্য হইবার ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রেই নাই কিন্তু এ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানকারী স্ত্রীলোকগণ কিরূপ পশু যে, তাহাদের অঙ্গে অর্থাৎ সতরে দৃষ্টি পড়িলেই উজু নাম হইয়া যায় ও পাপ হয়, সেই পাপে উভয়ই পাপী ।

মহিলাগণ পশু অপেক্ষা ও নিকৃষ্ট। এইরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্রে যেমন আবরু নষ্ট হয় তেমনই আর্থিক ক্ষতিও অধিক হয়, ইহার মূল্য অধিক এবং শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব ইহা কোন প্রকারেই উৎকৃষ্ট বা উপকারী বলিয়া গণ্য হইতেই পারে না। স্থূল বস্ত্র পরিধান অথবা সূক্ষ্ম বস্ত্রের নিম্নে ইজার বা পাজামা এবং উপরে পিরাহন বা জামা পরিধান করা অতি আবশ্যিক। এই পিরহনের স্থলে এক্ষণে ইংরাজ মহিলাগণের অনুকরণে বডি ও শেমিজ আদি নামিত কয়েক প্রকার জামার ব্যবহারও প্রচলন হইয়াছে, তাহা যে প্রকারে ব্যবহৃত হয় ও উহা যে কতদূর আমার শাস্ত্রানুমোদিত তাহা বলা যায় না কারণ উহার দ্বারা শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ও ভঙ্গি সকলই উপর হইতে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া পড়ে। ফলতঃ পরিধেয় বস্ত্রের উপর এক খণ্ড চাদরের ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার ব্যবহার আর আমাদের বঙ্গদেশে নাই। অল্পকাল পূর্বে স্ত্রীলোকগণের ইজ্ঞা ও আবরুর প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এক্ষণে আর তাহা নাই। কেবল যে পরিধেয় বস্ত্রেরই পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নহে, অলঙ্কারেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে রৌপ্যের মূল্য স্থূলভ হওয়ায় অন্দর মহল হইতে তাহার আদর ও অধিকার এক বারেই বিলুপ্ত প্রায়। কেবল তাহাই কেন তদনুরূপ স্তব্ধ নির্মিত পবিত্র মুখাভরণ নথ আদি অলঙ্কার ও সূমভ্য ইংরাজ মহিলা ও শ্রীমতী বাইজিগণের অনুকরণে এক বারেই স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ইহারা অনেক

সময়ে অনেক প্রকার কষ্ট দিয়া থাকে, সেই দোষেই ইহাদের নির্বাসন । নির্দোষী নাকের অবস্থা দেখিয়া নিরপরাধী কান দুইটা ও এক্ষণে আর নাথাকার মধ্যেই গণ্য । বেন পূর্বে এক সময়ে ছিল এক্ষণে কাটা গিয়াছে । এই প্রকারে স্থখের ও সাধের অলঙ্কারগুলি আপনাদের এরূপ দুর্দশা দেখিতে পাইয়া যেন বেচারী রোপ্য একবারেই অন্তর্দান হইয়াছেন । রোপ্যের অবস্থা দেখিয়া কাঞ্চনমণি পলাইতে না পারিয়া এক্ষণে শ্রীমতীগণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । তন্নিমিত্ত শ্রীমতীগণ অত্যন্ত স্ফীতা ও গৌরবান্বিতা । অন্য দিকে তত্ত্ব করিতে গেলে নির্দিষ্ট বাসের অভাব, সতত ভাড়া গৃহে নিবাসেরই স্বভাব, অসংখ্য দাস দাসীরই প্রাদুর্ভাব, স্বামীর সেবায় নাহিক অনুরাগ ।

১ । কাঞ্চন মনি যাঁহার সেবাদাসী ।

তিনি কি হন কাহারও অভিলাষী ॥

২ । কখন মন যদি তাঁর না হয় সন্তুষ্ট ।

পূজ্যপাদ স্বামীর মন হয় তখনই স্থান ভ্রষ্ট ॥

৩ । পারিলে নাহে মন নিতে মিশাইয়া মনে ।

তাই কি সেবিতোছ পদ তাঁর সূবর্ণ কাঞ্চনে ॥

৪ । কোথায় সেই শ্রদ্ধাপদ জনক জননী ।

রাখ কি হে সংবাদ তাঁদের ওহে গুণমনি ॥

৫ । সে ভাবনা ত নাহিক কখন তোমার অন্তরে ।

যাঁর সেবাতে হবে হে পার দুস্তর সাগরে ॥

৬ । তাতে নাহিক হে আবশ্যক এ অকঞ্চন কাঞ্চন ।

পুর্নিবে তব সাধ তাঁদের চরণে দিলে মন ॥

৭। এ'ত নহে হে আদর্শ তোমার ইংরাজ মহিলার ।

কেহত না করে সেবা তাঁদের এবম্ প্রকার ॥

৮। মাতা, মাতামহী আদি গুরুজনে রাখিতেন যারে মাথায় ।

এখন রাখিতেছ হে তারে তব প্রেমসীর পায় ॥

৯। এ হেন ব্যবহারে তব দেশে বা সমাজে ।

সন্তুষ্ট নহে হে কেহ এ অপক্লপ সাজে ॥

কথায় আছে ও লোকে বলে “মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সোনার জড়িত,” তবে যে, পায়ে সোনার অলঙ্কার পরিধান নিষেধ আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, হিন্দুগণ ইহাকে মূল্যবান বলিয়া সম্মান করেন মাত্র, মুসলমানগণ পারিলেও পরিতে পারেন, তবে কাহাকেও সাজে ও কাহাকেও সাজে না। যাঁহারা রাজা, বাদশা, জমিদার, তালুকদার, ও আয়মাদার অথবা যাঁহাদিগকে এক প্রকার কখনও পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না অথচ যাঁহাদিগের পায়ে কোন প্রকার পরাধীনতার শৃঙ্খল নাই তাঁহাদিগের কথা পৃথক, কিন্তু যাঁহারা পরাধীন পুষ্ট অথবা যাঁহাদের অন্য কোন বৃত্তী নাই তাঁহাদের পক্ষে ইহা হাস্যাম্পদ ।

১১। হিন্দুগণ বলেন স্ত্রীলোকেই ঘরের লক্ষ্মী । যাহার দ্বারা ঘরের স্ত্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হয় তাহাকেই লক্ষ্মী বলা যায় । এই অর্থে আমরাও স্ত্রীলোকগণকে লক্ষ্মী বলিলে কোন দোষ ঘটে না, নচেৎ লক্ষ্মী অর্থে হিন্দুগণের একটী দেবীকে বুঝায় । তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য নহে এবং তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করাও আমাদের উচিত নহে । ফলতঃ ঘরের স্ত্রীলোকগণই যে ঘরের লক্ষ্মী ইহাতে

কোনই সন্দেহ নাই। পুরুষে সংসারে প্রবৃত্ত থাকিয়া নানা স্থানে ও নানা কার্যে লিপ্ত থাকেন, ঘরের দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন ও ব্যয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা পুরুষগণের দ্বারা হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। ইহা স্ত্রীলোকগণেরই প্রধান কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। উপযুক্তরূপে গচ্ছিত রাখা ও পরিমিতরূপে ব্যয় করা যেমন স্ত্রীলোকগণের দ্বারা হইতে পারে, তাহা পুরুষের দ্বারা হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। যে ঘরের স্ত্রীলোকের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত এই সমস্ত কার্য পুরুষের উপর নির্ভর করে, তথায় কোন কার্যেই সুখ ও উন্নতি নাই। যে ঘরে এই সমস্ত কার্য স্ত্রীলোকের দক্ষতা-গুণে নির্বাহ হইতেছে সেই স্থানেই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি, কারণ তাঁহারা এটা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহা থাকিলে আমারই থাকিবে, আর পুরুষে বুঝেন যে “আচ্ছা যাও যানে দেও হাম লাভা হায়, হম্ খরচ করে গা” ; এই জন্ত পুরুষের দ্বারা কোন দ্রব্যের স্থিতি হয় না, এবং সেই কারণ তাঁহাদের দ্বারা এই কার্য কখন সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে, স্ত্রীলোকের উপর গৃহস্থ থাকাই কর্তব্য। ঘরের গৃহিণীর কর্তব্য এই যে, তিনি যেন চাকর চাকরাণী ও দাস দাসীকে অন্তরে ভালবাসেন ও বাহ্যিক কঠিনতা প্রকাশ করেন ; তাহাদের কার্যের প্রতি যেন সতত বিশেষ দৃষ্টি থাকে, কারণ তাঁহার ঘরই তাহাদের উপায় স্থল, তাহারা যেন কোন প্রকারে কোন দ্রব্য অপহরণ করিতে না পারে। তাহাদের আহারের প্রতি বিশেষ দয়া-প্রকাশ করাই গৃহিণীর কর্তব্য, নচেৎ খাইতে না পাইলে

চাকর চাকরাণী কখনই সমুদয় হইয়া কার্য্য করে না ও থাকে না অথচ তাহাদিগকে সতত লাই দেওয়া অর্থাৎ প্রকাশ্যরূপে ভালবাসা কিম্বা তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত নহে, তাহাতে তাহারা কখন মন দিয়া উত্তমরূপে কার্য্য করে না । যাহাতে তাহাদের অন্তরে ভয় থাকে, সেই প্রকারে তাহাদের দ্বারা কার্য্য লওয়াই কর্তব্য । আহারের সময় কে কোথায় আছে, এবং কেহ আহার করিল কি না, প্রত্যহ ইহার তত্ত্ব রাখা গৃহিণীর আবশ্যক । প্রত্যহ রাত্রে সর্ব শেষে শয্যায় যাওয়া ও অতি প্রত্যুষে সর্ব প্রথমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা, গৃহিণীর প্রধান ধর্ম্ম । ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঘরের কোন দ্রব্য কোথায় রহিল, কোন দ্রব্যের প্রতি কোন প্রকার অসাবধানতা হইল কি না, কপাট ও জানালাদি উত্তমরূপে আবদ্ধ হইয়াছে কি না, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইয়া রাত্রে সর্বশেষে শয্যায় যাইলে এবং প্রাতে সর্বপ্রথমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, চাকর চাকরাণীগণ যে যার আপন কর্তব্য কার্য্যে লিপ্ত হইল কি না ও যাহাতে শীঘ্রই আপন আপন কার্য্যে লিপ্ত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলে গৃহস্থালীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে থাকিবে । বাজারের যে সমস্ত দ্রব্য প্রত্যহ খরচ হইয়া থাকে তাহা প্রত্যহ খরিদ করিয়া ব্যয় করিলে গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট । দক্ষা গৃহিণীগণ প্রত্যেক দ্রব্যই থোকা খরিদ করিয়া ও অতিশয় সাবধানতার সহিত গচ্ছিত রাখিয়া এবং নিজের দৃষ্টির উপর দিয়া খরচ করিয়া থাকেন, উহাতে তাঁহারা বিশেষরূপে উপকৃত

হন। এইরূপে গচ্ছিত করিয়া রাখিলে ও তৎপ্রতি চাকর চাকরানীর সম্পূর্ণ অধিকার না দিলে এবং সতত দেখিয়া ও শুনিয়া খরচ কারলে, গৃহিণী আপন ধন আপনি সঞ্চয় করিতে পারিবেন। যাহারা প্রত্যহ বাজারের দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকেন ও পরের উপর নির্ভর করিয়া ব্যয় করেন, তাঁহাদের ক্ষতি ব্যতীত কোন অংশেই লাভ নাই, প্রত্যেক গৃহিণীকে আপন গৃহকার্যের এই সব বিষয়ে বিশেষরূপে সূচতুরা হওয়া আবশ্যিক। গৃহস্থিত দ্রব্যাদি অতিশয় যত্নসহকারে রাখা আবশ্যিক এবং যে যার থাকিবার এক একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করিয়া রাখা উচিত। ইহাই গৃহিণীর প্রধান ধর্ম। অতি সামান্য দ্রব্যের প্রতি ও যেন কখন কোন প্রকারে যত্নের ত্রুটি না হয়। ব্যবহার কালে যখন যে দ্রব্য ব্যবহার হইবে তৎপরে সেই দ্রব্য যেন তাহার থাকিবার ঠিক নির্দিষ্ট স্থানেই থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আবশ্যকের সময়ে সহজেই পাওয়া যাইতে পারিবে, নচেৎ সহজে পাওয়া না গেলে কার্যের ব্যাঘাত জন্মিবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কখন পরের কোন দ্রব্য নিজ-ব্যবহার জন্য চাহিয়া আনিলে কার্যপরেই অতিশয় যত্নসহকারে তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্তব্য। রাখিতে হইলে নিজ দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর যত্নের সহিত তাহা রাখা আবশ্যিক। অযত্ন প্রযুক্ত অপরের দ্রব্য নষ্ট হইয়া গেলে দুর্গামের কথা এবং পরে আর কেহ আপন দ্রব্য না দিলে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে গৃহ-স্বামীর সতর্কতাও বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সদ্যবহার ।

১। সমবয়স্ক হউক বা অধিক বা অল্প বয়স্ক যে ব্যক্তিই হউক না কেন তাহার প্রতি আদর, সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করা সৎগুণ, সৎশিক্ষা ও সৎবংশের পরিচয় প্রকাশ করে। *হীনতায় ও নম্রতায় মনুষ্যের আদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কোন ক্ষতি হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই হীনতা ও নম্রতা অধিকার করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধারণে বলে “বড় হবে ত ছোট হও” অর্থাৎ হীনতার ও নম্রতার ব্যবহার অবলম্বন করিলে সর্ব সাধারণের নিকট আদরণীয় হওয়া যায় ও অতি শীঘ্রই তাহার যশঃ ও গৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কোন বিজ্ঞলোক বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“অদব তাজেস্তু অজ লুৎফে এলাহী
বেনহ বর মের বেরও হরজা কে খাহী”

ইহার অর্থ এই যে, আদব অর্থাৎ নম্রতার টুপি মাথায় দিয়া যথায় যাইবে তথায় আদর ও সম্মান পাইবে। নম্রতা ও হীনতা মহৎ ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষ প্রশংসার বিষয়। এই নিমিত্ত কোন জ্ঞানী লোকে বলিয়াছেন :—

পার্শ্বী ।

“ত ওয়া জো তেশয়ে হোশস্ত হর বেমগ্জ কেয় দানদ
বলে গরদন কোজা থম মি শওদ মিনায়ে খালিরা”

ইহার অর্থ এই যে, বোতলে সুধা থাকিলেই তাহার মাথা বুকিয়া থাকে, বোতল খালি থাকিলে তাহার মাথা কখন বুকে না অর্থাৎ যে মনুষ্যের জ্ঞান থাকে তিনিই নম্রতা ও হীনতা অধিকার করেন এবং আপন মাথা বুকাইয়া থাকেন। যাঁহার মস্তকে কিছুই পদার্থ নাই তাঁহার মস্তক কি কখন অবনত হইতে পারিবে ? নম্রতা ও হীনতা যেমন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নিকট শোভা পায়, তেমন অশিক্ষিত ও দরিদ্রের নিকট শোভা পায় না। কারণ উহা তাহাদের এক প্রকার অভ্যাস বলিতে হইবে, এই মর্মে মওলান সাদি বলিয়াছেন।—

পার্শ্বী ।

“তওয়াজো জেগর্দন ফরাজী নে কোস্ত
গদাগর তওয়াজো কুনদ খোয়ওস্ত”

ইহার অর্থ এই যে, হীনতা ও নম্রতা প্রকাশ করা দরিদ্রের কার্য্য, কিন্তু উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, অতএব আত্মাভিমান, গৌরব ও অহঙ্কারাদি ঘৃণিত ব্যবহার ত্যাগ করিয়া নম্রতা ও হীনতাসহকারে ব্যবহার করা জ্ঞান-বানের কার্য্য ; নচেৎ ইহাতে মনুষ্যের অশেষ দুর্গাম, কলঙ্ক ও অনিষ্টই হইয়া থাকে ; কেহই তাহার কোন প্রকার প্রশংসা করে না। মহাপুরুষ সাদি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“হরজা অসালতন্ত তওয়ারজো দলিল উ
তেগে অসিল রা বখমিদন তওয়ার শনাখত”

ইহার অর্থ এই যে, নম্রতা ও হীনতা, আসল ও নকল অর্থাৎ বুনিয়াদ ও বে-বুনিয়াদের প্রধান পরিচয় ও প্রমাণস্থল । ইহার দলিল অতি সহজেই দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায় । যে তরবারী আসল লোহার গঠিত, সেই তরবারীই ঝুকিয়া থাকে, কিন্তু খারাপ লোহার তরবারী হইলে কখনই সে ঝুকে না, সোজা হইয়াই থাকে, মনুষ্যের মধ্যেও তাহাই ।

২ । যাহাতে নিজের যশঃ, মান ও গৌরবের বৃদ্ধি হয়, তদনুরূপ কার্য্য করাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্তব্য । এই নিমিত্ত দীন-দরিদ্র, স্বজাতি, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবাসী, স্বদেশী, বিদেশী পরিচিত ও অপরিচিত সকলের নিকট নম্রতাসহকারে কার্য্য করা মনুষ্য মাত্রের উচিত । যাঁহার চরিত্রে এ গুণ নাই, লোকে তাঁহাকেই অহঙ্কারী বলিয়া থাকে । অহঙ্কারীশব্দ বড়ই ঘৃণিত । অহঙ্কারীর পরিণাম বড়ই মন্দ, ইহকাল ও পরকাল কোথাও তাঁহার সুখ নাই । তিনি নিজেই মনে ভাবিতে পারেন যে আমি বড়ই সুখী, কিন্তু তাঁহার সুখে যখন অপর কেহ কোন প্রকার সুখ অনুভব করিতে পারে না, তখন তাঁহার সে সুখ না থাকাই মঙ্গল । অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজের কার্য্যে উন্মত্ত হইয়া সাধারণের অশেষ অমঙ্গল করিয়াই থাকেন । যখন তাঁহার

দ্বারা জীবে কষ্ট পায়, তখন কি প্রকারে জীবের সৃষ্টিকর্তা সেই দয়ালু পরমেশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন । তিনি সন্তুষ্ট না হইলে অহঙ্কারী ব্যক্তি সুখ ও শান্তি কোথায় পাইবেন । ইহকালে সাধারণের নিকট নিন্দনীয় ও ঘৃণিত হইয়াই রহিলেন, পরকালে শাস্তির পরিবর্তে নিজ চরিত্রদোষে আজীবন নরকের শাস্তি ভোগ করিবেন, ইহাই সর্ব শাস্ত্রের ব্যবস্থা । পবিত্র কোরাণ শরিফের ১৪শ পারায় সুরায়ে “নহল” তাহার প্রমাণ দিতেছে । অহঙ্কার বা গর্ব কখন কাহারও থাকে না । ঈশ্বরের অহঙ্কার নাই, এইজন্য মনুষ্যের অহঙ্কার শীঘ্রই খর্ব হইয়া যায়, এই মর্মে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

উর্দু ।

“হোবাবে-আব কো দেখো কে কয়না সির ওঠাতা হায়
তকবুর ওহ বুরিশার হায় কে ফওরগ টুট জাতা হায়”

ইহার অর্থ এই যে, জলবিন্ধকে লক্ষ্য কর, কেমন সে উঠিতেছে ও ধ্বংস হইতেছে । অহঙ্কার ও ঠিক সেইরূপ পদার্থ যে শীঘ্রই তাহা নষ্ট হইয়া যায় । মনুষ্যের জীবন নশ্বর, ইহার মূল্যই হইতে পারে না, অসংখ্য ধনসম্পত্তি এবং ক্ষমতা থাকিলেও যখন জীবনের বিনাশ হয় এবং সেই অসংখ্য ধনসম্পত্তি ও ক্ষমতাদি যখন তাহার কোন কাজে আসে না এবং মৃত্যুর পরে তাহা যে কে কি প্রকারে ব্যবহার করে তাহাও কেহ যখন জানিতে

গিয়া উন্মাদের গায় বৃথা অহঙ্কার করা জ্ঞানবানের নিকট সম্পূর্ণ অন্যায়। সম্পত্তি ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে লোকে অহঙ্কার শূন্য দেখিতে পাইলে তাহার যশঃ, গৌরব ও সম্মানের এতই বৃদ্ধি হয় যে, তাহার জীবদ্দশার ত কথাই নাই, মৃত্যুর পর বহুকাল পর্য্যন্ত মানুষে শত সহস্র প্রশংসার সহিত তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে ও অশেষ প্রকারে তাহার শুভ কামনা করে এবং তাঁহার সম্মান সন্ততি ও ধনসম্পত্তির উন্নতি ও স্থিতির জন্য ঈশ্বর সমীপে নিয়তই প্রার্থনা করে। অসংখ্য লোকের প্রার্থনানুসারে ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা ফলিয়া যায়, কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তির জন্য কেহ কখন শুভ কামনা করে না, তদনুসারে সেও ঈশ্বরের নিকট সেই প্রকার ফল পায়, অতএব এই অহঙ্কার অপেক্ষা অনিষ্টকারী আর কিছুই নহে। অহঙ্কার থাকিলে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার আসিয়া তাঁহার নিকট স্থান পায়, এই নিমিত্ত ইহার দ্বারা যে কত কি প্রকারে অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা কেহ করিতে পারে না।

৩। লোকে নিজের পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতা, ভগিনী আদিকে যেরূপ ভালবাসে ও তাহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তদনুরূপ প্রতিবাসী, আলাপী, পরিচিত, অপরিচিত, ভদ্র ও অভদ্রের সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য। আত্মাভিমানিতা বশতঃ অপর কাহারও সহিত সদ্যবহার না করিলে অথবা উচ্চদের লোকের সহিত মিশিব, আত্মীয়, স্বজন বা প্রতিবাসীর মধ্যে কাহারও সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিব না, ইহা মনুষ্যজীবনে শোভা

পায় না এবং তাহাতে অশেষ অমঙ্গল হইবারও আশঙ্কা । অসময়ে দরিদ্র, প্রতিবাসী বা সাধারণের দ্বারা সামান্য মাত্র মুখের কথায় যে উপকার পাওয়া যায়, তাহার কোন অংশ অসংখ্য অর্থ ব্যয় করিলেও অপরের নিকট পাওয়া যাইতে পারেনা, এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট হইতেও তাহার কোন আশাই করা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ কোন বিশেষ অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত মিশিবার ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত মিশিতে পারেন, ভালই কথা, তবে দল ছাড়া হইয়া আপন আত্মীয় স্বজন আদি প্রতিবাসী সাধারণের সহিত না মিশা বা তাঁহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে সমাজে অশেষ দুর্গাম ও নিন্দনীয় হইতে হয়, তবে যাহার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করা আবশ্যক, অথবা যাহাতে যে সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারিলে নিজ সম্মানের বৃদ্ধি ব্যতীত কোন অংশেই মানের খর্ববতা হইতে পারে না । যিনি এরূপ ব্যবহার না করেন অথবা ইহাকে অসম্মান ও অবজ্ঞা বিবেচনা করেন লোকে তাঁহারই সম্মান করেনা অর্থাৎ তিনিই লোকের নিকট আদরণীয় ও সম্মানশালী হইতে পারেন না এই প্রকার লোককেই লোকে আত্মাভিমानी বলিয়া ঘৃণা করেন । লোকে কেহ কখন তাঁহার বাড়িতে আসে না, আসিলেও যদি যথোচিত সম্মান না পায়, তবে পুনরায় তিনি আর কখনই আসিবেন না, এই প্রকারে আসিয়া কেহ কখন আদর না পাইলে, অপরেও কখন আসিবেন না, এই উদ্দেশে মহাকবি তুলসি দাস বলিয়া-

হিন্দী ।

“আতে আদর করে জাতে করে সম্মান ।

তুলসী কহে মত ছোড়িও জব তক রহে ঘটমে প্রাণ ॥

“অদর নাহি, মান নাহি, নাহি নায়েন কি লেহা

তুলসী কহে মং যাইও জব কাঞ্চনবর্ষে মেঘা”

ইহার অর্থ এই যে, যে স্থানে আসিবার সময় আদর পাওয়া যায় ও যাইবার সময় সম্মান পাওয়া যায়, তুলসীদাস কহিতেছেন দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতেও কখন সে স্থান ছাড়িও না, কিন্তু যে স্থানে আদর, সম্মান এমন কি নয়নের লেশ মাত্রও না থাকে তথায় আকাশ হইতে জলের পরিবর্তে সোনা বৃষ্টি হইলেও সে স্থানে কখন যাওয়া কর্তব্য নহে । অপরের আদর করিলে নিজেও অপরের নিকট হইতে আদর পাওয়া যাইবে, সর্বসাধারণের সহিত কেবলমাত্র সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইয়া কাল কাটাইতে পারিলে জীবনে যে সুখ অনুভব করিতে পারা যায়, রুষ্টভাষী হইয়া অথবা মিষ্টভাষী না হইয়া এমন কি লোকের সহিত মন খুলিয়া ব্যবহার না করিয়া অশেষ ধনসম্পত্তি ব্যয় করিলেও সে সুখ কেহ কখন পাইতে পারেন না । নিরহঙ্কারী ও সদালাপী হইয়া বিনা ব্যয়ে ও কষ্টে যেরূপ অসীম ও অতুলনীয় বশঃ ও গৌরব লোকে পাইয়া থাকেন, আত্মাভিমानी ও অহঙ্কারী হইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিলেও সে বশঃ ও গৌরবের কোন অংশও পাইবার আশা করিতে পারেন না । অতএব এরূপ বিনা ব্যয়ে এ প্রকার অমূল্য রত্ন প্রাপ্তির উপায়ের জন্য অবহেলা করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ।

৪ । মনুষ্য জীবনে সদালাপী, মিষ্টভাষী হওয়া ও পরস্পরের মধ্যে সদ্যবহার করা সর্বসুখের মূল । যাহার ব্যবহারে কেহ সন্তোষলাভ করিতে পারে না, অথবা যাহার জন্য কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, বা ভাল বলে না, কিম্বা যাহার গুণে তাঁহার স্ত্রী বা পুত্র আদি কি পিতা বা মাতা অথবা আত্মীয় বা প্রতিবাসীগণ দুঃখিত অথবা অসন্তুষ্ট এবং যে স্থলে চরিত্র দোষে বিরহ ও কলহ সতত বিद्यমান, তাঁহার দুঃখ ও কষ্ট নিয়ত লাগিয়াই থাকিবে । স্বামী নিয়ত আপন স্ত্রীর সহিত, অথবা স্ত্রী স্বামীর সহিত বা কেহ কোন জ্ঞাতি কি প্রতিবাসীর সহিত দ্বন্দ্ব করিতে থাকিলে তথায় কেহ কখন সুখী হইতে পারিবে না । তথায় রহমতের ফেরেশতার আগমন হইবে না । হিন্দুগণ বলেন নিয়ত বিরহ, দ্বন্দ্ব কি কলহ হইবার স্থলে লক্ষ্মী কখনই স্থান পান না । যেখানে মনের শান্তি না থাকে, তথায় কোন সুখ ও সচ্ছন্দতা থাকে না, তাহাদের পরিণাম ফল মন্দই হইয়া পড়ে, ইহাই ঈশ্বরের ব্যবস্থা ।

৫ । সময় ও কালের পরিবর্তন অনুসারে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই রাজ ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুরুষগণের আচার, ব্যবহার ও বেশ ভূষা আদি সমূহ বিষয়ের অনুকরণ করিয়া উঠিয়াছেন বা উঠিতেছেন । দুঃখের বিষয় রাজপুরুষগণের আভ্যন্তরিক সৎগুণ সমূহ, যথা—কষ্ট সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, যত্ন, চেষ্টা, স্বজাতিপ্রিয়তা, পরস্পরের মধ্যে একতা ও বিশ্বাস ইত্যাদি যাহা রহিয়াছে তাহার একটীর নিকটে ও যান না কেবলমাত্র বাহ্যিক আড়ম্বরযুক্ত কতকগুলি বিষয় লইয়া

আপনাদের জীবন ও ধনের ক্ষতি এবং সমাজের ও দেশের অনিষ্ট করিতেছেন । এই সংক্রামক রোগের এত বিস্তার হইয়াছে যে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সকলকেই এই রোগে আক্রান্ত দৃষ্ট হয় । ইহার দ্বারা দেশের ও সমাজের কতই যে অমঙ্গল ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না । সভ্যতার ভান করিয়া নিজেদের বেশ ভূষা ও চাল চলন আদি সমূহ বিষয় ত্যাগ করিয়া দেওয়ায় ব্যয়ের আধিক্য প্রযুক্ত অনেকেই নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছেন, বাহ্যিক বেশ ভূষা ও মুখাকৃতি অবলোকন করিলে হিন্দুকে হিন্দু ও মুসলমানকে মুসলমান বলিয়া সহজে চিনিয়া উঠিতে পারা কঠিন । ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া নাম জিজ্ঞাসা না করিলে চিনিতেই পারা অসাধ্য । রাজ দরবারে উপস্থিত হইবার সময় যথোচিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা স্বতন্ত্র কথা, তাহাতে কেবলমাত্র আমার পুলিশ বিভাগেই পোষাকের হিসাব আছে মাত্র, অপর কোন কর্মচারীর পক্ষে তাহার কোনই নিয়ম নাই, তবে ধুতি ও উড়নি ছাড়া যে কোন প্রকারের কাটা কাপড় পরিধান করা যায় তাহাতে আমার দয়ালু ইংরাজ রাজ পুরুষগণ কোন দোষ ধরেন না । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সহজে ও অবাধে পবিত্র নমাজের কার্য সম্পন্ন হইতে না পারিবে, সচরাচর তদ্রূপ পোষাক পরিধান করিয়া থাকা অন্যায় ও অবিধি । এক্ষণে সময়ের এতই পরিবর্তন হইয়াছে যে, বালকগণকেও বাল্যকাল হইতে আর আপন জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেন না, এবং বালকগণও হিন্দু এবং খৃষ্টান বালকের সঙ্গে ও সহবাসে

থাকিয়া অনেক স্থলে আপন জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ও টুপি ব্যবহার করিতে লজ্জিত, এমন কি দোষ মনে করিয়া থাকেন । আমার পবিত্র ধর্ম্মে টুপি পরিধান করা সুপ্নং, শূন্য মস্তক থাকা অপেক্ষা মস্তকে টুপি থাকিলে মুখশ্রী উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেহমধ্যে মস্তক সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ইহাকে শূন্য রাখা অপেক্ষা ইহার শোভা বর্দ্ধন করা সকলেরই কর্তব্য । মুসলমান রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতবাসী হিন্দু মহোদয়গণও ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া এতাবৎ মস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই ইহার ব্যবহার ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে । বালকগণকে বাল্যকাল হইতে এইরূপ কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের কর্তব্য নহে । বালকগণের বাল্যকালের ব্যবহার অধর্তব্য বলিয়া বাদ দিলে প্রৌঢ় ও যুবকগণের ব্যবহার অবশ্যই ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-নীতি অনুসারে ধর্তব্য হইতে পারিবে । এক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমার পবিত্র সমাজ ও ধর্ম্মগত ব্যবহারকে এত নিকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে কেহই হঠাৎ দিনদার মুসলমান বলিয়া চিনিয়া উঠিতে পারিবেন না । একেত রাজবেশে ভূষিত, তাহাতে আবার গোঁপ বাড়াইয়া দাড়ি মুণ্ডন করিয়া দেওয়ায় এবং কেহ আবার উপস্থিত “কর্জ্জোনিয়ন ফ্যাশন” অনুযায়ী অর্থাৎ লাট কর্জ্জন সাহেবের ধরণে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ন্যায় দাড়ি ও গোঁপ উভয়ই কাটাইয়া দেওয়ায় হিন্দু, খৃষ্টান কি মুসলমান বলিয়া সহজে চিনিয়া উঠিতে পারে

এমন সাধ্য কার ? ইহাতে তাঁহারা যে কি সুখ ও উপকার বুঝেন তাঁহারাই জানেন । এরূপ ব্যবহার কোন ক্রমেই আমার ইসলামধর্ম্মানুমোদিত নহে । জনাব রসূলে খোদা দঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন পবিত্র হাদিস শরিফ আছে—

আরবী ।

“ওফ ফেকুল লোহা ও কস সুশ শোয়ারির”

ইহার অর্থ এই যে, দাড়িকে বড় কর ও গোঁপকে কাটাও । হে দিনদার মুসলমান মহোদয় ভ্রাতৃগণ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া জনাব রসূলের করিমের দঃ উম্মরূপে গণ্য হইবার দাবি করিতে গেলে জনাব রসূলে করিমের দঃ আদেশ অবমাননা করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্য করা কর্তব্য নহে, তদনুরূপ দাড়ি কামাইয়া গোঁপ বাড়াইলে পবিত্র ইসলামধর্ম্মের অবমাননা হয়, রসূলে করিমের দঃ আদেশ ও ব্যবস্থা সমস্তই ঈশ্বরানুমোদিত ও পরীক্ষিত । এদিকে আমরা মুসলমান বলিয়া লোক গণনার সময় সংখ্যায় বৃদ্ধি করিলাম কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় নিজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রসূলে পাকের দঃ এই অতি সামান্য আদেশ, যাহাতে কাহারও কোন ব্যয় নাই, কোন কষ্ট নাই, কোন ক্ষতি নাই, কোন অনিষ্ট নাই এমন কি যাহাতে উপকার ব্যতীত অনুপকারও নাই তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছি ; এই কার্য্যের ফল আমাদের পক্ষে কখনই সুখকর হইবে না । তিনি আমাদের উপকার ও অনুপকার বুঝিয়াই আদেশ দিয়াছেন । দাড়ি থাকিলে দাঁতের পক্ষে অশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

ছিলেন, ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য শরীরে যে ৯টি দ্বার আছে তদ্বারা যে যে পদার্থ নির্গত হয় তাহা মনুষ্য শরীরের গ্লানি বিশেষ ও স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী ঘৃণার্হ পদার্থ ; তন্মধ্যে নাসিকার দ্বার হইতে নির্গত পদার্থ ও তাহাই । গৌপ বড় থাকিলে নাসিকা হইতে নির্গত পদার্থ তাহাতে লাগিয়া থাকিবে, তাহার আশ্রয় পুনরায় নাসিকায় প্রবেশ করিবে ও ও পানীয় পদার্থে মিশ্রিত হইয়া পেটে গেলে অবশ্যই যে অস্বাস্থ্যকর হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এই নিমিত্তই ইহার কাটাইবার আদেশ, ফলে উদ্দেশ্য ও কারণ তত্ত্ব করিবার জন্য আমাদের কাহারও কোন অধিকার নাই, তবে আদেশ আছে তাহা পালন করিতে আমরা বাধ্য । ইহা আরও পবিত্র ইসলামধর্ম্মাবলম্বীগণের বাহ্যিক চিহ্ন বিশেষ, অতএব দাড়ি ও গৌপ সম্বন্ধে আদেশ প্রতিপালন, টুপি ব্যবহার ও জাতিগত পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রত্যেক মুসলমান বালক ও যুবক সকলেরই কর্তব্য, ইহাতে শারীরিক ও আর্থিক বিশেষ উপকার আছে । আমার জাতীয় বস্ত্রে খরচ অত্যন্ত কম পড়ে, দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর । রাজপুরুষগণের পোষাক ও ব্যবহার তাঁহাদের শীতপ্রধান দেশের পক্ষেই মঙ্গলকর, অর্থাৎ উহাদের জন্য উপকারী । যিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এই সব বিজাতীয় ও গর্হিত ব্যবহারকে ভাল মনে করিয়া বিজাতীয়গণের আচার, ব্যবহার পোষাক ও পরিচ্ছদকে পসন্দ করিয়া তাহাদের সমতুল্যতার পরিচয় প্রকাশ করিবেন, তাঁহার হশর অর্থাৎ পরকাল তাঁহাদেরই

সঙ্গে হইবে বলিয়া জনাব রসুলে করিমের দঃ আদেশ আছে।
(এ সম্বন্ধের হাদিস শরিফ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে)।

৬। নব্য সভ্যতা ও শিক্ষার গুণে ইংরাজি শিক্ষিত
ভ্রাতৃগণ পূর্ব পুরুষের আবাহমানকালের বহুতর পবিত্র
ব্যবহারকে অবজ্ঞা করিয়া বসিতেছেন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা ও গুরুজন ইত্যাদিকেও রীতিমত অভিবাদনপূর্বক
তাহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করেন না বলিলে অন্যায়
হয় না। দেখা সাক্ষাত হইলেই সুন্দর একটা মিষ্ট বাক্য
“গুডমর্নীং” বলিয়াই কাজ সারিয়া লন, অসাক্ষাতে চিঠি
পত্রাদিতে “ডিয়ার” শব্দেই সমূহ ঝঙ্কট চুকাইয়া ফেলেন, অথবা
হঠাৎ দুর্ভাগ্য বশতঃ সাক্ষাত হইয়া পড়িলে একটা মাত্র
দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্বক “শেকছাণ্ড” অর্থাৎ হাতে হাত
ধরাধরি করিয়াই সমূহ কাজ শেষ করিয়াই থাকেন। ইহাতে
যে, পিতা, মাতাদি গুরুজনের যথোচিত সম্মান রক্ষা হইয়া থাকে,
তাহা কখনই হয় না। ইহা কেবল আমার রাজপুরুষগণের
পক্ষেই শোভা পায়। আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে
যে রূপ সৌহৃদ্য আছে তাহাতে কেবল এইরূপ বাক্যে কাজ
সারিয়া লইলে পিতা, মাতা ও গুরুজনের অন্তঃকরণে ব্যথা
লাগে। “শেকছাণ্ড” আমাদের মধ্যেও আছে, তাহা উভয় হস্ত
ধারণে সম্পন্ন করিতে হয়, একটীমাত্র হস্ত দ্বারা হয় না, যে
কার্য্য আমার ধর্ম্মসঙ্গত তাহার সংক্ষেপ করা আমাদের ক্ষমতা
নাই। “গুডমর্নীং ও ডিয়ার” আদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া
গুরুজনকে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ অন্যায়। এই প্রকারের

কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ব্যবহারও আমাদের সমাজে নবাবী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে । “গুডমর্নীং” শব্দের অর্থে কোনই ভাব আসে না, ইহাতে এইমাত্র বুঝায় যে, আমার অঙ্ককার প্রভাত সূপ্রভাত, তজ্জন্যই অঙ্ক আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ হইল, কিন্তু যদি ক্রমান্বয়ে একেরপর এক কি অধিক সংখ্যক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে কাহার সাক্ষাৎ জন্ম আমার প্রভাত সূপ্রভাত হইল বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন । এইরূপে আমাদের সমাজেও “আদাব” ও “বন্দেগী” আদি শব্দের ব্যবহারে কোনই ভাব নাই । বিজাতীয় কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই প্রকার আদাব অথবা বন্দেগী শব্দ উচ্চারণ পূর্বক অভিবাদন করা অন্যায় নহে, তাহাতে কোন আসে যায় না । পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও গুরুজনের সহিত সাক্ষাতে তাঁহাদের পদদ্বয়ে হস্ত প্রদান পূর্বক পদচুম্বন করা বা তাঁহাদের হস্তে ভক্তিতে উভয় হস্ত প্রদান পূর্বক হস্ত ঈষৎ মর্দন ও চুম্বন সর্বতোভাবে কর্তব্য । ইহাতে লজ্জিত বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই । কোন গুরুজন অথবা অন্য কোন দিনদার মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার পাক পয়গম্বরের প্রিয় বাক্য যাহা পৃথিবীর সৃষ্টির আদি হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে সেই পবিত্র বাক্যই উচ্চারণ পূর্বক অভিবাদন করা আমাদেরও কর্তব্য । জনাব রসুলে করিম দঃ সতত সর্ব অগ্রেই সকলকে এই পবিত্র বাক্য—

আরবি ।

“অস সলামো অলেয়কুম”

উচ্চারণ পূর্বক অভিবাদন করিতেন । অনেকেই আপন

আপন মনে মনে ধারণা করিয়া আসিতেন যে, অতঃপরে আমিই জনাব রসুলে করিম দঃ কে অভিবাদন করিব, কিন্তু খোদাওন্দ করিম আমার পাক পয়গম্বর দঃ কে এমনই ক্ষমতা দিয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপরে আগন্তুক মহোদয়কে অভিবাদন করিতেন । তাঁহার জীবদ্দশায় কেহ কখন তাঁহাকে অতঃপরে অভিবাদন করিতে পারেন নাই । তিনি এই পবিত্র বাক্য দ্বারা আবাল বৃদ্ধ সকলকেই অভিবাদন করিতেন, অতএব এই পবিত্র বাক্যে পরস্পরে অভিবাদন করা আমাদের পক্ষে প্রধান স্মরণ্য । কেতাবে আছে, সলাম করা স্মরণ্য ও তাহার উত্তর দেওয়া ফরজ, কারণ এই সলামের উত্তর দেওয়ার জন্য খুদ খোদায়ে পাক আপন কলাম মুজিদে আদেশ করিয়াছেন—

আরবি

“এজহইই তুম বে তহিএতিন ফ হই উবেহা আও খতরমমিনহা”

ইহার অর্থ এই যে, তোমাকে কেহ সলাম করিলে তুমি তাহাকে আশীর্বাদ সহ উত্তর প্রদান করিও । এই নিমিত্ত সলামের উত্তর দিবার সময় নিম্নের কথাগুলি—

আরবি ।

“ও অল্লকোমুস সলাম ও রহমতুল্লাহে বরকাতহু”

বলা কর্তব্য । হাদিস শরিফে আছে, যিনি অতঃপরে সলাম করেন তিনি স্মরণ্য আদায় করেন । যিনি এই স্মরণ্য আদায় করেন তাঁহার তিনগুণ সওয়াব অর্থাৎ পুণ্য হয় ; যিনি ইহার উত্তর দেন তিনি ফরজ আদায় করিলেন কিন্তু তাঁহার একগুণ মাত্র সওয়াব

হইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি অগ্রে সলাম করেন তিনি আপন অহং ও তমোগুণ ত্যাগ করিয়া সলাম করিলেন, এই নিমিত্ত তাহাতে তিনগুণ সওয়াব হইবে। আমি অগ্রে সলাম করিব, আমার অসম্মান হইবে, আমাকে সলাম করিল না কেন, আমাকেই অগ্রে সলাম করা উচিত, যিনি এইরূপ মনে করেন, তাহাতে খুদি অর্থাৎ অহং আছে, ইহা ঈশ্বরের নিকট নিতান্ত ঘৃণিত। মনে মনে তদ্রূপ ধারণা করিয়া অগ্রে সলাম পাইবার আশা করা, অথবা সলাম না করা, সম্পূর্ণ অন্যায ও অবিধি। অভিবাদনের পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া মস্তক বা শরীর নত করা, অথবা মস্তকোপরি হস্ত উত্তোলন করা অনাবশ্যক মধ্যে গণ্য, জনাব রসুলে করিম দঃ কখন এ কার্য করেন নাই। সলাম শব্দের অর্থ রহমৎ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও কৃপাকে বুঝায়, অতএব অভিবাদনকালে “অস সলামো অলেয় কুম” শব্দ বলিলে আশীর্ব্বাদ করা হয়। ইহার অর্থ এই বুঝায় যে, তোমার উপর খোদার রহমৎ হউক। উত্তর প্রদান কালেও তাহাই এবং তদপেক্ষা আরও অধিক আশীর্ব্বাদ থাকে। ইংরাজী ব্যবহার অনুসারে শেকহাওকালে কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরে হাত নাড়া চাড়া করিয়াই থাকেন, ইহার ফল কিছুই নাই, আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের আদেশ ও ব্যবস্থা হইতেছে যে, পরস্পরে দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তে বাম হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ নাড়া দেওয়া আবশ্যক, ইহাকে “মোসাফেহা” কহে। ইংরাজগণ করমর্দন কালে কেহ কোন বাক্য উচ্চারণ করেন না, তাহার

কৃত্য কোন ব্যবস্থাই তাঁহাদের নাই । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্মের করমর্দনকালে এই পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় যথা—

আরবি ।

“এগ ফেকল লাহো লনাও লকুম”

ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর তোমাকে ও আমাকে রক্ষা করুন । কি সুন্দর ভাব ও কি পবিত্র বাক্য । ইস্তমর্দনের সঙ্গে সঙ্গেও ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা । এই করমর্দন সম্বন্ধে জনাব রসুলে করিম দঃ বলিয়া গিয়াছেন—

আরবি ।

“মামিন মুসলে মৈনে এল তকইয়ানে ফএতা

শাফা হানে গফরল্লাহো লহো মা কবল অই এত কররকা”

ইহার অর্থ এই যে, মুসলমানগণ যখন পরস্পরে করমর্দন করেন, তাঁহাদের পরস্পরের পৃথক হইতে না হইতেই খোদায়ে পাক তাঁহাদিগকে সৌভাগ্য দান করেন ও তাঁহাদের গোনাহ অর্থাৎ পাপ মোচন করিয়া দেন, এ মহৎ উদ্দেশ্যকে ধন্য । পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদের জন্যই পরম দয়ালু রসুলে করিম দঃ আমাদেরকে এই প্রকার আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার মহামূল্য পবিত্র বাক্য কখনই লজ্জিত হইবার নহে । এ দুর্লভ ভাবাপন্ন অমূল্য বাক্য ও ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বৃথা বাক্য ও ব্যবহারে লিপ্ত হওয়া কখনই আমাদের কর্তব্য নহে, তবে যখন যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন সেইরূপ

ব্যবহার করাই উচিত, অর্থাৎ ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে “গুডমর্নিং” বা “শেকহ্যাণ্ড”, হিন্দুর সহিত “আদাব বা বন্দেগী” এবং মুসলমানের সহিত “সলামো আলেয় কুম” অথবা মোসাফেহা করাই কর্তব্য ।

সপ্তম অধ্যায় ।

বিদ্যা ।

১। ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে জীবনের সহিত যে জ্ঞান ও বিবেকাদি ক্ষমতা দিয়াছেন তাহা সকলেরই আছে, কিন্তু মনুষ্য বিশেষে বুদ্ধি ও বিবেচনার তারতম্য তিনিই করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে জ্ঞান ও বিবেকের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বিদ্যা ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা বুদ্ধি ও বিবেচনার ক্ষমতা সমুজ্জ্বল হইতে পারে না ; এই নিমিত্ত বিদ্যা মনুষ্য জীবনের প্রধান শক্তি । বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কারণ পশুর জ্ঞান ও বুদ্ধি কিছুই নাই । পশুর যে জ্ঞান আছে তাহা সীমা বিশিষ্ট, তজ্জন্যই সে জ্ঞান পৃথক, উহাকে পাশব জ্ঞান কহে । মানুষের বিদ্যা না থাকিলে জ্ঞান ও বুদ্ধি কিছুই হয় না । বিদ্যা অশেষ প্রকার । মানুষে বিদ্যাবলে কতই উন্নতি করিয়াছে ও করিতেছে । পূর্বকালের ইতিবৃত্ত হইতে উপস্থিত কাল পর্যন্ত মনুষ্যজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধির কার্য সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে গেলে মানুষে বিদ্যাবলে যে কত প্রকার অলৌকিক ও অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যাইতে পারে না । বিদ্যাহীন মুর্খ ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ কোন কার্য সম্পাদিত হওয়া কেহ কখন আশা করিতে পারে না । যত প্রকার বিদ্যা আছে তন্মধ্যে বাহার দ্বারা ঈশ্বরকে চিনিতে পারা যায় তাহাই সর্ব শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । ইহার দ্বারা মানুষের পরকালের কার্য হইয়া থাকে । অশ্রান্ত বিচার দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধি আদি উজ্জ্বল হইয়া ইহকালে নিজের ও সংসারের উপকার করিতে পারা যায় । আমাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য, প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রে ইহার আদেশ আছে । আমার কোরাণ শরীফে আছে :—

আরবি ।

“তলবুল ইলমা ফরিজতুন অলাকুলে
মুসলামিন ও মুসলেমতিন”

ইহার অর্থ এই যে (ঈশ্বর বলিতেছেন) সমূহ মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই বিদ্যা অধ্যয়ন করা ফরজ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য । ফরজের আদেশ পালন না করিলে পাপী হইতে হইবে । এই মর্মে কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়া গিয়াছেন :—

উর্দু ।

“তলব ইল্ম কা করনা দিলসে আয়জান মন
কে এহ ফর্জ হাম বর হমা মর্দ ও জন”

ইহার অর্থ এই যে, হে প্রিয় বন্ধুগণ মনোযোগ সহকারে বিদ্যা

অধ্যয়ন কর ; পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষে ইহা ফরজ হইতেছে ।
অন্য কোন বিজ্ঞানলোকে বলিয়াছেন :—

উর্দু ।

“তলব ইল্ম কা ফরজ হায় আয় মওমিনো
হদিস হায় নবি কা এহ দিল সে সুনো”

ইহার অর্থ এই যে, বিদ্যা অধ্যয়ন করা ফরজ হইতেছে এ সম্বন্ধে
রসূলে পাক দঃ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর :—

আরবি ।

“অতলবুল ইল্মা লও কানা বিসমিন”

ইহার অর্থ এই যে, বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য চীনদেশ পর্য্যন্ত যদি
যাইতে হয় তথায়ও যাও এবং বিদ্যা অধ্যয়ন কর । এই
বিজ্ঞান জন্য বিস্তর আদেশ ও তাকিদ রহিয়াছে । খুদ
খোদায়ে পাক ও রসূলে মকবুল দঃ উভয়েই এই বিদ্যার
জন্য বিশেষরূপে তাকিদ করিয়াছেন, অতএব এই বিদ্যায়
অবহেলা করা কোন অংশেই কাহারও উচিত নহে । ইহাতে
ইহকাল ও পরকাল উভয়েরই সুখ । বিদ্যা না থাকিলে পশুর
স্তায় জীবন কাটাইতে হইবে অর্থাৎ অতি দীন ও হীন অবস্থায়
কাল কাটিবে । জগৎপাতা জগদীশ্বরকে অর্থাৎ তাঁহার মহিমাকে
বুঝিতে পারিবে না । তাঁহার মহিমা বুঝিতে না পারিলে
কুপথগামী হইয়া যাইতে হইবে । যদিও অনেকস্থলে দেখা
যায় যে, বিজ্ঞানহীন অনেক ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়া সুখে কাল
কাটাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সুখ বিদ্বান ব্যক্তিগণের

বিদ্যার বিমল জ্যোতির্ময় সুখের সহিত তুলনা হইতে পারে না । তাঁহাদের সুখ ইহকালের নিমিত্ত, তাঁহারা পরকালের মহিমা কিছুই বুঝিতে পারেন না । বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহকালে থাকিয়া পরকালে সুখপ্রাপ্তির জন্য আপন আপন বিদ্যাবলে যেরূপ কার্য্য করিয়া লন তন্নিমিত্ত তাঁহারা পরকালে সুখপ্রাপ্তির বিশেষ অধিকারী । তবে পরকালের সুখের নিকট ইহকালের সুখ অতি তুচ্ছ । অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঈশ্বর কেবলমাত্র এমন ক্ষমতা বা শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্বারা তাঁহারা আপন আপন কার্য্য আপনাদের ভাগ্যগুণেই উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহারা নূন । ধনাঢ্য অজ্ঞব্যক্তিগণ অসংখ্য অর্থব্যয় করিয়া যে সম্মানলাভ করিতে পারেন না, বিদ্বানব্যক্তি অর্থহীন হইয়াও যে স্থানেই যান না কেন, সর্বত্র ততোধিক সম্মান পাইয়া থাকেন । বিদ্যাবলে কেবলমাত্র মুখের বাক্যেই বিদ্বান ব্যক্তিগণকে ধনী, নির্ধন সকলেই আদর করেন । ইতি পূর্বের লোকে বিদ্যাবলে আপন আপন বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ, সংসারের নীতিরক্ষা ও নানা প্রকারে ঈশ্বরের মহিমার গুণকীর্তন করাই বিদ্যার প্রধান কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন ও করিতেন, এক্ষণে তাহা আর নাই । পূর্বের বিদ্বানগণ বিদ্যা দান করিতেন, এক্ষণে বিদ্বানগণ বিদ্যাবলে উপায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন । ইহা এক স্বতন্ত্র বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

২ । কাল বিশেষে এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যাই সর্বপ্রধান বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে । এই ভাষাতেও সর্বপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন

করিতে পারা যায় । আজকালকার বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন । পূর্বে ছিল জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জন, এখন আর তাহা নাই । এখনকার রাজবিদ্যা শিক্ষা না করিলে রাজদরবারে কোন প্রকার উপায়ের কোনই আশা নাই, এমন কি রাজদরবার ব্যতীত অন্য কোন স্থানেও কোন প্রকার পদলাভের উপায় নাই । চাকরি করিতে না পারিলে আজকাল জীবিকা নির্বাহ করা শক্ত । যাঁহার ইংরাজি ভাষায় উত্তমরূপ ব্যুৎপত্তি নাই অর্থাৎ সরকারের নিয়ম অনুসারে যাঁহার কোন পাস নাই তাঁহার কোন চাকরি বা উপায় নাই । যাঁহার উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার পাস বা সার্টিফিকেট নাই তাঁহার উচ্চপদ পাইবার আশা নাই ধরিয়াই লইতে হবে । ইহার পর তাহাও বোধ হয় থাকিবে না । এখন এমন কোন স্থান নাই যে তথায় ইংরাজি বিদ্যার আবশ্যকতা নাই, অতএব উত্তমরূপে ইংরাজিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পাস করিতে না পারিলে রাজদরবারে সম্মান লাভ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা শূন্যকঠিন । প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ইংরাজি শিক্ষা করা আর না করা উভয়ই সমান ; ১ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ২য় পরীক্ষা এফ্ এ যাহাতে ও যে প্রকারে হয় তাহা অধ্যয়ন করিয়া পাস করা কর্তব্য । আজকাল এই ২য় পরীক্ষাতেও পাস করিলে উচ্চ বেতনের এবং সম্মানের পদপ্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন, অতএব যে কোন প্রকারে হয় অর্থাৎ যথোচিত সঙ্গতি না থাকিলেও উপবাস করিয়া এমন কি ভিক্ষা করিয়াও ৩য় পরীক্ষা বি এ অধ্যয়ন করিয়া পাস করা কর্তব্য । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে উচ্চ বেতনের ও সম্মানের

চাকরি পাইবার আশা থাকে । এই প্রকারে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া সম্মান লাভ করিতে পারিলে নিজের ও পরবংশের গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহা না করিয়া অল্প বিদ্যা অধ্যয়ন করা ও অসম্মানের পদলাভ, উচ্চবংশের পরিচয় নহে । আমার স্বজাতি ভ্রাতৃগণ আলস্য ও বিলাসিতা প্রযুক্ত এবং জীবিকার চিন্তায় অস্থির হইয়া অল্পকালেই আপন আপন পরিণাম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন তাহা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা করা কর্তব্য ; এক্ষণে আর উচ্চশিক্ষা না হইলে কোনই আশা নাই । এক্ষণে এই ইংরাজিবিদ্যা অর্থকরীবিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে । উপস্থিত স্কুল পদ্ধতি অনুসারে ইহার অধ্যয়নে নীতি সম্বন্ধে কোনই শিক্ষা হয় না । বোধ হয় যেন স্কুল পাঠ্যপুস্তক সমূহের মধ্যে নীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক না থাকাই ইংরাজি নিয়মের ব্যবস্থা ; এই নিমিত্ত এই ইংরাজিভাষা অধ্যয়নকারী অধিকাংশ ব্যক্তি ইহারই অভাবে প্রায় নীতি হীন ও তৎসহ ধর্মহীন হইয়া গিয়া আপন আপন সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়েন । আচার, ব্যবহার কলঙ্কিত হইয়া যাওয়ায় সমাজে ঘৃণিত হইয়া গেলে সর্বসাধারণে কেহ তাঁহাকে ভাল বলে না ও তাঁহার মঙ্গল জন্য কেহ কখন খোদায়ে করিমের সমক্ষে শুভকামনা করে না । সাধারণের চক্ষে মন্দ হইয়া গেলে ঈশ্বর সমীপে ও পরকালে তাঁহার সুখের আশা খুব কমই করা যায় । আপন জীবিকা নির্বাহ জন্য কোন একপ্রকার শিল্পশিক্ষা করা যেমন, আর আজকালকার ইংরাজিবিদ্যা অধ্যয়ন করাও ঠিক তাহাই । যখন এই অর্থকরী বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলেই নয় তখন অম্পন ইহকাল ও পরকালের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করা বুদ্ধিমানের কার্য্য । অতএব যাঁহার ধর্ম্মে যে আদেশ ও যাঁহার ধর্ম্মে যাহা নিষেধ আছে তাহা মান্য করিয়া কার্য্য করা সৎব্যক্তির কার্য্য । এই নিয়মে কার্য্য করিলে সাধারণের নিকট এই ইংরাজিভাষাভিজ্ঞব্যক্তির যশঃ ও গৌরবের সীমা থাকে না । এই প্রকারে যশঃ বৃদ্ধি হইলে আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী, ও দেশস্থ আপামর সকলেই ঈশ্বর সমীপে অশেষ প্রকারে তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে থাকে, তাহাতে তাঁহার ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই সুখ পাইবার আশা । এই প্রকার অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ইংরাজিভাষায় মহাবিদ্যান হইয়াও আপন আপন ধর্ম্মগত রীতিনীতি ও পদ্ধতি আদির কিছুই ব্যতিক্রম করেন না ; তাঁহারা যখন আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ও নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন, তখন অপরে যে, কেন'না পারিবে ইহাই আশ্চর্য্য । এইরূপে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া আপন আপন ধর্ম্মগত নিয়ম ও রীতিনীতি রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে পরম্পরে ও সাধারণের সহিত সৌহৃদ্য ও বিশেষ সৌজন্য জন্মিবে, নচেৎ পরম্পরের মধ্যে ধর্ম্মগত বিশ্বাসের বিভিন্নতা ও আচার ব্যবহারে পার্থক্য উৎপন্ন হইয়া গেলেনে জগতে অশেষ অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে । এক্ষণে আমাদের দেশে প্রায় এইরূপ দশাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; যাহাতে ইহার বিনাশ হয় তাহাই প্রার্থনা ।

৩। সংসারযাত্রা নির্বাহ জন্ম যিনি যাহা শিক্ষা করুণ না কেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজন । মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মধ্যে কেবলমাত্র এই এক ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য

কোন বিষয়ের বিশেষ বিভিন্নতা নাই । পশুতে বাকশক্তিহীনতা প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই, নচেৎ ধরিতে গেলে, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাদি মনুষ্যজাতির সমান সকল বিষয়ই পশুতে আছে, অতএব যে মানুষে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই তাহাকে এক প্রকার বাকশক্তি বিশিষ্ট পশু বলিলেই হয় ; এই নিমিত্ত ঈশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই ধর্মের সীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেকের ধর্মশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । জগতে অনেকধর্ম আছে, যিনি যত প্রকার ধর্মের শিক্ষা করিতে পারেন ততই উত্তম, নচেৎ যে ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকা যায় অন্ততঃপক্ষে তাহার শিক্ষাই নিতান্ত আবশ্যিক । আমাদের দেশে ইংরাজরাজের রাজত্বকালের প্রারম্ভে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইংরাজি বিদ্যার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিজে ও বালক বালিকাগণকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় বিশেষ অযত্ন করিলেন, যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা করিলেন, তাঁহারা রাজপুরুষগণের নিকট সমাদৃত হইতে থাকিলেন, ক্রমে তাঁহাদেরই উন্নতি হইতে লাগিল কিন্তু তৎসহ আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিতে লাগিলাম, এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইবার পর যদিও কেহ আপন আপন বালকগণকে ইংরাজি শিক্ষার জন্য মনস্থ করিলেন, তখন বাল্যকালে নিজধর্ম পুস্তক ও ধর্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন, ইহাতেই এক প্রকার বাল্যকাল অতীত হইয়া যৌবন কালের আরম্ভ হইয়া পড়িল, এমন সময়ে কিছু না কিছু ইংরাজী শিক্ষা হইতে না হইতেই বালকটী যৌবনাবস্থায় পরিণত হইলেন, তখন আর বিদ্যা অধ্যয়ন করে কে ? আমাদের বালকগণের মধ্যে

এমন বালক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বাল্যকালে ধর্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া যৌবনাবস্থায় রাজবিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করত উপযুক্ত হইয়াছেন, তবে হাজারের মধ্যে ২।১ জন থাকাও বিচিত্র নহে। এমন অবস্থায় বালকগণকে বাল্যকালে কেবলমাত্র ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে দেওয়া আর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কুঠারাঘাত করা একই সমান বলিতে হইবে। বাল্যকালে ধর্মবিদ্যা ও রাজবিদ্যা উভয়ই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, অথবা বাল্যকাল হইতে ধর্ম সম্বন্ধীয় রীতি ও নীতি বালকগণকে মৌখিকরূপে শিক্ষা দিতে থাকিয়া রাজবিদ্যা অধ্যয়ন কারাইতে থাকাই মঙ্গল। বালকগণ এইরূপে শিক্ষা প্রাপ্তির পর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আপন আপন ধর্মবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। এক্ষণে ধর্মবিদ্যার মধ্যে কেবলমাত্র কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে পারা ও পবিত্র রোজা ও নমাজাদির ক্রিয়া সম্পর্কীয় পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক যিনি আপন জীবনে যত অধ্যয়ন করিতে পারেন ততই মঙ্গল, বাল্যকালে বালকগণকে আর অধিক পড়াইতে গেলে সময় নষ্ট, এক্ষণে ধর্মবিদ্যায় ধর্ম-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই উপকার নাই। বালকগণকে বাল্যকাল হইতে রাজবিদ্যা শিক্ষা না দিলে রাজদরবারে উন্নতি লাভের আশা খুবই কম। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের চেষ্টা ও শিক্ষা না করিলে ইংরাজী ভাষায় নানাপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া যায়। স্বীয় ধর্মে দৃঢ়তা না জন্মিলে, হিন্দু হইয়া মুসলমানের আচার ও

মুসলমান হইয়া খৃষ্টানের ব্যবহার করা, তাহাতে আবার, না যীশুখৃষ্টের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, না মহম্মদের দঃ আদেশ অনুযায়ী কার্য করা, না হিন্দুমতে দেবার্চনা বা উপাসনা করা, কোন পথই অবলম্বন করা হয় না ; অতএব গুমরাহ অর্থাৎ বিপথগামী হইয়া গিয়া ধর্মহীন হইয়া যাওয়া এবং আহার ও ব্যবহারে কোন দোষ নাই বলিয়া প্রকাশ করা, কোন বিদ্বান ব্যক্তির কার্য্য নহে । কোন না কোন এক ধর্ম্মে দৃঢ় হওয়াই কর্তব্য ও সেই ধর্ম্মের আদেশ পালন করা উচিত ।

অষ্টম অধ্যায় ।

জীবিকা ।

১ । ঈশ্বর জীবে যেমন জীবন দান করিয়াছেন তেমনই জীবন ধারণ জন্য শরীরে নানা প্রকার শক্তি ও উপাদান প্রদান করিয়াছেন । জগতে অন্যান্য জীব সমূহের মধ্যে ঈশ্বর মনুষ্য-জাতিকেই সর্বপ্রধান জীব করিয়াছেন, মনুষ্যজাতির যেমন বাকশক্তি, বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা আদি ক্ষমতা দিয়াছেন, তদ্রূপ অন্য কোন জীবে দেন নাই ; এই নিমিত্ত মনুষ্য-জাতিসমূহ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবে যে প্রকারে ও উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে মনুষ্যজাতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায়ে ও প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে ; আপন শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য জীবের অপেক্ষা উন্নত ও

শ্রেষ্ঠতর প্রকারে ও উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই মনুষ্যের কর্তব্য । নিকৃষ্ট জীবে জ্ঞান ও বিবেক না থাকায় তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন অপেক্ষা দুর্বলের প্রতি হিংসা করিয়া উহাদিগকে বধ করে ও তাহাদিগকে উদরস্থ করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করে, ইহা কেবল হিংস্র জন্তুরই কার্য্য । এই প্রকার হিংস্র জীব আবার অপরাপর জীব সমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট । মনুষ্য হইয়া জ্ঞান ও বিবেকহীন এইরূপ নিকৃষ্ট হিংস্রজন্তুর ন্যায় অন্য দুর্বল মনুষ্যের প্রতি হিংসা ও ঘেঁষ করিয়া অর্থাৎ আপন কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া মন্দ ইচ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের রক্ত শোষণের ন্যায় অণ্ডায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অর্থ গ্রহণ করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে, অর্থাৎ আপন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নহে । জীবন মাত্রের ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু অনিবার্য্য, ইহাতে কাহারও কোন অধিকার নাই । মৃত্যুর নিকট সবল ও দুর্বলের কোনই বিভিন্নতা নাই, যিনি যে প্রকারে বা উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করুন না কেন, একদিবস তাঁহার মৃত্যু হইবেই হইবে ; তৎকালে তাঁহার সবলতা বা দুর্বলতা, ধনসম্পত্তি আদি কিছুই উপকারে আসিবে না, সাদি বলিয়াছেন :—

পার্শ্ব ।

“চো আহঙ্ক রফতন কুনদ জান পাক

চে বর তখ্ত মুরদন চে বর কয়েথাক”

ইহার অর্থ এই যে, যখন পবিত্র আত্মা দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তৎকালে ভূতলে মৃত্যু হওয়া আর সিংহাসনোপরি মৃত্যু

হওয়া একই, এইরূপস্থলে, সবল, দুর্বল, ধনী ও নির্ধনের পরিণাম যখন একই, তখন এই ক্ষণস্থায়ী দেহের জন্য সবল হইয়া হীন ও দুর্বলের প্রতি, ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া, নির্ধন ও অসহায়ের প্রতি অণ্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিষ্ফল । এই মর্মে হজরত সাদি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“আয়জবরদস্ত জের দস্ত আজার

গরম তা কায় বমানদ ইঁ বাজার”

ইহার অর্থ এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারকারী হে সবল ব্যক্তি তোমার এই গরমের বাজার কতদিন থাকিবে, অর্থাৎ তোমার এ বাজার চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী নহে । সর্ব শাস্ত্রেই বলে ইহকালের পর পরকাল আছে । তৎকালে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর ইহকালের কার্য্য কলাপের আলোচনা ও বিচার করিবেন । আমাদেরই কার্য্য সমূহ আমাদেরই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ-বাদী হইয়া দাঁড়াইবে, আমাদেরই সংকার্য্যের পুরস্কার ও অসংকার্য্যের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে । তাহা ইহকালের বিচার নহে, স্বয়ং সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা-পুরুষের বিচার । লোকে যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দোহিত্রাদির জন্য অণ্যায় ও অত্যাচার করিয়া ধন, সম্পত্তি রাখিয়া যায়, পরকালে সেই পুত্র ও কন্যাদির উক্ত ধন, সম্পত্তি কিছুই উপকারে আসিবে না এবং ইহকালের বিচারালয়ের ন্যায় উকিল, ব্যারিষ্টারাদি কাহারও কোন অধিকার এবং ক্ষমতা

থাকিবে না, সুতরাং সকলকেই যে যার স্ব স্ব কর্মের ফলভোগ করিতেই হইবে । তৎকালে সেই কর্ম সমূহ বিচারকের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে । এক্ষণে দেখিতে গেলে ইহকাল কেবল মাত্র আমাদের পরকালের ক্ষেত্র বিশেষ ; এই সংসার-ক্ষেত্রে যিনি যেরূপ ফসল উৎপাদন করিতে পারিবেন পরকালে তিনি তদ্রূপই ফলভোগ করিবেন । খুদ রসুলে পাক দঃ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

আরবী ।

“অদ ছুনিয়া মজরা অতুল লিল আখেরৎ”

ইহার অর্থ এই যে, এই দুনিয়া পরকালের ক্ষেত্র হইতেছে । পরকালে যে সকল অপরাধ জন্য মানুষে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য হইবে তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে অর্থাৎ নিজ দেহের প্রতি অত্যাচার ও পর দেহ ও অন্তঃকরণের প্রতি অবিচার এবং ঈশ্বরের আদেশের লঙ্ঘন । নিজ দেহের প্রতি অত্যাচার জন্য দণ্ড বা ক্ষমা ঈশ্বরের অধিকার, পরের উপর অত্যাচার জন্য বিচার, ক্ষমা বা দণ্ড উৎপীড়িত ব্যক্তির অধিকারেই হইবে । ঈশ্বর তখন এই অধিকার তাঁহাদিগকেই প্রদান করিয়া দিবেন, ইহাই সর্ব শাস্ত্রের ব্যবস্থা । পরকালে যে বিচার হইবার কথা, তাহাত হইবেই হইবে, কিন্তু মানুষে ইহকালে যে যাহা করে, ঈশ্বর তাহার কার্যের প্রতিফল অনেক স্থলে জগৎবাসীগণকে তাহার জীবদ্দশাতেই দেন, এই নিমিত্ত ভাল করিলেই ভাল ও

মন্দ করিলেই মন্দ হয়, ইহাই ঈশ্বরের কার্য্য ও ব্যবস্থা । ভাল বা মন্দ কার্য্যের পরিণাম ফল যদিও কখন কাহারও জীবদশায় দেখা যায় না (অনেকের দেখা যায়) তত্রাচ উহা কখন ঈশ্বরের নিয়মের বৈলক্ষণ্য বলিয়া ধর্তব্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহার সেই কর্ম্মের প্রতিফল তাহার পর পুরুষেও ঘটয়া থাকে, কারণ পুত্র ও পৌত্রাদিগণ আপন পিতা ও পিতামহের ঔরস সন্তৃত বলিয়া উহারা আপন পিতা ও পিতামহের অংশ । ইহাই ঈশ্বরের বিধি । ঈশ্বরের বিধি, ব্যবস্থা ও নিয়ম অনুসারে কর্ম্মীর কর্ম্মের পরিণামফল হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেই কর্ম্মী অর্থাৎ অপরাধকারীর অবর্ত্তমানে ঈশ্বর তাহার অংশ সন্তৃত পুত্র বা পৌত্রের প্রতি সেই ফল প্রদান করিয়া জগৎবাসীগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন । ঈশ্বরের এই নিয়মের গুণেই ইহকালেই পিতার কর্ম্মের ফল পুত্র ও পিতামহের কার্য্যের ফল পৌত্রে ভোগ করিয়া থাকে । সৎ বা অসৎ উভয় কার্য্যের পক্ষে পরিণাম সমান অর্থাৎ যেমন কার্য্য তেমনই ফল । লোকে এই জগুই বলে “পিতার পুণ্যে পুত্রের উন্নতি ও পিতার পাপে পুত্রের ক্ষয়” । ঈশ্বর ক্ষমতা বা অধিকার দেন, জীবে দয়া করিলে পুত্র ও পৌত্র তাহার সুখময় ফল ভোগ করিবেই করিবে, এবং জীবে হিংসা করিলে পুত্র বা পৌত্রকে তাহার দুঃখময় ফল সহ করিতেই হইবে । পরপীড়ন মহাপাপ, পূর্বেই বলা হইয়াছে । পরকালে ঈশ্বর নিজে ইহার বিচার করিবেন না । তাঁহার ক্ষমতার অতীত, অতএব ইহার তুলনায় মহাপাপ আর নাই ; কোন জ্ঞানীলোকে বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“মর খোরো মসহফ বসোজো আতশ অনার কাবাকুন
সাকেনে বুত খানাবাসী, মরহুম আজারীমকুন”

ইহার অর্থ এই যে, তুমি মদ খাও, পবিত্র কোরাণ শরিফকে আগুণে পুড়াইয়া দেও বা কাবা শরিফে অগ্নি সংযোগ কর অথবা হিন্দুর দেবালয়ে থাকিয়া মূর্তি পূজাই কর তোমার এই সমস্ত পাপ মুক্ত হইতে পারিবে কিন্তু তুমি কখন পরের অন্তঃকরণে অযথা অথবা নিজের স্বার্থের জন্য কষ্ট দিও না, কারণ সে পাপের মুক্তি নাই, এই নিমিত্ত খোদায় পাক ও রসুলে করিম বিস্তর নিষেধ আজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব এরূপ গুরুতর মহাপাপের কার্যদ্বারা আপন জীবিকা নির্বাহ করা কি অর্থ সংগ্রহ করা অথবা আপন বিষয় বৈভবের উন্নতি করা কোন অংশেই সৎ মনুষ্যের কার্য্য নহে ।

২ । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর নিরাকার, নিশ্চল অর্থাৎ সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও জ্যোতির্ময় হইতেছেন, তদনুরূপ জীবের জীবনও নিরাকার এবং তাঁহার সেই জ্যোতির্ময় পদার্থ অর্থাৎ পবিত্র নুরের অংশ হইতে গঠিত, অতএব জীব মাত্রেরই সহিত খোদায়ে পাকের পবিত্র নুরের এরূপ অপরি-লক্ষিত সংযোগ রহিয়াছে যেমন মনুষ্য দেহের মধ্যে কোন একস্থানে অতি সূক্ষ্ম কণ্টক বিদ্ধ হইবা মাত্রই সম্পূর্ণ দেহে ও প্রাণে হঠাৎ একটা কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে যায় তদনুরূপ কাহারও দ্বারা কোন জীবের জীবনে কোন প্রকার

আধার সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরে তাহার প্রতিঘাত লাগে । তিনি জগৎপিতা, জীবের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তৎসহ তিনি দয়ার সাগর বলিয়াই অনেকস্থলে এইরূপ প্রতিঘাতের যন্ত্রণা সহ করিতে থাকেন এবং তাঁহার সৃষ্টি কৌশলের নিয়মানুযায়ী যথোচিত সময়ের অপেক্ষা করিতে থাকেন, তাহাতেও ফল না হইলে অর্থাৎ অবোধ মানুষের জ্ঞান না হইলে, শেষে যখন তাঁহার অসহ হইয়া উঠে তখনই তাঁহার প্রতিফল প্রদান করেন । এইরূপ ব্যক্তির কার্যের প্রতিফল অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, এতএব এইরূপ গর্হিত কার্য হইতে বিরত থাকা জ্ঞানবান ব্যক্তির কার্য । নচেৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি হইয়া সেই ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা আর অধিকতর ও গুরুতর অন্যায় কার্য কি হইতে পারে । এই নিমিত্ত স্বার্থপর হওয়া ও পরের মনে অযথা কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় কার্য আর নাই ।

৩। ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে জীবন ধারণ জন্ত যে যে উপায় ও উপাদান প্রদান করিয়াছেন তাহা থাকা সত্ত্বে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কার্য নহে । প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের সহিত এবং আন্তরিক যত্ন দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্বাহ জন্ত সদুপায় অবলম্বন করেন । যে যেমন প্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র হউন না কেন তাঁহাকেও সেই ভাবে কার্য করা উচিত । প্রত্যেকের কর্তব্য যে আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে আপন আপন পূর্ব পুরুষ অপেক্ষা যতঃ ১০ গৌরব অর্জন করিয়া উঠুক ১০

উৎকৃষ্ট প্রকারে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করেন । সদুপায় দ্বারা ধন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্ন ও উচ্চ অভিলাষ বাল্যকাল হইতেই মনোমধ্যে রাখা প্রয়োজন ও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারা আবশ্যিক । কোন চেষ্টা না করিয়া, ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, ঈশ্বর আহার দিবেন অথবা পৈতৃক ধনসম্পত্তি আছে, চিন্তা কিসের, ইহা মনে মনে সংকল্প করিয়া জীবিকা নির্বাহের উপায় স্থির করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য নহে । একমাত্র সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতে গেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে । মানুষের চেষ্টা ও সাধের অসাধ্য কিছুই নহে । যে নিমিত্ত যে প্রকার চেষ্টা করা যাইবে তাহার তদ্রূপই ফল আমরা পাইতে পারিব, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, অতএব চেষ্টার ত্রুটি করা কাহারও কর্তব্য নহে । কোন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“যে গরদিদন মশও গাফিল কে রোজিদর কদম বাশদ
ইমি আওয়ারু মি আয়েদ জে আসিয়ঁ। সঙ্গবেরু”

ইহার অর্থ এই যে, মানুষের জীবিকা মানুষের সাধ্যাভীত নহে । যিনি যতই চেষ্টা করিবেন তিনি ততই তাঁহার জীবিকার উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন । চাক পাথর তাহার সুন্দর একটা উদাহরণ প্রদান করিতেছে, সে যখন ঘুরিতে থাকে তখনই

দাঁড়াইয়া রহিলে আর দানা বাহির হয় না । এইরূপে মানুষে যত্ন পূর্ব্বক চেফ্টা করিলে অবশ্যই তাহার ফল পাইবেই পাইবে । চেফ্টা না করিলে অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কিছুই লাভের আশা নাই । কষ্টভোগ করিতে হইবে বলিয়া পরিশ্রমে অর্থাৎ চেফ্টায় কাতর হওয়া কখনই উচিত নহে, তাহাতে কখনই উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না । কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

“কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ।

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ।”

প্রথমে দুঃখ ও কষ্ট করিয়া চেফ্টা না করিলে পরিণামে তাহার সুখ কখনই পাওয়া যাইতে পারে না । অতএব আপন জীবিকা ও উন্নতির জন্য চেফ্টা করা প্রত্যেক বক্তির কর্তব্য ।

৪ । আমার ইসলাম সমাজে এক্ষণে অনেকে এত নিশ্চেষ্ট ও অপদার্থ হইয়া উঠিয়াছেন যে পরিশ্রম ও কষ্টের দিকে আদৌ তাঁহাদের মন ধাবিত হইতেছে না । সামান্য পরিশ্রমের কার্য না করা ও বিশ্রামপ্রিয় হইয়া পরিশ্রমে অবহেলা করা অথবা নিজের কার্য নিজে না করিয়া অপরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা ও বিলাসিতা বশতঃ নিজের কোন কার্যই নিজে না দেখা বা পরীক্ষা না করা আমার স্বজাতি ভ্রাতৃগণের মধ্যে সাংঘাতিক ও সংক্রামক রোগ হইয়া উঠিয়াছে ; তাঁহারা প্রেম-বিলাসিতা ও বিশ্রাম প্রিয়তাতেই মত্ত থাকিয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, বিশেষতঃ, যাহারা আপন বংশ

মর্যাদা ও সম্মানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানী তাঁহাদেরই অবস্থা এ সম্বন্ধে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহারা আপন বৈষয়িক ব্যাপারের সংশ্রবে থাকা দূরের কথা আপন আপন সাংসারিক ও পারিবারিক কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখিবার নিমিত্ত বিলাসিতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন না । এমন অবকাশ ও পাইতেছেন না যে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিতে পারেন অর্থাৎ এমন ক্ষমতা নাই যে কোন বিষয় নিজে দেখেন বা ভাবেন তবে বাকশক্তিতে এত প্রথরতা ও বেগ প্রাপ্ত হন যে সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য । কেবলমাত্র আহার নিদ্রা আদি ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ব্যতীত জগতে আর কিছুই জানেন না । এই মহা গুণ গুলি পশুর মধ্যেও আছে, এক্ষণে আমাদের মধ্যে এই প্রকার মনুষ্যজীবকে পশু বলিলে অশ্রায় ও অত্যাধিক হয় না । ইহাও তাঁহাদের বুঝিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় না যে আপন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া উঠিতেছে কি না । পৈতৃক সম্পত্তি সমূহ হস্তান্তরিত হইয়া যাইতেছে কেন ? এখন একরূপ হইতেছে ও পরিণামে কিরূপ দশা হইবে ? এবং ইহাও ভাবিয়া দেখেন না যে কেবলমাত্র এই শৈথিল্য দোষে কতশত সম্ভ্রান্ত পরিবার একেবারেই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, অতএব আমিও কেন সেই পথ অবলম্বন করি । এক্ষণে ইহা আমাদের ও আমাদের পরপুরুষগণের পরীক্ষার ও বিবেচনার সময় হইয়া উঠিয়াছে । যাহা আমাদের পক্ষে উত্তম ও উপকারী তদনুসারেই

অনিষ্ট ও অমঙ্গল ঘটিতেছে তাহা ত্যাগ করি ; নচেৎ এই বিলাসিতা ও আলস্য জনিত কারণে আরও যে আমাদের এই সমাজে কি দুর্দশা হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না । এখনই কাহারও ঘরে এক প্রকার পৈত্রিক সম্পত্তি নাই বলিলেই হয় । যখন এই সমাজে সকলে এক সময়ে পরিশ্রমী ও যত্নশীল ছিলেন তখন তাঁহারা আপন বুদ্ধি, বিবেচনা ও ক্ষমতা বলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে আমাদের মধ্যে সেই ক্ষমতার স্থলে—আলস্য এবং বুদ্ধি ও বিবেচনার স্থলে—আহার ও নিদ্রা আদি আসিয়া আমাদের পরাস্ত করিয়া দেওয়ায় আমরা সকলে নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়া পূর্বপুরুষের পূর্ব সঞ্চিত সম্পত্তি সমূহ একেবারেই নষ্ট করিয়া দিয়া উদর, ইন্দ্রিয় ও আলস্যতার দাসত্বে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি এবং পড়িতেছি । এ বন্ধন হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না, কেবল মাত্র আমাদের নিজের সামান্য উদ্যম, বুদ্ধি ও বিবেচনার আবশ্যক । ইহাও যদি আমরা না করি আর বাদসাহী হইতে ফকিরী অবস্থায় পরিণত হইয়া তাহাতেই পড়িয়া থাকিতে ভালবাসি তবে আমাদের অপেক্ষা অধম ও নিকৃষ্ট আর এ জগতে দ্বিতীয় নাই ভাবিয়া লইতে হইবে । এক্ষণে এই বিলাসিতা ও অলসতা ত্যাগ করা এবং আপন আপন ব্যয় সংক্ষেপ করাই আমাদের প্রধান ও অবশ্য কর্তব্য । যিনি ইহার সহিত বন্ধুতা করিবেন তিনিই আরও দুঃখী হইবেন, যিনি ইহাদিগের সহিত শত্রুতা

প্রাপ্ত হইবেন । সামান্য বিবেচনা করিয়া দেশস্থ ও প্রতিবাসী অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত তুলনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা কি কারণে উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন ও উঠিয়াছেন এবং আমরা তৎসহ অবনত হইয়া যাইতেছি । যিনি যত কার্যে লিপ্ত থাকিয়া নানা চেষ্টায় নিমগ্ন থাকিবেন অর্থাৎ শরীর ও মনকে খাটাইবেন তিনি তত পরিমাণে আধিক সুখী হইতে পারিবেন । সুসভ্য ইংরাজ জাতি ও ব্যবসায়ী বণিকগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিতেছেন এবং আমাদের প্রতিবাসী চতুর হিন্দু ভায়াগণ চেষ্টার বলে উন্নতির পথে কত দূরই না অগ্রসর হইয়াছেন ও হইতেছেন ; এবং আমার সভ্যতাভিমानी মুসলমান ভ্রাতৃগণ আপন আপন অভিমানে মগ্ন থাকিয়া শরীর ও মনকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলায় কেবল মাত্র বাকশক্তি বিশিষ্ট মোমের পুতুলের ন্যায় দীর্ঘাকার একপ্রকার পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ; সামান্য উত্তাপ লাগিলেই যেমন মোম গলিয়া যায় তেমনই সামান্য কষ্ট ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িতেছেন । অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত বিষয় ও বৈভব সমূহ হারাইয়াছেন ও হারাইতেছেন এবং অশেষ প্রকারে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন ও হইতেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত প্রত্যেক সহরে, নগরে এমনকি পল্লিতেও আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে । লোকে বলে “শরীরের নাম মহাশয় যা সহাইবে তাই সয়” কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ এক দিনের জন্তও আপন আপন

এখন পরাধীন, এই পরাধীনতায় অনেকেই আছেন, তাহাদের মধ্যে আবার যদি কাহাকেও অপর কাহারও অধীন হইতে হয় তবে অধমের অধম হইয়া থাকা অথবা না থাকা উভয়ই সমান ; অতএব অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব উন্নতির দিকে যাহাতে অগ্রসর হইতে পারা যায় ও অধমের অধম হইতে না হয় তদ্রূপ কার্য্য করা আমাদের প্রধান ও অবশ্য কার্য্য ; প্রমাণ স্বরূপ কোন এক স্থানের এই প্রকারের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে আমাদের দুর্দশা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এই পুস্তকের শেষ ভাগে দেওয়া গেল ।

৫। সৎ, অসৎ, দুর্গাম ও সুনাম এই চারিপ্রকারে জীবিকা হইতে পারে, ইহার ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন । যে কার্য্যে সাধারণের নিকট আদর ও সম্মান পাওয়া না যাইবে, জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে, যাহাতে নীচ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে তদ্রূপ কোন কার্য্যে আয় বা উপায় বেশী হইলে বা থাকিলেও সেই কার্য্য করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে । যে কার্য্যে পূর্বপুরুষের ও বংশের মর্যাদা রক্ষা হইবে বা বৃদ্ধি পাইবে তদ্রূপ কার্য্য করাই কর্তব্য ; অথবা যে কার্য্যে সাধারণের ও বিশেষের নিকট আদর ও সম্মান পাওয়া যাইবে যদিও তাহাতে আয় বা উপায় বেশী না থাকে তত্রাচ অভাব পক্ষে তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে । এক্ষণে চাকরি করা আমাদের দেশবাসিগণের মজ্জাগত উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে । যে যত বিদ্যা অধ্যয়ন করুন না কেন চাকরি করিতেই হইবে ইহাই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

লওয়া কর্তব্য । যে যত সম্ভ্রতিপন্ন ব্যক্তির পুত্র হউন না কেন, পিতার ব্যবসায় বাণিজ্য থাকে অথবা আর্থিক সম্বল বশতঃ কিম্বা মনের স্বাধীনতা হেতু ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে একাগ্রতা থাকে তবে তাহাই করা কর্তব্য নচেৎ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির পুত্র হইলেও তাঁহার চাকরি করা উচিত । যাহাতে উৎকৃষ্ট পদ বা চাকরি লাভ করিতে পারা যায় তদ্রূপ ভাব মনোমধ্যে রাখা আবশ্যিক । অপরে উচ্চপদ লাভ করিতে পারিল অতএব আমিও যাহাতে তদ্রূপ উচ্চপদ এমনকি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদলাভ করিতে পারি তাহার ঈর্ষা মনোমধ্যে রাখা এবং আপন সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য । চাকরি বা জীবিকার জন্য আপন দেশ ও জন্মস্থানের মমতা ত্যাগ না করিয়া অথবা আত্মীয় স্বজনের মায়া পাশে আবদ্ধ থাকিয়া দেশেই পড়িয়া থাকিলে কিম্বা অল্পেই সম্ভ্রষ্ট হইলে কোন ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে পারা সম্ভব নহে । বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য দূর দেশে যাইবার জন্য যেমন আমার পাক পয়গম্বরের আদেশ আছে তেমনই চাকরি বা জীবিকার জন্য বিদেশে বা দূরদেশে যাওয়াও স্মরণ । খুদ রসুলে খোদা দঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে অর্থাৎ ধর্মপ্রচার কার্যে লিপ্ত হইবার পূর্বে বিবি খোদায়জার অধীনতা স্বীকার করিয়া অর্থাৎ চাকরি করিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে দূরদেশে গিয়া আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন । *

* জনাব রসুলে খোদা দঃ গৃহ হইতে বাহিরে গেলেই সূর্য্যের উত্তাপ তাঁহার শরীরে লাগিত না, মেঘে তাঁহাকে সতত ছায়া দান করিত, বাণিজ্যকালে গ্রাম দেশে এক ইহুদি এই বিষয় অবলোকন করিয়াই সর্বপ্রথমে তাঁহাকে ভাবি পয়গম্বর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল, তাঁহার অনুসঙ্গিগণ তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের একরূপ অনুগ্রহ

চাকরি করিতে হইলে ভাল, মন্দ, সম্মান ও অসম্মানের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া চাকরি করা কর্তব্য । এই চাকরির জন্য যতদূর যাইতে হউক না কেন, তথায় গিয়া চাকরি করা আবশ্যিক । নিজের দেশে মাননীয় চাকরির অভাবে অসম্মানের চাকরি করা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, বরং বিদেশে যেখানে কেহ জানে না বা চিনে না, তথায় গিয়া সম্মানের চাকরির অভাবে একসময়ে অন্য কোন চাকরি করিলে করিতে পারা যায় কিন্তু তাহাও ভদ্রবংশজাত সন্তানের পক্ষে কর্তব্য নহে, তবে চাকরি যেমনই হউক না কেন, ব্যবসায়, বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

৬ ! চাকরি করিতে গেলেই অধীনতা হয়, অধীনতা হইতে উচ্চ ও নিম্ন অথবা বড় ও ছোট এমন কি মুনিব ও চাকরের সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে, যেখানে যে বিভাগে চাকরি করিতে হউক না কেন, অথবা যে বেতনের চাকরি করা যাক না কেন, আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারী যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই প্রকারেই আপন চাকরি নির্ব্বাহ করা কর্তব্য ; যাহাতে আপন কর্তব্য কার্য্যে অবহেলা বা ত্রুটি না হয় ও যাহাতে আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর বিশ্বাস জন্মে এবং নিম্ন কর্ম্মচারীগণ ভক্তি করেন তদনুরূপে চাকরি করাই চাকরির সুখ । আপন কর্তব্য কার্য্য

হইতেছে কিনা কেহ লক্ষ্য করে নাই, ইহাদি এই বিষয় প্রকাশ করিবার পর তাহার। দেখিতে পার এবং দেশে আসিয়া তাঁহার এইরূপ অলৌকিকতার পরিচয় প্রকাশ করে । এই প্রকার অসাধারণ গুণে ও বাণিজ্যকালে তাঁহার সত্য নিষ্ঠার পরিচয়ে এবং ধর্ম্ম ভীরুতার কার্য্যে বিবি খোদায়জা তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি তৎকালে বিধবা থাকায় তাঁহাকে আপন পতিতে বরণ করেন ।

নির্বাহ করিতে গিয়া যদি কোন সময়ে আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিয়া সেই কার্য্য বাহাতে শীঘ্র ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় তাহাই করা বুদ্ধিমানের কার্য্য । আর পারা যায় না, এ বেলা নহে অন্য বেলা, অতঃ নহে কল্য করিব বলিয়া কার্য্যে অবহেলা করিলে তাঁহার কার্য্যে কেহ কখন সম্মুখ হইবে না এবং ঈশ্বরের নিকট হইতেও তিনি কখন শুভফল লাভের আশা করিতে পারিবেন না । যিনি নিজেই আপন কর্তব্য জ্ঞানকে ফাঁকি দিবেন ঈশ্বরও তাঁহাকে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিবেন । চাকরি করিতে গিয়া অনেকেই আপন আপন কর্তব্য জ্ঞানের সহিত হিতাহিত জ্ঞানকেও হারাইয়া দেন এবং উৎকোচ আদি গ্রহণ ও অপরাপর অসৎপথ অবলম্বন করিয়া অনেকের সুখ ও সচ্ছন্দতা হরণ করিয়া আপন মঙ্গলের স্থলে অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন । এইরূপে অর্থলোলুপ হইয়া গিয়া অনেকে অনেক সময়ে সত্যের স্থলে মিথ্যা ও মিথ্যার স্থলে সত্য ব্যবহার করিয়া নিজ দেহ, মন ও প্রাণকে অপবিত্র করিয়া বসেন । এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে কুপ্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহাদের দ্বারা অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণের অশেষ অমঙ্গল সংঘটিত হয় । এই প্রকার অসৎ কার্য্যের উদ্দেশ্যই হইতেছে অর্থ গ্রহণ । এই প্রকার অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি এটা বুঝেন না, এমন কি ক্ষণকালের জন্য মনেও স্থান দেন না যে, এইরূপ স্বার্থ ও অর্থের পরিণাম ফল কি । ইহার শত সহস্র জ্বলন্ত দফ্টান্ত যদিও তাঁহাদের চক্ষুর উপর পড়িতেছে ও

একপ্রকারে বশীভূত করিয়া রাখে যে, তাঁহারা দৃষ্টান্ত সমূহকেও ভাবিয়া ও ভাবেন না । এই প্রকার অর্থাৎ উপায়ের অর্থ অনর্থ বিশেষ । ইহার পরিণামফল অতিশয় মন্দ ও শোচনীয় । যদিও একসময়ে কাহারও অনায়াস ও অধর্মের দ্বারা সঞ্চিত সম্পত্তির বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার স্থিতি কেহই দেখিতে পায় না, এমন কোন না কোন একটী কারণ হইয়া পড়ে যে, অতি সামান্য ও অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার বিনাশ হইয়া পড়ে, এমন কি বংশে এমন কেহ থাকে না যে তাহার অর্থের সুখভোগ করে । এমন কি অনেকে আপন জীবদ্দশাতেই আপন অসৎ কার্যের প্রতিফল ভোগ করিয়া লন ; অথবা কাহারও ২।১ পুরুষ পর্য্যন্ত গিয়া তাহার ফল দর্শিয়া থাকে । ইহাও জগৎপাতা জগদীশ্বরের কার্য্য, তিনি এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ-বাসী অপরাপর ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং নিজের ক্ষমতা ও সুবিচারের পরিচয় প্রকাশ করেন ; যাহাতে লোকে অপরের অসৎ কার্যের প্রতিফল দেখিয়া সতর্ক ও সাবধান হইয়া পড়ে এবং আপন আপন ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্য্য করে । ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য : তিনি মনুষ্যমাত্রকেই বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়াছেন, তদনুসারে ভাল ও মন্দ বুঝিয়া কার্য্য করা আমাদের কর্তব্য, আমরা তাহা না বুঝিয়া নানা প্রকারে অপরের প্রতি অনায়াস, অত্যাচার, অসদ্যবহার ও অধর্ম করিতে গেলে কেন না তিনি আমাদের প্রতি এইরূপ কঠোর ব্যবহার করিবেন, ইহাই তাঁহার কর্তব্য কার্য্য, কারণ সৃষ্টিরক্ষাই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য । যখন যে বিভাগে যে কোন প্রকার চাকরি বা

ক্ষমতা কি অধিকার হউক না কেন, এই সংসারক্ষেত্রে যাহাতে নিজ কর্মের দোষ না ঘটে, ইমান অর্থাৎ ধর্মকে বজায় রাখিয়া, সত্বপাত্তের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া, অসৎ উপায়ের ধারণা মনে স্থান না দিয়া, পর ধনে লোভ না করিয়া, কাহারও অনিচ্ছা সত্ত্বে কিছু গ্রহণ না করিয়া, অথবা কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিয়া কিছু না লইলেই ইহকালে সর্বসাধারণের নিকট অপ্ৰিয়, নিন্দনীয় এমন কি ঘৃণাই হইতে হয় না (যাহার দ্বারা লোকের মুখ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের ও পরপুরুষগণের যেমন কোন প্রকার অনিষ্ট বা অমঙ্গল না ঘটে, সতত এই আশঙ্কা ও চিন্তা মনোমধ্যে রাখিয়া, আপন আপন ক্ষমতা ও অধিকারের পর্যালোচনা করা সৎ ব্যক্তির কার্য্য । কোন প্রকারে ধন, সম্পত্তি বা অর্থ এমন কি ক্ষমতা বা অধিকার হইলেই তাহাতে মত্ত হইয়া অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা, অন্যায়, অত্যাচার ও পরপীড়ন মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে । ক্ষমতা বা অধিকার হইলে, যাহাতে সেই ক্ষমতা বা অধিকারের অপব্যয় না হয় ও অপরে সেই ক্ষমতা বলে সুখী হয় এবং যে কোন প্রকারে হউক না কেন, অন্য লোকে যাহাতে উপকার পায়, তাহাই মনুষ্য জীবনের সুখ ও প্রধান কর্তব্য কার্য্য । কখন কোন কার্য্যে কাহাকেও সুখী করিবার সুযোগ না হইলেও, বাক্যের দ্বারাও কাহারও সহিত কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করা কোন সৎ ব্যক্তির কার্য্য নহে । অধিকারকালে মানুষে সন্তুষ্ট ও সুখী হইলে, তাঁহার ধন ও সম্পত্তি আদির উন্নতি ও স্থিতির জন্ম

সকলে সতত ঈশ্বর সমীপে কামনা করিবে, কিন্তু অসন্তুষ্ট ও
দুঃখিত হইলে সতত অমঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবে, ইহাই
মনুষ্যের প্রকৃতি, এই নিমিত্তই ঈশ্বর ক্ষমতাশালী দুষ্ক ব্যক্তি-
গণের পরিণামফলের বিচার ও বিধান করিয়া ইহকালেই সেই
প্রার্থনাকারী ও জগৎবাসীগণকে দেখাইয়া দেন । চাকরি বা
ক্ষমতার স্থলে যে কোন প্রকার অধিকার হউক না কেন
ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি থাকিলে অন্ত্যায় স্বার্থ, মিথ্যা লোভ,
অহঙ্কার ও পরপীড়নের কার্য্য হইতে অবশ্যই বিরত থাকিতে
পারা যাইবে । সেইহেতু আপন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল
এবং পরপুরুষগণেরও মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে ।
চাকরির কালে এই প্রকার ব্যবহারে উপরিস্থ কর্ম্মচারীগণও
কার্য্যদক্ষতা, শ্রায়নিষ্ঠতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা গুণে সন্তুষ্ট না
হইয়া থাকিতে পারিবেন না । ভাগ্য দোষে এইরূপ গুণবিশিষ্ট
কোন ব্যক্তির পদোন্নতি না হইলেও তাঁহার পরকালের
সুখের যে আশা, তাহা কখনই ইহকালের ক্ষণস্থায়ী সুখের
সহিত তুলনা হইতে পারে না । ক্ষণস্থায়ী সুখে উন্মত্ত
ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমতা কখনই চিরকাল থাকিবার নহে,
এটাও তাঁহাদের ভাবা উচিত, কিন্তু ইহা অধিকস্থলে কাঁহারও
মনে পড়ে না, তজ্জন্ম ঘরে, দালানে ও বৈঠকে উজ্জ্বল অক্ষরে
ইহা লিখিয়া রাখা কর্তব্য, যেন সতত তাহাতে নজর পড়ে ।

উদ্দ ।

“আরসা দিন নহিরহেগা”

ইহার অর্থ এই যে, এরূপ দিন সতত থাকিবার নহে ।

৭। জীবিকা নির্বাহ জন্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়, ইহা সর্বশাস্ত্রে বলে ও বিজ্ঞ মহাজনগণ ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম ইহার লাভাংশ হলাল বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে। পবিত্র কোরাণ শরিফে আছে :—

আরবি।

“অহল লল লাহল বয়আ ও হররমর রেবা”

ইহার অর্থ এই যে, তেজারত হলাল হইতেছে ও হুদ হরাম। রসূলে খোদা দঃ ও এক সময়ে বাণিজ্য করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে—

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্কিং কৃষিকর্মণি

স্তদর্কিং রাজ্য সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ”

ইহার অর্থ এই যে, বাণিজ্যের কার্যে লক্ষ্মী পূর্ণ কৃপা বিতরণ করেন, তাহার অর্দ্ধেক কৃষিকার্যে ও তাহার অর্দ্ধেক চাকরিতে, কিন্তু ভিক্ষায় কিছুই হয় না। এক্ষণে ব্যবসায় ও বাণিজ্য সর্বপ্রধান, তবে বিশ্বাস ও সত্যবাদিত্ব, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সর্বপ্রধান অঙ্গ। সত্যবাদী হইলে বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইবে। সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হইলে, তাঁহার মানসিক বল এত অধিক হইবে যে, তিনি কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন না, অবশ্যই তাঁকে পরিশ্রমী হইতে হইবে। পরিশ্রম সহকারে অর্থ উপার্জন করিলে অবশ্যই তিনি মিতব্যয়ী হইবেন। সত্যবাদী, বিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হইলে

ব্যবসায়ের পক্ষে আর কিছুই চিন্তা করিতে হয় না। ইহাই ব্যবসায়ী ও বণিকগণের অলঙ্কার। এই চতুর্বিধ গুণ বিশিষ্ট কোন ব্যবসায়ী বা বণিকের নিজ মূলধন তত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া না উঠিলেও অন্যান্য ব্যবসায়ী ও বণিকগণ এই প্রকার ব্যক্তিকে ভক্তি সহকারে ও অশেষরূপে তাঁহাকে এমন সাহায্য করিবেন যে, তদ্বারা তিনি অতি শীঘ্রই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া অল্পকাল মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। যে ব্যবসায়ীর এই সব মহৎ গুণ না থাকে, তিনি কখনই অপরাপর ব্যবসায়ী ও বণিকগণের নিকট সহানুভূতি পাইতে পারেন না। একবারের নিমিত্ত কাহারও কোন প্রকার অবিশ্বাস হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না এবং তিনি কোন না কোন প্রকারে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেও তাহা কখনই স্থায়ী রূপে রাখিতে পারিবেন না, ঈশ্বরও তাহা কখনই স্থায়ী হইতে দিবেন না। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সত্যবাদিত্ব ও বিশ্বাস আদি গুণ থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনই স্বৎসভাব ও নিরহঙ্কার হওয়াও অত্যন্ত আবশ্যিক, নচেৎ তাঁহার উন্নতির আশা খুব কম। এই সব কারণে চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্যবসায়ে আর্থিক ও মানসিক বল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত অধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতাই শ্রেয়ঃ। আজকাল কাহারও কোন এক প্রকারে বা উপায়ে জীবিকা নির্বাহের উপলক্ষ থাকিলেও অন্য কোন না কোন প্রকারের পন্থা অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ এক্ষণে এত ব্যাধিক্য হইয়া উঠিয়াছে যে, কিছু সংস্থান

করা দূরের কথা, সুখ ও সচ্ছন্দতায় কালযাপন করা বড়ই কঠিন ; এই নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থ এমন কি রাজা, জমীদার, হইলেও তাঁহাকে আপন আয় বৃদ্ধি জন্য অন্য যে কোন প্রকারের হয় উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য । তজ্জন্য প্রত্যেকের ব্যবসায়, বাণিজ্য, বা তেজারতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।

এক্ষণে গৃহস্থের কষ্টের কথা বর্ণনা করি, তদ্ব্যতীত জমীদারের জমীদারীতেও সুখ নাই, সামান্য কৃষকগণের কষ্টের সীমা নাই । কৃষকগণের কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, তাহাদেরও নানা প্রকার ব্যাধিক্য বশতঃ তাহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্যজ্ঞানহীন হইয়া উঠিয়াছে । এই প্রকার ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, যেন জমীদারের খাজনা আর দিতে না হয় । বিচার আদালতেও এত প্রকার খরচ বাড়িয়াছে যে, অতি অল্পপরিমাণ টাকা আদায় করিতে হইলে অধিক টাকা ব্যয় করিলেও কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারা যায় না । এইরূপে জমীদারের খাজনা অনাদায় প্রযুক্ত ও সাংসারিক ব্যাধিক্য বশতঃ এবং জমীদারীর খাজনা ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকায়, জমীদার ও প্রজা উভয়ে বিশেষতঃ অধিক সংখ্যক জমীদার দেনাদার হইয়া গিয়া আপন আপন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হারাইয়া বসিতেছেন । এইরূপে যে গৃহস্থের অন্য কোন প্রকারের উপায় নাই, সেও কোন প্রকারে আপন একটা মাত্র উপায় দ্বারা সুখী হইতে পারিতেছে না । এক অপেক্ষা অধিক প্রকারের উপায়শূন্য না থাকিলে কোন গৃহস্থ কখনই সুখী হইতে পারিবেন না ।

কোন জমীদারের কোন ব্যবসায় বা বাণিজ্য অথবা অন্য যে কোন প্রকারের ইউক না কেন, কোন উপায়স্থল থাকিলে তিনি আপন জমীদারী উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন ও সুখী হইতে পারিবেন । এই নিমিত্ত এক্ষণে যাহার যে প্রকারে জীবিকা নির্বাহের উপায় থাকে তদ্ব্যতীত অন্য যত প্রকার সদুপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় তাহা প্রত্যেক কর্মচারী, গৃহস্থ, জমীদার এমন কি রাজারও কর্তব্য, নচেৎ তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না, অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন না ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না । যিনি বুদ্ধি চালনা না করিবেন, যিনি আলস্য করিবেন ক্রমে তিনিই অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইবেন ।

৮ । এক্ষণে কৃষিকার্য্য জীবিকা নির্বাহের অন্য নিকৃষ্ট উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । বিদ্যা আলোচনার আধিক্য প্রযুক্ত কৃষক সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই অল্পশিক্ষিত হইয়াই আপন আপন পূর্ব পুরুষগণের সৎজীবিকার প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা এমনকি ঘৃণা করিয়া তাহা এক প্রকার ত্যাগ করিতেছেন । সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় বিস্তর অশিক্ষিত কৃষকও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িতেছেন । এই প্রকারে কৃষিকার্য্যের প্রতি কৃষকগণের অমনোযোগিতা প্রযুক্ত ও ঈশ্বরের নিগ্রহতা হেতু আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যের বিস্তর অবনতি দেখা যাইতেছে, অনেকে আবার অর্থোপার্জনোপলক্ষে আহারোপযোগী শস্তের চাষ না করিয়া পাট ও সনের

সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাহাই আমাদের দেশের দারিদ্রতার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে । পুরাকালে মহাজনগণ বাণিজ্যকে শ্রেষ্ঠ, তৎপরে কৃষি ও তৎপরে চাকরিকে 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ হইবার কারণ এই যে, ইহা স্বাধীনবৃত্তি । ইহা অপেক্ষা মনের স্বাধীনতা আর কিছুতেই হইতে পারে না । যেখানে মনের স্বাধীনতা আছে সেই খানেই সুখ আছে, তবে বাণিজ্য লাভ ও লোকসানের আশা ও আশঙ্কা আছে মাত্র, এই নিমিত্ত কিছু চিন্তা ; কিন্তু যে ব্যবসায়ী আপন মানসিক প্রবৃত্তিকে সবল করিতে পারিয়াছেন, তিনি সামান্য লাভ ও লোকসানের জন্য চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দেন না । মহাজনগণ যে চাকরিকে নিকৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ, যিনি চাকরি করিয়াছেন বা করিতেছেন তিনিই বুঝিয়াছেন । যেমনই চাকরি হটুকনা কেন, চাকরির কাল মধ্যে তাঁহার মানসিক সুখ থাকে কিনা সন্দেহ । যেমন কর্মচারী হউন না কেন, স্বাধীনভাবে কর্তব্য জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে আপন মানসিক প্রবৃত্তি সঞ্চালনের ক্ষমতা তিনি আদৌ রাখিতে পারেন না । অধীনতার দায়িত্ব হেতু আপন জ্ঞান ও বিবেকের বিপরীত কার্য অনেকেরই করিয়া থাকেন । আপন চাকরির দায়িত্ব জন্য সতত ভীত ও চিন্তিত থাকিতে হয় এবং চাকরির চিন্তায় কালান্তিপাত করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক দুর্বলতা ও অল্পকাল মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা আসিয়া

জীর্ণ হইয়া পড়ে ; এই নিমিত্ত অতি শীঘ্রই আয়ুঃক্লয় হইয়া যায় । কর্মচারী মাত্রেই আপন চাকরি ও মুনিব অর্থাৎ উপরিস্থ কর্মচারীগণকে এত অধিক ভয় করেন যে, তাহার কোন অংশই স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ও আপন বিধাতাপুরুষ জগদীশ্বরকেও করেন না ; এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণদ্বারা অধীনতার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টরূপে বাচ্য হইয়াছে । এই অধীনতাকে উপলক্ষ্য করিয়া মওলানা সাদি বলিয়া গিয়াছেন :—

পাশী ।

“গর উজীর অজ্ঞ খোদা বতরসিদে
হম চনা কজ মদিক মলক বুদে”

ইহার অর্থ এই যে, উজীর অর্থে তাবেদার অর্থাৎ অধীন ব্যক্তিগণ আপন আপন পাদশা অর্থাৎ মুনিবকে যে পরিমাণে ভয় করেন তদ্রূপ ভয় ঈশ্বরকে করিলে তিনি একজন ফেরেস্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের দূতরূপে সাধুপুরুষ হইতে পারেন । চাকরির সুখ অবসরান্তে ; যিনি চাকরি করিয়া সছুপায় দ্বারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন অথবা যিনি কিছু পেনশন পাইয়াছেন তিনিই কিছু পরিমাণে সুখী হইতে পারেন । যাঁহাদের কিছু সংস্থান না থাকে অথবা পেনশন পাইতে না পারেন তাঁহাদের অন্য কোন উপায় না থাকিলে কষ্টের সীমা থাকে না । কর্মচারী মাত্রেই পেনশন পাইলেই কি না পাইলে অথবা সংস্থান থাকিলে কি না থাকিলেও দীর্ঘকাল দায়িত্ব-হেতু আপন চাকরির চিন্তায় আয়ুঃক্লয় হইয়া যাওয়ায় চাকরি

হইতে অবসর লইলেই আর বেশিদিন বাঁচিতে পারেন না । তাহার আরও এক কারণ এই যে, চাকরির কালে নিয়মিত সময়ের আহাৰ, পরিমিত পরিশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু অবসরের পর প্রায় অনেকের আর তদ্রূপ হইতে পারে না । অনেকেই চাকরির সময়ে আপন ভবিষ্যতের বিষয় কিছু চিন্তা না করিয়া, ঘেরূপে হউক না কেন, চৰ্খা ও চোষা আদির দ্বারা কাল কাটাইতে থাকেন, অবসরের পর আর তদ্রূপ জুটিয়া উঠে না, হঠাৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটয়া পড়িলেই শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্যও অনেকেই অবসরের পরে শীঘ্রই কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া যান । এই চাকরি করা এক্ষণে যখন প্রত্যেকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন আপন আপন ভবিষ্যতে অর্থাৎ চাকরির অবসরান্তে যে প্রকারে কালান্তিপাত করিতে পারা যাইবে, সেই ভাবেই চাকরির সময়ে কাল-কাটাইতে থাকা কর্তব্য । বাণিজ্য যদিও সর্বপ্রধান উপায়, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণ বশতঃ বাণিজ্য আর লাভ নাই । লাভ না থাকায় ততদূর সুখও আর নাই । চাকরিতে বাহ্যিক সুখ আছে, এই জন্য চাকরি এক্ষণে প্রধান জীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাণিজ্য মধ্যম ও কৃষি সর্ব নিরুষ্ক হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু বিবেচনার চক্ষে দেখিতে, গেলে রাজ্য, ধন, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও চাকরি আদি যাবতীয় বিষয় কেবল মাত্র কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতেছে । ঈশ্বরের নিগ্রহ প্রযুক্ত

আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন না হইলে পৃথিবীর কোন বিষয়ই কোন কাজে আসে না । আহারীয় দ্রব্যের অভাবে কত লোকে অকালে ও অল্প সময়ের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়া যায়, কেহই কি কোন প্রকারে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন ? কেবল কৃষিজাতদ্রব্যের উপর জীবনের আশা ও ভরসা । ইহার উপায়ে কোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও অধর্মের লেশ মাত্র নাই, কেবল মাত্র কায়িক পরিশ্রম ও ঈশ্বরের দয়ার উপরেই নির্ভর করিতে হয় । ঈশ্বরের দয়া হইলে এক সময়েই প্রচুর পরিমাণে ফসল লাভ করিতে পারা যায় । কোন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন,—

বাঙ্গালা !

“কি করে মুদ্রায় যদি না থাকে আহার,
আহার অভাবে যায় প্রাণ অভাগার
রবির কিরণে যথা অরণ্য শুধায়
সেইরূপ খাদ্যাভাবে জীবন হারায়”

৯। চাষের কার্য্যে সম্বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প পরিমাণে খরচ ও পরিশ্রম করিতে হয় । যথোচিত সময়েই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ও ঈশ্বরকৃপায় ফসল হইলে এক সময়েই ফসল পাওয়া যায়, ইহাই চাষের সুখ । যিনি আপন চাষের কার্য্যে স্বয়ং পরিশ্রম করিতে পারেন তাহারই সুখ ও লাভ বেশী । যিনি স্বয়ং খাটিতে পারেন না অথবা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া খাটাইতে পারেন তাঁহারও কিছু লাভ থাকে,

কিন্তু যিনি স্বয়ং খাটিতে পারেন না অথবা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিজের কার্য্য নিজে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া খাটাইতেও পারেন না, কেবল পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহার কোন অংশেই লাভ বা সুখ নাই । কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়াছেন,—

হিন্দি ।

“থটে খটাওয়ে সমান পাওয়ে

কান্ধেমে ছাতাদে আধা পাওয়ে

ঘর বয়ঠে পুছে যো বাত

একবার যো হো সো হো দুসরেবার কোঁহবাত”

এই দুর্গতি কেবল চাষের কার্য্যেই কেন, সব কার্য্যেই ফলিয়া থাকে । যিনি নিজের কার্য্য নিজে না করেন, অথবা নিজেই পরীক্ষা না করেন কেবল পরের উপরেই নির্ভর করেন, তাঁহার শ্রায় হতভাগ্য ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহাকে যে অচিরে সর্ব্বস্বান্ত হইতে না হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই । এই রোগে আমার কতশত মুসলমানভায়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন । চাষের কার্য্যসম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তিগণের যে বচন আছে তদনুসারে কার্য্য করা ও সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করা প্রত্যেক কৃষকের কর্তব্য, তবে তাহা ঈশ্বর সুনিয়মে পালন করিলেই সৌভাগ্য,—

হিন্দি ।

“কর্কট ছরকট সিং সোকানা কন্যা কানেকান

বিনা বাওয়ে তুলা বয়থে কাঁহা বখোগে ধান”

ইহার অর্থ এই যে কর্কট অর্থাৎ শ্রাবণমাসে বুড়ির দ্বারা ছরকট

অর্থাৎ কাদা হওয়া চাই । সিং অর্থাৎ ভাদ্রমাসে ধানের ক্ষেত্র শুষ্ক হওয়া আবশ্যিক । কন্যা অর্থাৎ আশ্বিনমাসে ধানগাছের কান পর্য্যন্ত জল থাকা উচিত । তুলা অর্থাৎ কার্তিক মাসে বিনা বাতাসে বৃষ্টি হইলে ধান রাখিবার স্থান হইবে না অর্থাৎ প্রচুরপরিমাণে ধান উৎপন্ন হইবে ।

১০ । লোকে যেমন আপন ধনসম্পত্তি অন্তরালে ও গোপনে লুকাইয়া রাখে, তেমনই আপন কৃষিজাত দ্রব্যগুলিও নিজের চক্ষে দেখিয়া এবং তাহার হিসাব রাখিয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে আপন নজরের সম্মুখে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিতে হইবে । খামার, হামার বা বাখারঘর সম্মুখান স্থানে হওয়াই উচিত । তাহাতে সব সময়ে নজর পড়ে ও রীতিমত লক্ষ্য থাকে এবং যাহাতে একটীমাত্র শস্য অপব্যয় বা নষ্ট না হয়, তদ্রূপে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক । অতি অল্প মূল্যের সামান্য দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য ও যত্ন করিবার অভ্যাস হইলে বিশেষ দ্রব্যের প্রতি যত্ন করিবার অভ্যাস হইবেই হইবে, নচেৎ এই যত্নের অভ্যাসের অভাবে মূল্যবান সামগ্রীসমূহ ও শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে । এই ধান সম্বন্ধে সাধারণে বলে,—

হিন্দী ।

“গরু, জরু, ধান এই তিনকা নজর পর গুজরাণ”

ইহার ভাবার্থ এই যে, ইহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক, কৃষিজাত দ্রব্য অথবা যে কোন দ্রব্য হউক না কেন,

নিজের চক্ষে দেখিয়া এবং তাহার হিসাব রাখিয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে আপন নজরের সম্মুখে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিতে হইবে ।

আবশ্যক মত খরচ করা কর্তব্য । কোন বিষয়েই বেহিসাবী ও অপব্যয়ী হওয়া উচিত নহে । যাহা আয় হয় ও যাহা খরচ করা যায় তাহার হিসাবের কাগজ বা খাতা দস্তুর মত রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । যে ব্যক্তির ঘরে আয় ও ব্যয়ের হিসাবের রীতিমত কাগজ নাই তিনি কখনই ধনসম্পত্তি আদি কিছুই সঞ্চয় করিতে ও রক্ষা করিতে পারিবেন না । আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী কি কম হইল, তাহা সময় অন্তরে বুঝিতে হইলে আর কোন উপায় থাকে না । হিসাবের জন্য রীতিমত কাগজ রাখিলে যাহাতে খরচ কম হয় ও অপব্যয় না হয় ইহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে । সময়ে সময়ে খরচের তুলনায় বেশী কি কম খরচ হইল, এমন কি পূর্বের তাহাতে কত খরচ হইয়াছিল এক্ষণে তাহাতে কত খরচ পড়িয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, ও তদ্বারা ব্যয় সংক্ষেপ করিবার বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে পারা যাইবে ; এই নিমিত্ত খরচের হিসাব রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । যিনি এইরূপে হিসাবী কাগজ রাখিতে পারেন বা রাখেন তিনিই যে প্রকৃত গৃহস্থ এবং সাংসারিক ব্যক্তি ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । এইরূপ হিসাব রাখাতে কিছুই কষ্ট নাই, কেবল অবহেলা মাত্র, দিবা রাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন এক সময়ে অবকাশ কালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দৈনিক আয় ও ব্যয় সহজেই লিখিয়া রাখিতে পারা যায় । আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে

আয় করিলাম, ও নিজের ব্যয় করিলাম ইহার আবার হিসাব রাখিবার আবশ্যক কি ! ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম ও দোষ । এক সময়ে নিজের কার্য সম্বন্ধে কোন আন্দোলন বা আলোচনা করিতে হইলে বা কোন বিষয়ে তুলনা করিতে হইলে তৎকালে কে তাঁহাকে তাঁহার হিসাব বুঝাইবে ? স্মরণ থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, অগত্যা দায়ে পড়িয়া অতিরিক্ত ও অপব্যয় হইয়া যাওয়ায় তাঁহারাই অধঃপাতে যাইতেছেন । স্বয়ং এই কার্য করিতে না পারিলে মহুরী বা কর্মচারীর দ্বারা রীতিমত হিসাবী কাগজ রাখা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্যকার্য । যাঁহার যেরূপ আয় হউক না কেন, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে নিজেরই অভাবে ও অসময়ে উপকারে আসিবে । ক্রমান্বয়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া আপন আয় বাড়াইতে পারিবেন, অথবা সংস্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলে তদ্বারা পুত্রপৌত্রাদিগণের উপকারে আসিবে । অসঙ্গতভাবে অপব্যয় না করা ও সঙ্গতভাবে নিয়মিত ও পরিমিতরূপে ব্যয় করাকেই মিতব্যয়িতা কহে, এই প্রকারে মিতব্যয়ী হওয়া সর্বশাস্ত্রের আদেশ । যিনি অর্থকে চিনিবেন, অর্থও তাঁহাকে চিনিবে । অপব্যয়ী ও অমিতব্যয়ী হওয়া সর্বশাস্ত্রে নিষেধ । খোদায়েপাক আপন কলাম মুজিদে বলিয়াছেন :—

আরবি ।

“ইন্নল লাহা লা ইও

হিব্বুল মুসরে ফিন’”

ইহার অর্থ এই যে আপন কলাম মুজিদে বলিয়াছেন :—

অতএব যাহাকে ঈশ্বর ভাল না বাসেন তাহার আর স্থান কোথায় ।

১১ । চাষের জমী জমীদারের খাজনার হইলে, জমীদারকে খাজনা দিব না, বা এখন দিব না, কি পরে দিব, ক্রমে বাকি ফেলিয়া ভূস্বামীকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্য মনোমধ্যে রাখা বা তাঁহাকে কোন প্রকারে তাঁহার প্রাপ্য খাজনা হইতে নিরাশ করিবার সংকল্প মনোমধ্যে পোষণ করা প্রজার পক্ষে নিতান্ত অগ্ৰায় ও অধর্ম্ম । কাহারও গ্ৰায্য ঋণ না দেওয়া, বা না দিবার বাসনা করা, সর্ব সমাজেই মহা পাপ । এরূপ ধারণা কাহারও মনোমধ্যে থাকিলে তিনি বুঝিতে পারুন কি নাই পারুন ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার পাপের জন্য কোন না কোন প্রকারে নিরাশ করিতেই থাকিবেন । অতি শীঘ্র এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, জমীদারের সেই সামান্য খাজনা না দেওয়ার পাপে তাঁহার যথাসর্বস্ব চলিয়া যাইবে । তদ্বারা তাঁহার ইহকালে ও পরকালে কষ্টের সীমা থাকিবে না । বাকি খাজনার জন্য বাকিপড়া সম্পত্তি অর্থাৎ তাঁহার সেই চাষের জমীগুলি অগ্রেই চলিয়া যাইবে । কেবল যে সেই জমীগুলি গিয়াই রক্ষা পাইবে এমন নহে, ঋণপাপের দায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গিয়া আরও অন্যান্য সম্পত্তিও নষ্ট হইয়া যাইবে । এইরূপে কতশত নির্বোধ ও অধার্ম্মিকব্যক্তি আপন আপন এই জ্ঞানকৃত মহাপাপের জন্য জমীজমাদি হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন । তাঁহাদিগকে অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী-

ইহকালের ত এই অবস্থা পরকালেও যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহা সর্বশাস্ত্রের বিধি। পুনরায় বলা যাইতেছে যে, ইহকালে যদিও কোন কোন ব্যক্তিকে তাঁহার কৃত-অপরাধের নিমিত্ত প্রতিফল ভোগ করিতে দেখা যায় না, তত্রাপি তাহা কখনই এড়াইবার নহে, তাঁহার পরপুরুষ অর্থাৎ পুত্র ও পৌত্রাদিতে সেই পাপ নিশ্চয়ই ফলিবে ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। পুত্র ও পৌত্র, পিতা বা পিতামহের অংশ স্বরূপ। ফলভোগের যথোচিত সময় হইতে না হইতেই পিতার মৃত্যু হইয়া গেলে ও তৎকালে তাঁহার অংশ, পুত্র বা পৌত্র বর্তমান থাকিলে সেইফল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়, ইহার প্রমাণের জন্য শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের উপরই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষে যে যাহা সঞ্চয় করুক না কেন, তাহার বাসনা থাকে যে, তাহার পরপুরুষ সুখে কাল কাটাইতে থাকিবে, কিন্তু এই প্রকার অধিকাংশ মহাপাপী ব্যক্তির নিরপরাধী ও নিষ্পাপী পুত্র বা পৌত্রগণ সুখী হইবার স্থলে পিতা বা পিতামহের পাপের পরিণাম দুঃখ ভোগ করিতে থাকিয়া জগৎবাসীকে শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা এরূপ ভ্রমাক্ত যে, এরূপ শতশতাব্দী দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বুঝি না এবং অনেকে বুঝিয়াও পুনরায় সেইরূপ মহাপাপে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছি, তাহাতেই আমাদের ও আমাদের পরপুরুষগণের কষ্টের সীমা থাকিতেছে না। ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার এই সব নিয়মকে ভয় করিয়া যাহাতে কোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচার না হয় অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টিতে

প্রদীপিত না হয়, এই ভাবিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ঈশ্বরের কোপানল হইতে রক্ষা পাইতে পারা যাইতে পারিবে । জমীদারের প্রাপ্য খাজনা দিতে থাকিলে ঈশ্বর তাঁহার কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য প্রকারে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন । এইরূপে কাহারও অন্য কোন প্রকারের দেনা বা ঋণ থাকিলে যে কোন প্রকারে হয় তাহা পরিশোধ করা আমাদের কর্তব্য । যাঁহার ধার করা যায় তাঁহার মনে না থাকিলেও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া পরিশোধ করা উচিত, অথবা তাঁহার নিকট মুক্তি ভিক্ষা দ্বারা অব্যাহতি পাওয়া কর্তব্য । ঋণ-দায়-গ্রস্ত হইয়া মরিয়া গেলে পরকালের বিচারে মহাজন ক্ষমা না করিলে ঈশ্বর কখনই তাহা ক্ষমা করিবেন না । ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের ব্যবস্থা, অতএব ধারকর্জ্জ, বা খাজনা বাকি যতই হউক না কেন, এমন কি অতি অল্প এক পয়সামাত্র হইলেও তাহাকে প্রাণের শত্রুরূপ ভাবিয়া তাহা পরিশোধ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য ।

১২ । দেশস্থ কৃষিজাত দ্রব্যের উপর যেমন লোকের আশা ও ভরসা তেমনই দেশীয় শিল্পের উপরও দেশের অর্থাগমের কারণ হইতেছে । এক্ষণে বিদেশী শিল্পের বিস্তার হওয়ায় দেশস্থ শিল্প একপ্রকার একবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছে । এক্ষণে আমাদের সর্ব্বপ্রকারেই যাবতীয় অত্যাৱশ্যকীয় দ্রব্যের জন্মও বিদেশীয় শিল্পের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে । এই শিল্পকার্য্যের জন্য আমার পবিত্র রসুলেকরিম দঃ বলিয়া গিয়াছেন, হৃদিস পাক হইতেছে যে,—

আরবি ।

“অল্লা অংএবো মা অকলর রজোলো

মিন কসবেহী”

ইহার অর্থ এই যে, স্বকীয় সংকারণ্যের উপায়ের খাড়া অপেক্ষা
অন্য খাড়া কোন প্রকারেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না । খোদায়েপাক
আপন কলাম মুজিদ ও ফেরকান হমিদে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

আরবি ।

“ইয়া আইয়োহল লজিনা আমমু

কুলুমিন তইয়ে বাতে মা রজক নাকুম”

ইহার অর্থ এই যে, হে ধার্মিকব্যক্তিগণ, তোমরা পাক ও পবিত্র
জীবিকার জন্য চেষ্টা কর । স্বকীয় শিল্পকার্য্যের দ্বারা পাক ও
পবিত্র উপায় খুবই কম হইতে পারে, অতএব এই শিল্পকার্য্যের
প্রতি অবহেলা করিয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কালযাপন করা
অথবা সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ না করিয়া কোন অসৎ উপায়
অবলম্বন করা, আমাদের পক্ষে কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে ।
সামান্য চাকচিক্যহেতু ক্ষণস্থায়ী বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি মুগ্ধ হইয়া
গিয়া ও আপনাদের এত কষ্টের উপার্জিত ধনসম্পত্তির প্রতি
লক্ষ্য না করিয়া, তাহাকে বিনিময় করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ।
দেশস্থ অর্থাৎ আপন পাড়াপ্রতিবাসী শিল্পিগণের উন্নতির নিমিত্ত
পরম্পরের সহানুভূতি ও সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য ।
আমরা আপন প্রতিবাসী শিল্পিগণের দ্রব্যজাত না ক্রয় করিলে
কোথাকার লোক আসিয়া তাহা ক্রয় করিবে । এই উদ্দেশে

মহাকবি সাদি আপন গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন । কোন এক স্ত্রীলোক, নিকটবর্তী দোকানদারের নিকট অত্যন্ত মহার্ঘ্য মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় বলিয়া আপন স্বামীকে বলেন যে, এই দোকান হইতে কোন দ্রব্য খরিদ করা উচিত নহে, অনেক ক্ষতি হয় এবং ভাল দ্রব্যও পাওয়া যায় না । সেই দোকানদার এক প্রকার কথা বলে, আর এক প্রকার দ্রব্য দেয় । তাহাতে তাঁহার স্বামী আপন স্ত্রীকে উত্তর করেন যে,—

পাশী

“ব উমৈদ মা কুলবা আঁজা গিরফ্ত
ন মরদী বুওদ নফা জো ওরাগিরফ্ত”

ইহার অর্থ এই যে, এই ব্যক্তি যখন আমাদেরই আশ্রয়ে ও আমাদেরই নিকটে দোকান করিয়াছে তখন সামান্য লাভের জন্য নিকটের দ্রব্য না লইয়া দূরের দ্রব্য ক্রয় করা কোন প্রকারেই আমাদের মনুষ্যত্ব নহে । এইরূপে পরস্পরের মধ্যে আদান ও প্রদান হইতে থাকিলে আমাদের উপার্জিত ধনসম্পত্তি আমাদেরই মধ্যে অর্থাৎ দেশেই রহিয়া যাইতে পারিবে । এই প্রকারে পরস্পরের অর্থাৎ প্রতিবাসীর উন্নতি হইতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উন্নতি ও দেশের উন্নতি অর্থাৎ মঙ্গল হইবে । এই জন্য আমাদের দেশীয় শিল্পে সাহায্য করা ও নিজে নিজেই এমন কি গৃহস্থিত স্ত্রীলোকগণেরও যাহার যেমন বুদ্ধি, বিবেচনা ও ক্ষমতা তদনুসারে শিল্পকার্যে নিপুণা

পরিশ্রমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় । পরিশ্রমী না হইয়া অলস হইয়া গেলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায়, সন্তান সন্ততিগণ দুর্বল ও ক্ষীণায়ুঃ হইয়া থাকে । পরিশ্রমী হইলে সন্তান সন্ততিগণ দীর্ঘায়ুঃ হয় ও কার্যক্ষম হইয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে । এই সব কারণে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকা সকলেরই শিল্প শিক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যিক । ইহার দ্বারা দরিদ্রের অর্থ উপার্জন হইবে ও সম্ভ্রতিপন্ন ব্যক্তির অর্থনাশ হইতে পারিবে না ।

১৩।* আজ কাল ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারণে মনুষ্যমধ্যে বিস্তর অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে । যে ব্যয় না করিলে, নয় অথবা যে প্রকার ব্যয় না করিলে নিজের সম্মানের পক্ষে দোষ ঘটিবে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এবং আপন সংস্থানের প্রতি বিবেচনা করিয়া ব্যয় করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য । যাহার যেমন আয় হউক না কেন, মাসিক, কি বাৎসরিক আয় হইলেও প্রতি মাসের শেষে অথবা বৎসরের শেষে, যাহাতে কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা যায়, এই প্রকারে ব্যয় করা প্রত্যেকের উচিত । তাহা না করিয়া আপন বৃথা ইচ্ছা পূরণের জন্য ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ হেতু এবং তোষামদকারী কপট বন্ধুবান্ধবগণের উদর পরিপোষণ জন্য, কিম্বা অপরের নিকট আপন বাহ্যডম্বরী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, যাহারা অতিরিক্ত ব্যয় করেন তাঁহাদেরই শেষ অবস্থায় কষ্টের সীমা থাকে না । পৈত্রিক সম্পত্তি থাকিলেও তাহা হস্তান্তরিত হইয়া

হইয়া অথবা অপরের দারস্থ হইয়া অতি দীনহীন অবস্থায় কাল কাটাইতে হয় । শেষে এইরূপ হীন অবস্থায় কাল কাটান অপেক্ষা আপন অধিকারের সময়েই বুঝিয়া ও বিবেচনা করিয়া ব্যয় করা অথবা ব্যয় সংক্ষেপ সহকারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কার্য করা ও অপব্যয় এবং অতিরিক্ত ব্যয় না করাই বুদ্ধিমানের কার্য । অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় সর্ব শাস্ত্রেই নিষেধ রহিয়াছে । এক্ষণে এমন অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপন স্ত্রী ও পুত্রাদির জন্য কি হইতেছে ও ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে কি হইবে, ইহা ক্ষণকালের জন্যও না ভাবিয়া আপন তোষামোদকারী কপট বন্ধুগণের কুহকে পড়িয়া নিয়তই অজস্র পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন, তাঁহারা এটা ভাবেন না যে, তাঁহাদের সেই সকল কপট বন্ধু কোন্ সময়ে কি কারণে ও কিসে উপকারে আসিবেন অথবা উপকার করিবেন । তাঁহারা কেবল সুখের বন্ধু, দুঃখের কেহই নহেন । যাঁহার দ্বারা উপকারের কোনই আশা নাই তাঁহার তোষামোদ না করিলে অথবা তাঁহার জন্য আপন অর্থনাশ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই । ভালবাসা বা বন্ধুতা আছে থাকুক, অপব্যয়ের কোনই কারণ নাই, এই প্রকার ব্যয়কে অপব্যয় বলা যায় ও অপব্যয় হইলেই পাপ হয়, এবং পাপ হইলেই পরকালে ঈশ্বরের বিধানানুসারে দণ্ড আছেই আছে । এইরূপে পাপজন্য দণ্ড বিধানের কারণ এই যে, মানুষে সময়ে অর্থাভাবজনিত কারণে সাংসারিক জ্বালায় পতিত হইয়া হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেক শূন্য হইয়া পড়ে ও তজ্জন্য

করিতে কখনই কুণ্ঠিত হয় না, তাহার জন্য তাহার নিজের ও তাহার আত্মজগণের এবং সংসারের কত লোকের কত প্রকার অনিষ্ট যে ঘটিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে বিস্তর অনিষ্টকর ও অশাস্তিকর ঘটনাসমূহ ঘটিয়া পড়ে বলিয়াই অর্থ সঞ্চয় জন্য ঈশ্বরের আদেশ এবং অপব্যয় জন্য দণ্ডের বিধান হইয়াছে। এ পাপ হইতে রক্ষা হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে, ইহা কেবল নিজের বিচার ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমরা এই সব ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে ইহকালে অর্থশালী হইয়া সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব, এবং পরকালেও ঈশ্বরের নিকট অশ্বব্যয়-জনিত পাপের দণ্ডাজ্ঞা হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। এক্ষণে কেবল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে ও নব্য সভ্যতার বিস্তার গুণেই যে, আমাদের মধ্যে ব্যয়াদিক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং পূর্বের যে এ রোগ ছিল না এমন নহে, এখনও অনেক স্থলে পূর্বের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আমার আত্মাভিমানী মুসলমান ভ্রাতৃগণ কোন প্রকার — উৎসব উপলক্ষে নাচ, গাওনা ও আত্মস্বাজীতে অথবা দেশ, পরগণা ও সহর তামাদি কার্য্য করিয়া আপন আপন নাম জাহির করিয়া গিয়াছেন ও তদসহ নিজে নিজে ফতুর হইয়া গিয়াছেন। এক বা ২১৩ টী ক্রিয়াতেই দেনাদার হইয়া গিয়া আপন পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ; এখনও তদনুরূপ অনেক ভাষাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও পুত্র কন্যার বিবাহাদি কার্য্যে নাচ ও গাওনাদিতে অর্থ নাশ করিয়া আপন

আপন পুত্র ও কন্যাগণকে ভিখারী করিতেছেন, এবং খোদা ও রসুলের আদেশের বিপরীত কার্য্য করিয়া আপন ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতেছেন । এই প্রকারে যৌতুক অর্থাৎ লৌকিকতার ব্যবস্থাতে ও আমাদের মধ্যে অনেককে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । যদিও ইহাকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পরস্পর আদান প্রদান হইয়া থাকে, তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না । যদি তাহাই হয় তবে এই প্রকারে দেওয়া ও লওয়ার প্রয়োজনই বা কি ? ইহাতে অনেকে ক্রমাগত দিতেই থাকেন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই থাকেন, কিন্তু লইবার সুযোগ বা সুবিধা হয় না ; অনেকে আবার কিছু না কিছু উপায়ই করিতে থাকেন । কখন কাহারও নিকট কিছুই না থাকিলে তাঁহাকে দেনা করিতে হয়, না হয় লজ্জিত হইয়া তথায় আর যাইতে পারেন না । যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ বা আত্মীয়তা নাই তাঁহার সহিত এ প্রকারের আদান ও প্রদানের প্রয়োজন কি । তবে কাহারও কোন আত্মীয় বা স্বজন আপন অসমর্থতা প্রযুক্ত পিতৃ কি মাতৃ দায় বা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেছে না জানা গেলে ক্ষমতানুসারে তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করাই কর্তব্য । আমাদের দেশে আমাদের পল্লিগ্রামবাসী মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পরে সাহায্য করা দূরের কথা, পিতৃ বা মাতৃদায় হইতে উদ্ধার করা দূরের কার্য্য, এই প্রকার দায়কালে দয়া না করিয়া এই রূপে ক্রিয়া করিতে হইবে, এই প্রকারে খরচ করিতে

জোরপূর্বক দায়গ্রস্ত ব্যক্তির জমীজমা, গরু বাছুরাদি বিক্রয় করিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে নিজেদের ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া কত শত স্বজাতি ও প্রতিবাসীকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। সে হাজারো কাকুতি ও মিনতি করিলেও কেহ কখন দয়া করেন না। এই প্রকারে জোর ও জুলুম করিয়া ২১ বেলা মাত্র আহার করিলে কাহার এত কি লাভ বা উপকার হয়? কিছুই হয় না, বরং দায়গ্রস্ত ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে ও চিরকালের জন্য বরবাদ হইয়া পড়ে। এই প্রকারের খাওয়া কতদূর ণীয় সঙ্গত অথবা হলাল, কি হরাম, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যিক। এই সকল ব্যক্তি লইয়াই আশ্রমের সমাজ এবং সমাজের দুর্দশা ও প্রশংসা এইরূপ।

নবম অধ্যায় ।

গৃহবাস ।

১। ঈশ্বর মনুষ্য জীবনে যেমন সীমা বিধিষ্ট আয়ুর সংখ্যা করিয়া দিয়াছেন, তদনুরূপ মৃত্তিকা ও বৃক্ষ লতাদিরও আয়ুর সীমা করিয়াছেন। আব, আতশ, থাক ও বাদ অর্থাৎ জল, অগ্নি, মৃত্তিকা ও বায়ু এই চারি ভূত অর্থাৎ পদার্থে (হিন্দু মতে পাঁচ ভূত তাঁহারা “ব্যোম” কে একটা ভূত বলিয়া ধরেন “ব্যোম” শব্দের অর্থ ইথর সদৃশ সূক্ষ্ম পদার্থ) চেতন ও উদ্ভিজ্জের গঠন।

ইহাদের অভাবে কেহ কখন বাঁচিতে পারে না, এমন কি ইহার মধ্যে কোন না কোন এক পদার্থের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে হঠাৎ গুরুতর বিঘ্ন হইয়া পড়ে । ইহাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল । অতএব ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকার উপর আমরা বাস করিতেছি । শরীরও আমাদের সেই মৃত্তিকায় গঠিত । ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের নিয়ম অনুসারে বাসস্থিত মাটিরও আয়ুঃ রহিয়াছে, অতএব যে সীমা বিশিষ্ট মাটির উপর মনুষ্যের বাস তাহার আয়ুর সহিত তৎস্থিত মনুষ্যের আয়ুরও বিশেষ সম্বন্ধ আছেই আছে ধরিয়া লইতে হইবে । ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের নিয়ম-কেই স্বভাব বলা যায়, অতএব স্বভাবের এই নিয়মেই বাসস্থিত মৃত্তিকার আয়ুঃ অনুসারে তৎস্থিত মনুষ্যের আয়ুর স্থিতি, উন্নতি ও অবনতির সম্বন্ধ থাকা সর্বপ্রকারেই সঙ্গত ও বিধেয় এবং স্বভাবের এই নিয়মেই সেই মৃত্তিকার আয়ুর পরিমাণ অনুযায়ী তৎস্থিত পরিজনবর্গের উন্নতি ও অবনতি ঘটয়াই থাকে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ । যে সীমা বিশিষ্ট ভূখণ্ডের উপর লোকের বাস সাধারণ ভাষায় আমার দেশে লোকে তাহাকে ভিটাবাড়ি বা ভিটামাটি কহে । সেই ভিটামাটির আয়ুঃ যদিও মনুষ্যের আয়ুর ন্যায় প্রকাশ্য নহে তবে তাহার পরিণাম ফল অর্থাৎ আয়ুঃশেষ হইলে যাহার যেরূপ মন্দ ফল ফলিয়া থাকে তাহা সেই ভিটাস্থিত গৃহ ও গৃহস্থিত মনুষ্যের প্রতি বর্তিয়া থাকে, তদ্বারা তৎস্থিত মনুষ্যের উন্নতি

দ্বারা ভিটামাটি ও গৃহের আয়ুঃ কতক পরিমাণে নির্ণীত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ রূপে নির্দিষ্ট হয় না এবং তাহার সীমা কত তাহাও স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় না, ফলতঃ ভিটামাটির সহিত যখন মনুষ্যের এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তখন সেই ভিটামাটির যে পরিমাণ আয়ুর সংখ্যা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় তদুপরি নির্ভর করিয়া কার্য্য করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য ; নচেৎ ভিটামাটির আয়ুর সংখ্যা অনুসারে ও তাহার পরিণাম ফল অনুযায়ী তৎস্থিত মনুষ্যকে সেই ফল ভোগ করিতেই হইবে । স্বভাবের এই নিয়মের গুণে অনেকেই তাহার ফলভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভিটামাটির আয়ুঃ উৎকৃষ্টসংখ্যা মনুষ্যের আয়ুর সমতুল্য একশত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়াছেন । ইহার তাৎপর্য্য এই যে কোন নূতন ভিটায় ঘর করিলে যদি সেই ভিটার কোন দোষ না থাকে অর্থাৎ বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হয় (দোষ ও গুণের ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে) তবে তদস্থিত গৃহ ও গৃহস্থিত মনুষ্যের উন্নতি ও স্থিতি একশত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে, তাহার পর অবশ্যই সেই ভিটা ও গৃহ এবং গৃহস্থিত মনুষ্যকে অবনতির অবস্থায় পরিণত হইতে হইবে । তাহাতে আর সেই পরিবারের উন্নতি হইবে না । ধনসম্পত্তি হ্রাস হইতে থাকিবে, অকাল মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকিবে । পুত্র সন্তানের জন্ম ক্রমে হ্রাস হইয়া গিয়া কন্যার জন্ম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । নানা প্রকার কুনীতি ও কুপ্রবৃত্তির দিকে মনুষ্যের মন ধাবিত হইতে থাকিবে । অন্যায়, অত্যাচার এমনকি পাপাচারের

সংখ্যা ও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে । সম্ভ্রান সম্ভ্রতিগণ গণ্ডমূৰ্খ হইয়া গিয়া অবনতির বিশেষ কারণ সমূহ পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে । অনেকস্থলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় । জগতের এই নিয়মেই কত শত পুরাতন, খানদানী ও বুনিয়াদী ঘর বরবাদ হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । ইহাতে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ করা কোন মতেই কর্তব্য নহে । জগৎপাতা জগদীশ্বর ইহাকে আপন সৃষ্টিকৌশলের নিয়ম সমূহের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার কোন প্রকার চিকিৎসা বা প্রতিকার নাই ; তবে পরীক্ষায় দেখা যায় যে কোন এক পরিবার বহুকাল এক ভিটাতে থাকা প্রযুক্ত তাহার অবনত অবস্থা ঘটিবার পূর্বে সেই পরিবারস্থিত কোন এক ব্যক্তি, তিনি জানিতে বা বুঝিতে পারুন কি নাই পারুন আপন সাবেক পুরাতন পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিয়া অথবা জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন দূরদেশে বা অন্যত্র গিয়া নূতন ভিটা সৃজনপূর্বক গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে ক্রমে তথায় তাঁহার পারিবারিক, সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতে থাকে ও তাঁহার সাবেক ভিটাস্থিত অবশিষ্ট পরিজনবর্গের মধ্যে তৎকালে অবনতির অনেক প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ও সর্ব প্রকারে হ্রাস হইতে থাকে । যাঁহারা বহুকালের পুরাতন ভিটা ত্যাগ না করিয়া তাহাতেই রহিয়াছেন তাঁহাদের অবস্থা অশেষ প্রকার অমঙ্গলের চরমসীমায় পরিণত হইতেছে ও এমনকি অনেকের বংশ পর্য্যন্তও এক-

নষ্ট হইয়া যাইতেছে । কাহারও কিছু না কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকিলেও দুর্ভাগ্যদোষে খাইতে পাইতেছেন না । যিনি আপন পুরাতন ভিটা হইতে উঠিয়া গিয়া অন্যত্র নূতন ভিটায় বাস করিতেছেন তাঁহার বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং ইহাতে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এক ভিটা ও বাড়িতে বহুকাল বাস থাকিলে, সেই ভিটা ও মাটির আয়ুঃ অনুযায়ী তৎস্থিত পরিজনবর্গের আয়ুর ক্ষয় ও সর্বপ্রকার অবস্থার অবনতি হইতেছে । এই নিমিত্ত বিজ্ঞ বক্তৃগণ কোন এক ভিটা ও বাড়িতে অতি দীর্ঘকাল বাস করিবার জন্য ব্যবস্থা দেন নাই । কোন রাজা, জমিদার, বড়লোক বা অন্য যে কোন লোক হউন না কেন, তাঁহার সারেক পুরাতন বাড়িতে সংযোগ বা বিয়োগ ঘটাইতে থাকিলে, কোন কোন স্থলে এই নিয়মের বিপরীত ফল দেখা গিয়া থাকে, অর্থাৎ তথায় কোন প্রকার মন্দ ফল দেখা যায় না, তবে সকলই জগতের একই নিয়মে বশীভূত ও পরিণামফল সকলেরই সমান । জগৎ সংসারে ও স্বভাবের নিয়মে যেমন একটা ভিটা ও বাড়ি বশীভূত, তেমনই গৃহের সমষ্টি পল্লি, গ্রাম, সহর ও নগর সকলই সেই নিয়মের বশীভূত । সকলকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয় । যেমন শত বৎসরের পর এক ভিটা বা বাড়ির পরিণাম ফল তৎস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই শত শত বৎসরের সমষ্টিতে সহর ও নগরের পরিণাম ফল দেখা যায় । ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার এই নিয়ম ও বিধি অনুসারেই কত কত সহর ও নগরের কতপ্রকার পরিবর্তন ঘটয়া যাইতেছে । স্থান বিশেষে কত বিজন কানন ও

সমুদ্রের স্থলে কত কত নূতন নূতন দেশ ও নগরের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতেছে । ইতিহাস তাহার প্রমাণ দিতেছে । ঈশ্বরের মহিমাগুণেই উদ্ভিদ ও চিরকাল অথবা দীর্ঘকাল ক্রমান্বয়ে এক স্থানেই উৎপত্তি, উন্নতি ও স্থিতির ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, ওষধি-তরুগণের সম্বন্ধে পরীক্ষা করিলে বৃহৎ বৃক্ষের বিষয় সহজে বুঝিতে পারা যায় । তদনুরূপ অন্যান্য বৃক্ষের অবস্থা ও তাহাই ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্তন না করিলে তাহার উন্নতি ও বৃদ্ধি কখনই হয় না ।

২ । স্বভাবের এই প্রকার নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া আপন বংশ পরম্পরায় সুখে ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবার বাসনা হইলে, ভিটাবাড়ি এক সময়ে নির্দোষ থাকিলেও শত-বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাতে সংযোগ বিয়োগ অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্দোষ স্থান নির্বাচন পূর্বক নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করা কর্তব্য ; অথবা সাবেক অর্থাৎ বহুকালের পুরাতন ভিটাতে থাকা কালে তথায় অবনত অবস্থার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতে না হইতেই তাহার গৃহাদির মধ্যে সংযোগ বা বিয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন ; ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা আপত্তি করা যুক্তি সঙ্গত নহে ; বিশ্বাস না হয় শত সহস্র প্রমাণ ও নিদর্শন নিজের চক্ষের উপর পাড়াপ্রতিবাসী ও দেশ এবং নগরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন । কোন এক ঘরে দীর্ঘকাল বাস করায় তথায় অধিক সংখ্যক জন্ম ও মৃত্যু ঘটিলে অথবা অন্যায়ে, অত্যাচার ও পাপাচারের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে, কিম্বা

ক্ষয় হইয়া যায়, ইহাও বিজ্ঞব্যক্তিগণের বাক্য । এইরূপে ভিটামাটি ও গৃহের আয়ুর সংখ্যা হ্রাস হইলে, তৎস্থিত মনুষ্যকে তাহার পরিণামফল ভোগ করিতেই হইবে । এই নিমিত্ত যে গৃহে বাস করা যায়, তথায় অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও জীব-হিংসা হইতে যতদূর নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারা যায় ততই মঙ্গল ।

৩। গৃহ নির্মাণ জন্য ভিটাবাড়ী সম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তিগণ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যে, যাহাতে কখন কাহারও কোন গৃহ ছিল না, (নিতান্তপক্ষে ধরিতে গেলে বহুকাল পূর্বের কোন গৃহ ছিল এক্ষণে দীর্ঘকাল হইতে পড়িয়াই আছে) যেখানে কখন কোন প্রকারের শ্মশান বা গোরস্থান এমন কি গো-ভাগাড়ও ছিল না, অথবা যাহাতে কৃষিকার্য্য হইতেছে, এইরূপ স্থানেই গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য । কাহারও পরিত্যক্ত ভিটা বা বাড়ীতে যেখানে সে কোন প্রকারেই শুভ ফললাভ করিতে পারে নাই তাহাতে পুনরায় বাসকরা কোন প্রকারেই উচিত নহে । যে ভিটাবাড়ীতে কোন একজন ছিল, তথায় তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে অকাল মৃত্যু আদি নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়া তাহার ~~উচ্ছেদ~~ হইয়া গিয়াছে, সেই ভিটা বা বাড়ীতে পুনরায় বাস করা কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে । শ্মশান, গোরস্থান ও ভাগাড় দূরের কথা, এমন কি কোন স্থানে মাটির মধ্যে কোন পশুর অস্থি থাকিলেও তথায় বাস করা সম্বন্ধে বিজ্ঞব্যক্তিগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানেও তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতেছে । এই নিমিত্ত ঘরে বা ঘরের নিকটে শব গোর দেওয়া বা শব দাহ করা কিম্বা নিক্ষেপ করা উচিত নহে ।

মাটির আবশ্যক হইলে, অথবা ঘরের নিকট মাটি না পাইলে, নিকটস্থ শ্মশান অথবা গোরস্থান হইতে মাটি আনিয়া গৃহে সংযোগ করাও অশ্রায়, ইহার অমঙ্গলজনক ফল অনেকেই দেখিয়াছেন ।

৪ । আমাদের দেশে পরস্পরের মমতা ও সৌহৃদ্য বশতঃ পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে এবং এমন কি অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকেও এক অন্নে লইয়া একত্রে এক ভিটার মধ্যে অথবা এক গৃহে বা সংলগ্ন গৃহে বাস করিয়া থাকেন । ইহা সৌজন্মের চক্ষে দেখিতে অতি উত্তম, কিন্তু বিবেচনার পক্ষে ইহার ফল অত্যন্ত মন্দ ও অমঙ্গলজনক । এদেশে ইহার পরিমাণ যেমন অধিক, ইহার পরিণামফলও তেমনই দেশব্যাপী অমঙ্গলজনক । মায়া-মমতা বশতঃ কেহ কাহাকেও ছাড়িতেছেন না, তন্নিমিত্ত একজন অপরের অধীন হইয়া থাকিতেছেন । সেই অধীনতা বশতঃ তাঁহার মানসিক বৃত্তি কখন স্বাধীনতার ভাব ধারণ করিতে পারে না, আজীবন তাঁহাকে পরাধীনতায় কাল কাটাইতে হয় । অধীনতা বশতঃ ক্রমে তাঁহার শরীরের রক্ত, মাংস, শিরা ও ধমনী আদির তেজ একবারেই নিস্তুজ হইয়া পড়ে ; চেষ্ঠা-ত উদ্দম আদৌ থাকে না । পিতা বর্তমান, বা ভ্রাতা কর্তা, আমার বা আমার পরিজনবর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত আমার চিন্তা কিসের, মাথার উপর কর্তা আছেন, এই ভাবিয়াই অনেকে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ঠ থাকেন । স্বাধীন হইয়া আমিও একজন কর্তা হইব, অপর দশ জনকে বশীভূত করিয়া আধিপত্য করিব, স্বাধীন হইয়া

ধারণা প্রায় কাহারও হয় না । পিতা পুত্রের মুখাপেক্ষী না হইলে, পুত্র সক্ষম হইয়া পিতার অধীনে না থাকিলে, জ্ঞাতিবর্গের কথা দূরে থাকুক, ভ্রাতা অপর ভ্রাতার অধীনতায় না থাকিলে, স্বাধীন ভাবে যে যার নিজের পারিবারিক অশেষ উন্নতি করিতে পারেন ও সকলেই স্বাধীনভাবে সংসারের বিবিধ উপকার করিতে পারেন ; কিন্তু এক অপরের অধীন ও মুখাপেক্ষী হওয়ায়, অধীনতাহেতু আমাদের দেশের দরিদ্রতা আমাদেরকে আর ছাড়িতেছে না । এক সময়ে দেশ স্বাধীন ছিল, ভিন্ন দেশের সহিত একরূপ বাণিজ্যের বিস্তার ছিল না, দেশের দ্রব্য দেশেই থাকিত, তজ্জন্য দরিদ্রতা কিরূপ তাহা কেহ বুঝিতই না, এখন আর সেদিন নাই, এখন যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে একরূপ স্বাধীনভাবের উদয় না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ও আমাদের দেশের দরিদ্রতা ঘুচিবে না । পৈত্রিক রাজ্য বা সম্পত্তি থাকে, থাকুক, পরস্পরের মধ্যে কোন এক উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা চালাইতে পারেন, তাঁহার নিকট হইতে আপন আপন অংশ অনুযায়ী উপসহ বুঝিয়া লইতে থাকিবেন । নিজে স্বাধীন হইয়া পৃথক্ গৃহ নির্মাণ পূর্বক পৃথক্ অগ্নে কালযাপন করিতে হইবে, এই ধারণা মনোমধ্যে করিলে কেহ নিশ্চেষ্ট না হইয়া আপন আপন সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া নানা উপায়ে যে যার আপন আপন কাল কাটাইতে পারিবেন ও উপযুক্ত সংস্থান করিয়া উন্নতিলাভ করিতে থাকিবেন ।

৫ । এক ঘরে, একত্রে বাস করিবার বিস্তর অমঙ্গলজনক ফল দেখিতে পাওয়া যায় । চতুষ্পার্শ্বে নানা পরিজনবর্গ বেষ্টিত

থাকায় এমন কাহারও সুযোগ বা সুবিধা হইয়া উঠে না যে, মনের সুখে, আমোদ ও আহ্লাদ সহকারে আপন প্রিয়তমা পত্নির সহিত দুইটী কথা বলিয়া মনকে ভুলাইয়া লন । মানসিক স্ফুর্তি আদৌ বিকাশ করিতে পারেন না । পিতা, মাতা ও অন্যান্য পরিজন-বর্গের নিকট লজ্জার খাতিরে বশীভূত হইয়া চুপ করিয়াই থাকেন, কিন্তু তজ্জন্যই বাহিরে গিয়া সেই অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত অধিকাংশ ছেলে আমোদপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং অপব্যয়ী ও পাপাচারী হইয়া গিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৈত্রিক বিষয় ও ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন ও অতি শীঘ্রই অকস্মণ্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সাংসারিক উন্নতি করা দূরের কথা তাঁহার দ্বারা সংসারের অশেষ অমঙ্গলই ঘটয়া থাকে । যদিও কেহ এক অল্পে না থাকেন অথচ একত্রে ও এক স্থানেই বাস করিতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কখনই একতা হয় না, তাঁহাদের মধ্যে একতা হওয়াও সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য পরস্পরের মধ্যে অহরহ কলহ ও দ্বন্দ্ব লাগিয়াই থাকে, এই নিমিত্ত কাহারও মনে সুখ থাকে না, সেই চিন্তায় আয়ুঃক্ষয় হইয়া পড়ে ; আরও গুরুতর অনিষ্টকর ঘটনা এই যে কোন এক সময়ে কোন প্রকার সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে, অতি অল্পকাল মধ্যে তাহার পরিণাম ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয় । অন্যত্রে বা পৃথক গৃহে থাকিলে সে আশঙ্কা খুব কমই থাকে । আমাদের রাজপুরুষ ইংরাজ জাতিগণ এই সব নিয়ম যে প্রকারে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহার কোন অংশ আমাদের থাকিলে আজ আমরাও ধন্য হইতাম । আমরা তাঁহাদের সব বিষয়ই অনুকরণ

করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের কোন সৎগুণ অনুকরণ করিবার জন্য কেহই কখন চেষ্টা করিতেছি না । এই সব কারণেই তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন । তাঁহারা কি কেহ কাহারও অধীনে বা মুখাপেক্ষী হইয়া অথবা একত্রে কি একঘরে আমাদের মত বাস করিয়া থাকেন, কিম্বা কেহ কি কখন নিশ্চেষ্ট হইয়া কাল কাটাইতে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ঘৃণিত ব্যবহার নাই বলিয়াই আজ তাঁহারা জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করিয়াছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব বিষয় আমাদের আছে বলিয়াই আমাদের দরিদ্রতা ও অধীনতা ঘুচিতেছে না । আমাদের ঘরে অধীনতা, বাহিরে অধীনতা, মনে অধীনতা, আহারে, বিহারে অধীনতা, পুত্র পিতার অধীন, পিতা পুত্রের মুখাপেক্ষী, ভ্রাতা অপর ভ্রাতার বশীভূত, এইরূপে সকলেই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এই সুযোগে দরিদ্রতাও আমাদেরকে বেঁচন করিয়া রাখিয়াছে, আমাদেরকে এ বন্ধন হইতে উদ্ধার করা অপর কাহারও সাধ্য নহে, তবে কেবল আমরা আপন আপন মানসিক প্রবৃত্তিকে বল প্রদান করিতে পারিলেই সর্ব প্রকারে শুভ ফললাভের আশা হইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

৬। পিতার ঔরসে পুত্রের জন্ম । যতদিন পর্য্যন্ত পুত্র অসহায় ও অনুপযুক্ত থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত পিতা পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানদান করিবেন । প্রতি-পালন কালে ভবিষ্যতে যাহাতে সন্তানের স্বাস্থ্যের কোন অমঙ্গল না ঘটে তদ্রূপ কার্য করাই পিতার মহাদান ও প্রধান কর্তব্য ।

পুত্রকে উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন, পুত্র আপন পিতার প্রতি কর্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য, তাহার জন্ত পিতা পুত্রের নিকট মুখোপেক্ষী হওয়া অনুচিত । পিতা আপন কর্তব্য জ্ঞানে এক সময়ে পুত্রকে যাবতীয় বিষয় দান করিয়াছেন, অন্য সময়ে পুনরায় সেই দানগ্রাহী পুত্র অথবা অন্য যে কেহ হউক না কেন তাহার নিকট হইতে প্রত্যর্পণের আশা করা কি পিতা বা অপর কোন দাতার অকর্তব্য ? তাহা কখনই হইতে পারে না, দান করিয়া দানের প্রতিদানের আশা করা কোন শাস্ত্রেই অনুমতি দেয় না, সে জ্ঞান পুত্রের কর্তব্যের উপর নির্ভর করে । তাহার প্রতিশোধ তিনি না করিলে তিনি ইহকালেই দেশে ও সমাজে ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিবেন এবং পরকালে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবেন । পুত্রের নিকট আপন প্রত্যর্পণের আশা যেন কখন করিতে না হয় এইরূপ দৃঢ়সংকল্প মনোমধ্যে রাখিয়া প্রত্যেক পিতা যদি আপন আপন মনকে সবল করেন এবং তদ্রূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সম্বল ও সংস্থান করেন, তাহা হইলে সকলেরই মনে স্বাধীনতার অসীম শক্তি উৎপন্ন হইবে, অতএব পিতার এইরূপ সময় হইতেই পারিবে না যে, পুত্র অথবা আপন অন্য দানগ্রাহীর নিকট হইতে কখন তাঁহাকে পূর্ব দানের প্রত্যাশায় সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে । আমাদের দেশে পিতা মহোদয়গণের মধ্যে এরূপ মানসিক বল কাহারও নাই বলিয়াই পুত্রগণ উপযুক্ত হইয়া উঠিলেই তিনি পুত্রের নিকট হইতে আপন পূর্ব দানের অংশ পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই পুত্রের মুখোপেক্ষী হইয়া পড়েন এবং আপন দেহ ও

মনকে হীন এবং দুর্বল করিয়া পুত্রের অধীনতা স্বীকার করিয়া লন, এরূপ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির কাহারও পিতা হওয়া শোভা পায় না । পুত্রের কর্তব্য জ্ঞানে পিতা যে পরিমাণ সুখ পাইতে পারেন, পুত্রকে বাধ্য করিয়া প্রায় কোন পিতাই তদ্রূপ সুখভোগ করিতে পারেন না ; কারণ তৎকালে শ্রীমান পুত্র, শ্রীমতী বধুমাতার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন । বধুমাতার নিকট শিশুর মহাশয় স্বামীর পিতা ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তিনি শিশুরকে আপন পুত্র অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারেন না । শিশুর মহাশয়কে অবশেষে বার্ককে শ্রীমতী বধুমাতার নিকট লাঞ্চিত হইতে দেখা যায় । জগতে এমন কোন জীব নাই যে তাহার অন্তরে এরূপ স্বাধীনতা নাই । পশু পক্ষ্যাদি হিংস্রজন্তুর মধ্যেও এরূপ স্বাধীনতা আছে, তাহারাও আপন আপন সন্তান সন্ততিগণকে অশেষ যত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে তৎকালে অকস্মাৎ কোন শত্রু কর্তৃক আপন শিশুর কোন প্রকার অমঙ্গলের কারণ দেখিতে পাইলে শিশুর জন্ত আপন আপন প্রাণ পর্যন্ত দিতেও কখনই কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু শিশুগণের শৈশবকাল অতীত হইলেই তাহারা তাহাদের প্রতিপালনের কষ্ট একবারেই ভুলিয়া গিয়া সন্তানগণকে স্বাধীন করিয়া দেয় । যদিও পশ্বাদিক জ্ঞানের সীমা তাহাই বলিয়া তাহারা আর তাহা অতিক্রম করিতে পারে না, তবে পশ্বাদিক জ্ঞান মানুষের জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াও আপন পূর্ব দান প্রত্যর্পণের আশা ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু মানুষে সে আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর অধীনতা

স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, ইহা বুদ্ধিমান মনুষ্যের পক্ষে শোভা পায় না । পিতা পূর্ব হইতেই দরিদ্র হইয়া থাকেন বলিয়া শেষে পুত্রের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন এবং পুত্রকেও দরিদ্র করিয়া ফেলেন । জগতে অন্যান্য দেশে কোথাও এরূপ হীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না । তাঁহারা ত পুত্রের বাল্যকালে যত্নের ক্রটি করেন না, উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান দানের জন্য কোনই অবহেলা করেন না, এই প্রকারে আমাদের ন্যায় যথোচিত দান করিয়াই থাকেন, তৎপরে পুত্র উপযুক্ত ও স্বাধীন হইয়া উঠিলে কেহই আমাদের ন্যায় পুত্রের অধীন ও মুখাপেক্ষী হন না । তাঁহাদের অন্তরে এরূপ স্বাধীনতার ভাব আছে বলিয়াই, তাঁহারা আপন আপন অন্তর ও মনের তুলনায় আপনাদের দেশকেও স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের সে ভাব নাই বলিয়াই আমাদের অন্তর ও বাহির সবই অধীনতায় পরিপূর্ণ । আমরা পুত্রের নিকট অনেক প্রকার আশা করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সে আশা কখনই পূর্ণ হয় না । কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন :—

ইংরাজী ।

“হাপী ফর্ দি মোষ্ট পার্ট হু হাভ ডটাস’
ডটাস’ আর এ্যাপ্ট টু আউট লিভ দেয়ার
জাচার্যান্স্ এ্যাক্ফেসন ছইচ দি সন
জেনারেলি সারভাইভস্ ইভিন বিফোর হিজ
বইশ ইয়াস’ আর এক্সপায়ার্ড”

ইহার অর্থ এই যে, জগতে তিনিই সুখী যাহার কন্যা আছে,

কারণ কন্যাগণ পিতা ও মাতার স্নেহ ও মমতাকে আপন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন না, কিন্তু পুত্রগণের শৈশবকাল অতীত হইলেই তাঁহারা পিতা ও মাতার স্নেহ ও মমতাকে একবারেই ভুলিয়া যান। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহার কোন অংশই মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা সৎপুত্রের কার্য্য নহে।

৭। আমাদের দেশে গৃহস্থ সমাজে পুত্রকে উপযুক্ত করা দূরের কথা, তাঁহারা পুত্রের অসহায় অবস্থায় ও অল্প বয়সে বিবাহ করাইয়া দেওয়াকে পিতা ও মাতা আপনাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য নহে। পুত্র বিবাহ করিবার ব্যয়ভার ও আপন স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণ ও পোষণের ভার লইতে উপযুক্ত উপায়ক্ষম যখন হইতে পারিবেন, তখন আপনার বিবাহ আপন ইচ্ছানুরূপে করিয়া লইতে পারিবেন, ইহা তাঁহার বিবেচনা, ক্ষমতা ও উপযুক্ততার উপরেই নির্ভর করিতেছে। তাহা না হইয়া পুত্র কি প্রকারে আপন স্ত্রী ও পুত্র কন্যার ভরণপোষণ করিবেন, তাহার জন্ম কোন পিতাই চিন্তা করেন না। অনেক স্থলে পুত্র নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিতে না পারায় স্ত্রীর সহিত মনের অনৈক্য হইয়া উঠে। গৃহে উপযুক্ত সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বালকগণ অনেকেই কুপথগামী হইয়া পড়েন এবং তদ্বারা কতই কুফল ফলিয়া যায়। যদিও অনেকের তাহা না ঘটে কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে আপন উন্নতির দিকে আর অগ্রসর হইতে পারেন না। কোন দূরদেশে বা বিদেশে যাইবার ক্ষমতা তাঁহার আর থাকে না। অকালে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপন শারীরিক

ও মানসিক বল এরূপ ভাবে হারাইয়া বসেন যে অবশেষে কূপের ভেকের শ্রায় হইয়া থাকিতে হয়, অর্থাৎ ঘরে বসিয়া কিছু জুটুক আর না জুটুক আপন সীমা বিশিষ্ট স্থানের মধ্যেই ঘুরাঘুরি করিতে থাকেন । অসময়ের বিবাহে, অকালে ও অল্পবয়সে সন্তানসন্ততির উৎপত্তি হওয়ায় পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যার আয়ুর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে ও দুর্বল এবং ক্ষীণকায় সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইতেছে । অসহায় অবস্থায় পরিজনবর্গের বৃদ্ধি হওয়ায় সকলেই দরিদ্রতারূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন । সন্তান-সন্ততিগণকে উপযুক্ত-রূপে শিক্ষা দানাদির জন্য রীতিমত ব্যয় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । এই প্রকারে ও কারণে সংসারে দরিদ্র ও অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে । এই সব বিষয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগের কার্য্য করা কর্তব্য । এইরূপ বিষময় ফলজনক বিবাহদান কখনই পিতা বা মাতার পক্ষে কর্তব্য নহে, বরং এইরূপ কার্য্য পুত্রের ও পরবংশের এবং দেশের অশেষ অমঙ্গল ঘটাইতেছে । এই বিবাহ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন পুরুষের বিবাহ করাই কর্তব্য নহে, কিন্তু তৎসহ যদি আপন স্বভাব ও চরিত্রকেও দৃঢ়তর করিয়া রাখিতে পারেন তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই । এই সময়ের পূর্ব্বে তিনি অবশ্যই উপায়ঃক্ষম হইয়া কিছু না কিছু সংস্থানও করিয়া লইতে পারিবেন এবং আপন স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়া দীর্ঘায়ুঃ

দীর্ঘায়ুঃ হইতে থাকিবে এবং উপযুক্ত পিতার নিকট উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, তদ্বারা নিজবংশের, সমাজের ও দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে থাকিবে । যাঁহার উপযুক্ত বয়স ও সংস্থান না হয়, তাঁহার বিবাহ করাই সম্পূর্ণ অন্যায্য, এইরূপ বিবাহে অশেষ অমঙ্গল ও নানাপ্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা । আমাদের দেশে পিতৃগণের কর্তব্য যে, তাঁহারা যেন আপন আপন অসহায় পুত্রের বিবাহ দিয়া নানাপ্রকারে অশেষ অমঙ্গলের কারণ করিতে না থাকেন এবং কোন স্কুমারমতি সুবোধ বালকও যেন অল্প বয়সে ও আপন অসহায় অবস্থায় কোন প্রকারেই বিবাহ না করেন । যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এমন কি আজীবন যিনি আপন কামেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং বীর্যক্ষয় বা অপব্যয় না করিবেন তিনিই আজীবন সুস্থ শরীরে থাকিয়া দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারিবেন ইহাই শাস্ত্র ও ব্যবস্থা । কেহ কোন অপরের উপর অত্যাচার করিলে যেমন ইহকালে ও পরকালে তাহার প্রতিফলস্বরূপ দণ্ডাধীনে আসিতে হয় ও হইবে তেমনই যিনি আপন শরীরের প্রতি যে প্রকারে যতই অত্যাচার করিতে থাকিবেন তাঁহার শরীর তত শীঘ্রই জরাগ্রস্ত হইয়া পতন হইবে ।

✓ ৮। বিবাহ পুরুষের পক্ষে যেমন, স্ত্রীলোকের পক্ষেও তেমনই । স্ত্রীলোকের পক্ষেও নিতান্ত বাল্যাবস্থায় বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য ও অনুচিত । অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় ও তৎকালীক স্বামীসহবাস দোষে অথবা স্বামীর প্রারম্ভেই গর্ভধারণে স্ত্রীলোকের আয়ুঃ অতি শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায় এবং তৎকালীক

গর্ভজাত সন্তান সন্তুতিগণও অতিশয় দুর্বল এবং ক্ষীণায়ুঃ হইয়া থাকে, কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইবার পর বিবাহ হইলে আর সে দোষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না । দ্বীলোকের অন্ততঃপক্ষে ১৬ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হওয়া কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে । এই সময়ের মধ্যে বালিকাগণের ভবিষ্যৎ-জীবনের পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা পিতা ও মাতার অবশ্য কর্তব্য । উক্ত সংখ্যা ১০।১২ বৎসর বয়স হইতে বালিকাকে তাহার ইচ্ছামত উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিতে দেওয়া অথবা মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ বা ঘৃতদুগ্ধ নির্ম্মিত পুষ্টিকর দ্রব্য ইচ্ছামত ভক্ষণ করিতে দেওয়া নিষেধ । তাহার শরীর যাহাতে শীঘ্রই ফুষ্টপুষ্ট হইয়া না পড়ে, বরং যাহাতে রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া থাকে, তদনুসারে তাহার আহারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । বালিকার শরীর এই প্রকারে রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া থাকিলে বিবাহের পর, প্রথমে অবশ্যই পুত্রবতী হইয়া পুত্ররূপ ধনলাভ করিতে পারিবেন । বালিকার শরীর বলিষ্ঠ ও বলবান হইয়া থাকিলে তাহা আর ঘটে না, প্রায় কন্যাই জন্ম হইয়া থাকে । আমাদের দেশে কেহই এই নিয়মের দিকে বিবেচনা না করিয়া আপন আপন অনুঢ়া কন্যাগণের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠন করেন না বলিয়াই প্রথম অবস্থাতেই সেই কন্যাগণ অধিকাংশ স্থলে পুত্রের মাতা না হইয়া কন্যার মাতা হইয়াই থাকেন, ক্রমে ২।১ কি ৩।৪ গর্ভের পর তাঁহার শারীরিক শক্তির হ্রাস ও শরীর কৃশ হইলে তিনি পুত্রবতী হন, এই জন্মই আমাদের দেশে বিশেষতঃ ভদ্রসমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । অনেকে উপযুক্ত পাত্রের অভাব জনিত কারণে

যথা সময়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেই বালিকার শারীরিক গঠনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা কর্তব্য, নচেৎ কন্যাগণ হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া যাওয়ায় নানাপ্রকার অনিষ্টকর ও অস্বাস্থ্যকর ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া এমন কি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আপন শারীরিক সর্বলতাপ্রযুক্ত কামদেবের যুদ্ধে পরাজয়ী হইয়া গিয়া ঈশ্বর সমীপে অসতী হইয়া পড়েন এবং লাজ, লজ্জা, কুল ও শীল, সকলই নষ্ট করিয়া বসেন, কেহ বা মনাগুণে দগ্ধ হইতে থাকেন। এই কামদের সর্বলের নিকট প্রবল এবং দুর্বলের নিকট ক্ষীণবল হইতেছে, ইহার মহিমা ও শক্তি সকলই বিপরীত। বালিকার ১০।১২ বৎসর বয়সক্রমের পর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিবাহকাল পর্য্যন্ত তাহার শরীরকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া রাখা এবং তাহাকে যথাসাধ্য মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের কার্যে অর্থাৎ রন্ধনকার্য্য, শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষার কার্য্যে সতত নিমগ্ন করিয়া রাখা পিতা ও মাতার প্রধান কর্তব্য এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৯। আজ কাল ছেলে ও মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে এতদূর অবিচার ও অনাচার হইয়া উঠিয়াছে যে, কেহ কোন প্রকারে ভাল, মন্দ এবং কেহ কাহারও ভবিষ্যৎও ভাবিতেছেন না। অনেক ছেলে আপন অর্থাভাব প্রযুক্তই হউক, অথবা শ্বশুর মহাশয়ের সাহায্য পাইবার আশাতেই হউক, কিম্বা অন্য কোন আশাতেই হউক, বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিয়া থাকেন, কিম্বা কেহ আপন আদরের কন্যাকে বিবাহ দিয়া

দূরদেশে বা বিদেশে কি পল্লিগ্রামে স্বামীর আনয়ে পাঠাইতে না পারিয়া আপন গৃহেই রাখেন । ইহারা মনে মনে আপন আপন বুদ্ধির গরীমায় মত্ত থাকিয়া সুখে থাকিবার কল্পনাই করিতে থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে ইহার পরিণামফল অত্যন্ত মন্দ ও শোচনীয় হইয়াই পড়ে । অবোধ বালিকা পিতা ও মাতার ক্ষণস্থায়ী স্নেহে অজ্ঞান হইয়া গিয়া আপনার পূজনীয় স্বামীর প্রতি কিছু মাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া আপন চিরস্থায়ী স্নেহের প্রতি অবহেলা করিয়া বসে, অবশেষে স্বামীর অবাধ্য হইয়া গিয়া স্বামীর অধীনা হইয়া থাকিবেকি স্বামীকেই অধিকারে রাখিবার বাসনা ও চেষ্টা করে ; এই প্রকারে এইরূপ অধিকাংশ জামাতা নিতান্ত হতাদর হইয়াও আপন স্বশুভ্রালায়েই বাস করেন, কাহারও তাহা অসহ্য হইয়া যাওয়ায় তিনি আপন সুখের আনয়কে কলহ ও দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ করিয়া নিয়ত মনকষ্টেই কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং সেই অসুখে ও মনের ক্ষোভে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়া সতত চিন্তা করিতে করিতে আয়ুঃক্ষয় করিয়া বসেন, কিম্বা কেহ আপন সেই নির্বোধ স্বশুভ্র ও স্বাশুভী এবং দুর্মতি বনিতাকে বিরহানলে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া স্থানান্তরিত হইয়া যান । এই প্রকার বিবাহে স্বামী, স্ত্রী, স্বশুভ্র ও স্বাশুভী কাহারও কোনই সুখ নাই । এইরূপ বিরহ ও বিচ্ছেদকালে উৎপন্ন সন্তান ও সন্ততির পরিণামও মন্দ হইয়া থাকে । আমাদের মধ্যে এই বিবাহের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি না হয় ততই সমাজের ও দেশের মঙ্গল । পিতা ও মাতা প্রথম অবস্থায় কন্যার সামান্য ও মিথ্যা সুখ বা সচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য করেন

কিন্তু পরে সেই কন্যা যে পূজনীয় স্বামীর নিকট অপ্রিয় হইয়া গিয়া আপন ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়া বসেন তাহার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন না, স্ত্রীর বিচ্ছেদে স্বামীর যে অশেষ অমঙ্গল ঘটয়া থাকে, তাহাও এইরূপ জামাতাগণ বুঝিবার জন্ম আপন হিতাহিত জ্ঞানকে একবারও মনে স্থান দেন না । যে কার্যের পরিণামফল সচরাচর অথবা অধিকাংশ স্থলে মন্দই হইয়া উঠে তাহার পোষকতা করা বা তদনুরূপ কার্য্য করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে ।

১০ ।- মনুষ্য মাত্রেই স্ত্রী-সহবাসের নিয়ম প্রতিপালন করা নিতান্ত কর্তব্য । ঈশ্বর জগতে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের উন্নতি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তজ্জন্মই জীবে কামের-শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বীর্জ ও রজঃ আমাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন । বীৰ্য্য ক্ষয় না হয় ও বীৰ্য্যের অপব্যয় না হয় এবং যাহাতে বীৰ্য্য নষ্ট না হয় তাহার জন্ম সর্ববশান্ত্রেই মনুষ্যের প্রতি নিষেধ আজ্ঞা রহিয়াছে ও তাহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । কেবল মাত্র ঈশ্বর আজ্ঞার নিয়ম অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর সহবাস ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকারে হউক না কেন, বীৰ্য্যপাত করিলেই বীৰ্য্যের অপব্যয় ও নষ্ট করা হইবে, এই নিমিত্ত অন্য স্ত্রী-সহবাস, হস্ত মৈথুন ও অস্বাভাবিক গমন মহাপাপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই সব কারণে শারীরিক শক্তির হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটে, আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায় । বীৰ্য্য দুর্বল হইয়া গিয়া দুর্বল ও ক্ষীণায়ুঃ সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইতে থাকে । কেবল এই সব কারণেই

যে বীর্য্যের ক্ষতি করিলে শারীরিক অনিষ্ট, বংশগত অনিষ্ট ও পাপ হয়, আর আপন বিবাহিতা স্ত্রী-সহবাসে ও যে এইরূপ অনিষ্ট বা পাপ হয় না, এমন নহে, তাহাতেও এই প্রকার অনিষ্ট ও পাপ আছে, যখন ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে বা সহবাসে জগতে মনুষ্যজাতির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিধি করিয়া দিয়াছেন, তখন যে সময়ে স্ত্রী-সহবাস করিলে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইবে না জানা যায়, তৎকালে স্ত্রী-সহবাস করাই দোষ ও বীর্য্যের ক্ষয় বলিয়া গণ্য হইবে। ঈশ্বর আপন সৃষ্টিরক্ষা ও জীব সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত তিনি জীবে এই শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্তই বৃথা আমোদ প্রমোদ ও বীর্য্য নষ্ট করিবার নিমিত্ত মানুষকে অনুমতি দেন নাই। বৃথা বীর্য্যক্ষয় ও অপব্যয় করিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই স্বাস্থ্যের ও বীর্য্যের বিঘ্ন ঘটে এবং উভয়েরই বীর্য্য দুর্বল হইয়া গিয়া আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায়। দুর্বল বীর্য্য সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইলে তাহারাও দুর্বল এবং ক্ষীণায়ুঃ হইতে থাকে, তদ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে এই নিমিত্ত অসময়ে আপন স্ত্রী-সহবাসও অন্তায় বলিয়া শাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নিয়মের অনুকরণেই ঈশ্বর মনুষ্য ব্যতীত পশু বিশেষে বৎসরান্তে ও সময় অনুসারে তাহাদের বংশবৃদ্ধির জন্ত এই কামের বেগ দিয়াছেন, তৎকালেই তাহারা অধৈর্য্য ও নির্লজ্জ হইয়া পড়ে, অল্প সময়ে অথবা অসময়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ করিয়া রাখেন, কারণ তাহারা পশু অর্থাৎ জ্ঞানহীন, মনুষ্য জ্ঞানী তত্রাচ মানুষে জ্ঞানহীন পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া ভাল ও মন্দ বিবেচনা

না করিয়া এবং সময়ের অপেক্ষা না করিয়া প্রতিনিয়ত আপন শরীরের রাজা, বাদশা, জীবনের প্রধান শক্তি, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য-সাধনের গচ্ছিত-সম্পত্তি ও তাহার আদিষ্ট সামগ্রীকে নষ্ট করিতে থাকেন, এবং আপন শরীরও জীবনের প্রধান শত্রু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা জন্য আপন ভবিষ্যতের মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিষয় না ভাবিয়া পশুর স্থায় জ্ঞানহীনতার পরিচয়সহকারে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর ব্যবহার করিয়া বসিতেছেন, ইহা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। এই নিমিত্ত জানা উচিত যে, কোন্ সময়ে স্ত্রী-সহবাস করিলে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইতে পারে ও কোন্ সময়ে হইতে পারে না, এই জ্ঞানই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্ত্রী-লোকের মাসিক ঋতুর প্রারম্ভ হইতে ১৬ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভধারণের শক্তি থাকে, তাহার পর আর থাকে না; সেই ১৬ দিবসের পর স্ত্রী-সহবাস অন্তায়। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া ঈশ্বরের পবিত্র বিধি ও ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করা ও আপন স্বাস্থ্যের এবং জীবনের অশেষ অমঙ্গলজনক ঘটনায় লিপ্ত হওয়া কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সেই বীর্য্য সঞ্চিত থাকিলে আপন স্বাস্থ্যের মঙ্গল ও তদ্বারা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ুঃ সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইতে থাকিবে। যে ষোল দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের শক্তি থাকে তাহার মধ্যেও চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিকারকাল মনুষ্য শরীরের সহিত সংযোগ থাকা বশতঃ শরীরের গতি অনুসারে তাহাদেরই অকালে বা অশুদ্ধ সময়ে স্ত্রীসহবাস নিষেধ, তাহার গুণে সন্তান সন্ততি-

গণের উৎপত্তির ফল নিতান্তই মন্দ ; তন্নিমিত্ত শরীরতত্ত্ব শাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বা বিধি আছে তাহা প্রতিপালন করা বুদ্ধি-মানের কার্য্য । কামরূপী শত্রুর অধিকারে বশীভূত হইয়া ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিয়া স্ত্রীসহবাসের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়ের প্রতি বিবেচনা না করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে ; ইহার ফল নিতান্তই মন্দ । মাংসাশী ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার অধিকার বেশী, বিশেষতঃ আমাদের দেশে গো মাংস ভোজীগণের মধ্যেই ইহার ক্ষমতা অধিক, এই নিমিত্তও এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গো মাংসভোজী ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততির পরিণামফল নিতান্তই শোচনীয় । শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে দিবা-ভাগে স্ত্রীসহবাস নিষেধ, রাত্রে স্ত্রী বা পুরুষ অথবা উভয়ের মধ্যে কাহারও উদর পূর্ণ থাকাকালে সহবাস অনুচিত, স্ত্রীর নিদ্রিতাবস্থায় সহবাস অকর্তব্য । স্ত্রীআচারের প্রথম চারি রাত্রে সহবাস একবারেই নিষিদ্ধ । স্ত্রী বা পুরুষের উভয়ের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার জ্বর আদি পীড়িতাবস্থায় সহবাস অকর্তব্য । সহবাসকালে উভয়ের মধ্যে কাহারও বাক্যালাপ অবিধি । পশ্চিম শিয়রে সহবাস অন্ত্যায় । রাত্রির ১ম, ২য়, ৩য় প্রহরের মধ্যে স্ত্রীসহবাস কর্তব্য নহে । সহবাস কালে শয়নাগারে আলো থাকা উচিত । ঐকান্তিক প্রেম ও আন্তরিক ভালবাসার সহিত স্নেহালিঙ্গন ও চুম্বনাদি সহকারে স্ত্রী সহবাস অবশ্য কর্তব্য, ইহা দর্শনে খোদাতালার ফেরেস্তাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না ; এতদ্বারা সন্তান ও সন্ততিগণও ভাগ্যবানই জন্ম হইয়া থাকে । সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য

গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত মনুষ্যশরীরের বিশেষ যনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তজ্জন্যই তাহারা আপন আপন ক্ষমতা বা গুণ অনুসারে মনুষ্যশরীরে অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে অনেকের অধিকারকালীন ফল ভাল ও অনেকের মন্দ; তাহাদের পথচক্রের স্থান ও সময় অনুসারে এবং অন্যান্য গ্রহ বা উপগ্রহের সম্মিলনে, যে ভাল সে মন্দ হইয়া যায় এবং যে মন্দ সেও ভাল ফল দিয়া থাকে; সেই কারণে সূর্য্য, চন্দ্র বা অন্যান্য অশুভ গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিকারকালে মনুষ্যশরীরে নানা প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটে ও তৎকালে স্ত্রীসহবাসফলে সম্ভূত সমুত্তির উৎপত্তি নিতান্ত অমঙ্গল জনকই হইয়া যায়। এই কারণে চন্দ্রের তিথি অনুসারে অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস একবারেই নিষেধ, তাহার ফল বড়ই মন্দ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ত্রী আচারের প্রথম চারি দিবস বাদে অবশিষ্ট বার দিবস মধ্যে ঋতুর ৭ম, ১১শ ও ১৩শ রাত্রে স্ত্রীসহবাস অন্যায়, তাহার ফল মন্দ। আবার কেহ বলেন ৫ম ও ৬ষ্ঠ রাত্রির সহবাস ফলও মন্দ, অতএব ধরিতে গেলে স্ত্রীলোকের ঋতুর ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ রাত্রির সহবাসফল উৎকৃষ্ট, আবার অপর কেহ বলেন, ৪র্থ ও ১১শ রজনীর সহবাস ফলও উত্তম। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকের ঋতুর প্রথম তিন রাত্রি ও ৭ম রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস একেবারেই নিষেধ, তদ্ব্যতীত ১ম মতে ৪র্থ, ১১শ ও ১৩শ রাত্রিরও সহবাস নিষেধ করিয়াছেন এবং ২য় মতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্দ বলিয়াছেন, এক্ষণে হিসাব করিতে গেলে স্ত্রীলোকের ঋতুর

১৬ দিবসের মধ্যে ১১২৩৪৫৬৭ ও ১১১৩শ রাত্রে সহবাস নিষেধ এই ৯ রাত্রে সহবাসফলে উৎপন্ন সন্তান সন্ততির পরিণামফল যে নিতান্তই মন্দ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রাত্রে মধ্যেও প্রথম তিন প্রহর রাত্রিতে সহবাস অবিধি বলিয়া পূর্বেরই বলা হইয়াছে, শেষ রাত্রে সহবাসফল অতি উৎকৃষ্ট ও শুভ ফল প্রদায়ক। এই শেষ প্রহর রাত্রিতে যে কার্যই করা হউক না কেন, তাহার ফল অত্যন্ত শুভ বলিয়া সর্বশাস্ত্রেই রহিয়াছে। এই সময়ে আরাধনা, উপাসনা, প্রার্থনা ও অধ্যয়ন সকলই শুভ বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই শেষ প্রহর রাত্রে যদিও কেহ কোন কার্য না করে, কিন্তু নিদ্রা না গিয়া কেবল জাগরণেরও অভ্যাস করে, তাহাতেও অশেষ ফল আছে, আয়ুঃ বৃদ্ধি হইবে ও শরীর নিরোগী হইবে, আরাধনা বা উপাসনাতে অসংখ্য সওয়াব অর্থাৎ পুণ্য, এই নিমিত্তই এই সময়ে তাহাজ্জুদের নমাজে অশেষ ফল বলিয়া আমার পবিত্র ইসলাম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছে। এই শেষ প্রহর রাত্রির উপকার ভোগ করিবার জন্য খোদাওন্দ করিম আপন পবিত্র কলাম মুজিদে বলিয়াছেন—

আরবি।

“কুমিল লয়লা ইল্লা কলিলন নিসফছ

আভিন কুসমিন হো কলিলন”

ইহার অর্থ এই যে, রাত্রে উঠ, কিন্তু কম, সমস্ত রাত্রি নহে, শেষ রাত্রির অর্দ্ধেক সময়। এক্ষণে বুঝা আবশ্যক যে, এই শেষ

রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ করিবার অভ্যাস করিবার জন্য যখন ঈশ্বরের আদেশ রহিয়াছে, তৎকালে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া যে কার্য্য করা হইবে তাহাতে ঈশ্বর অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহাতে অবশ্যই শুভফল হইবেই হইবে, তবে তাহা অসৎ বা পাপকার্য্য না হওয়াই আবশ্যক । এই শেষ রাত্রে উঠিবার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে আছে—

সংস্কৃত ।

“ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠ ।”

ইহার অর্থ এই যে, শেষ রাত্রে উঠিবে । এই সব কারণে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, শেষ রাত্রের সময় অত্যন্ত প্রশস্ত সময়, এই সময়ে যে সৎকার্য্যই করা হইবে তাহার ফল অবশ্যই শুভ হইবেই হইবে । এই নিমিত্ত শেষ রাত্রির স্ত্রীসহবাস ফলও উৎকৃষ্ট এবং শুভ ফলদায়ক । এই সহবাস সম্বন্ধে আরও যে যে নিষেধ আজ্ঞা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ করিয়া গিয়াছেন তাহাও প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যক । স্ত্রী ও পুরুষ সতত এক শয্যায় শয়ন অনুচিত । বাহ্যের বেগ ধারণ করিয়া সহবাস অকর্তব্য । সহবাসকালে উভয়ের মনোমধ্যে প্রণয়, অনুরাগ ও একান্ত কামনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক । কাহারও কোন প্রকার অনিচ্ছা, অভক্তি, শোক বা চিন্তা থাকিলে তৎকালীন সহবাসফলে উৎপন্ন সন্তান সন্ততির পরিণামফলও মন্দ হইয়া থাকে । কেতাবে আছে, স্ত্রী সহবাসের আরম্ভ কালে বাউজু থাকা আবশ্যক ও এই দোয়া পাঠ করা কর্তব্য ।

আরবি।

“বিসমিল্লা, হের রহমঁ, নের রহীম,
বিসমিল্লা হিল অলি ইল অজ্জীম,
অল্লাহো অকবর, অল্লাহো অকবর”

ইহা পাঠের পর “সুরায়ে অখলাস” পাঠ করা আবশ্যিক ও তৎসহ
এই দোয়া পাঠ করা কর্তব্য।

আরবি।

“অল্লাহুমা জন্মেবনশ
শয়তানা ও জন্মেবিশ
শয়তানা মিন্মা রজ্জকনা”

সহবাসকালে স্ত্রীর রজঃ নির্গমণের প্রতিক্ষায় শীঘ্র বীৰ্য্য পাত
হইতে না দিয়া কিছুক্ষণ বীৰ্য্য ধারণ করা কর্তব্য। স্ত্রীসহবাস
পরেই দুগ্ধ বা ঘৃতপক্ক সুমিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ এবং স্নান বিধি,
নচেৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টের আশঙ্কা। স্বপ্নবিকারের
পরও এই বিধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তবে রোগীর পক্ষে নহে।
স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের পূর্বে, মধ্যে ও পরে কখন অস্বাস্থ্যকর
ও অনিষ্টকর দ্রব্য এমন কি শাক ও বেগুন আদি অপরিষ্কার
দ্রব্য ভক্ষণ করিতে না দেওয়াই কর্তব্য, তদ্বারা প্রসূতি ও
গর্ভস্থিত শিশু উভয়ের পক্ষে মঙ্গল, সন্তানের বর্ণও মলিন হইয়া
যায়। সতত গর্ভাবস্থায় ঘৃত, দুগ্ধ, সুমিষ্ট ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাইতে
দিলে উভয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল এবং গর্ভস্থিত শিশুসন্তানের
বর্ণও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে অলস হইতে

দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে । অলস হইয়া পড়িলে প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয় । এই নিমিত্ত প্রাত্যহিক যৎ সামান্য পরিশ্রমে কাতর হওয়া অনুচিত । গর্ভসঞ্চারের পর এক বৎসর অর্থাৎ প্রসবের পর পুনরায় স্ত্রী আচার প্রকাশ পাইলে সহবাস বিধি নচেৎ অন্যায়, অবিধি এবং নিষেধ । কোন স্থানে যাত্রার পূর্বের সহবাস কর্তব্য নহে । এই এক মাত্র স্ত্রী সহবাস বিধির অনিয়ম দোষে ও তৎকালীন অশুভ গ্রহ ও নক্ষত্রের ক্ষমতাবলে সন্তান সন্ততির ভাগ্যের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং শারীরিক অমঙ্গলজনক ফল বর্ত্তিয়া থাকে ; সেই প্রকার শারীরিক ফলের দোষেই লোকের বংশগত দোষ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং এই কারণেই অনেকের সন্তান সন্ততি অসৎ চরিত্র, হতভাগ্য, হতবুদ্ধি, দুঃখী, ক্ষীণায়ুঃ, দীর্ঘায়ুঃ, অন্ধ, খঞ্জ ও রোগী জন্ম হইয়া থাকে । এই সব দোষেই বিদ্বান ও ভাগ্যবান ব্যক্তির ঔরসে হতবুদ্ধি ও হতভাগ্যাদি দোষ বিশিষ্ট পুত্র ও কন্যার জন্ম হইয়া থাকে এবং এই স্ত্রী সহবাসের নিয়মের গুণ অনুসারে ও তৎকালীন শুভ গ্রহ ও নক্ষত্রাদির ক্ষমতা বলেই অশিক্ষিত ও দরিদ্রের ঔরসে বিদ্বান ও ভাগ্যবানাদি গুণ বিশিষ্ট সন্তান সন্ততির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই সব কারণেই মনুষ্য জীবনের মধ্যেও নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । এই জন্যই স্ত্রী সহবাসের নিয়ম প্রতি পালন করিবার নিমিত্ত জ্ঞানি ব্যক্তিগণ এই সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্যকর প্রত্যেক বুদ্ধিমানব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । মওলানা সাহি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“বখ্ত দওলৎ বকার দানী নেস্ত

জুজ বতাইদ আসমানী নেস্ত”

ইহার অর্থ এই যে, ভাগ্য ও ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না ; কেবল মাত্র আসমান অর্থাৎ আকাশের সাহায্য ব্যতীত কেহ তাহা প্রাপ্ত হয় না । আসমান অথবা আকাশ, মস্তকোপরি শূন্যস্থানকেই বলা যায়, কিন্তু শূন্য স্থানের অর্থ কিছুই নহে, অতএব ইহা শূন্যস্থানকে না বুঝাইয়া শূন্য মার্গস্থিত গ্রহ ও নক্ষত্রাদিকেই বুঝাইতেছে । এই গ্রহ নক্ষত্রাদিগণ কি প্রত্যহ আমাদের সাহায্য করিয়া থাকেন, অথবা ভাল কি মন্দ করিয়া থাকেন, তাহা নহে । খোদাওন্দ করিম তাহাদিগকে মনুষ্যের উপর যাহার যেমন ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে মনুষ্য জাতির জন্ম কালীন সময়ের গুণেই আজীবনের ফল প্রদান করিতে থাকেন, অতএব যথা সময়ে, যখন যাহা হইবার থাকে ঠিক তাহাই হইয়া থাকে । গ্রহ ও নক্ষত্রগণও চন্দ্র সূর্যাদির ন্যায় যে যার আপন আপন পথে নিয়ত ঘুরিতেছে তদনুরূপ যে পৃথিবীতে আমরা জন্ম গ্রহণ করিতেছি ও বাস করিতেছি সেই পৃথিবীও তাহাদের ন্যায় পরস্পরের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা সংযোজিত হইয়া ঘুরিতেছে, এইরূপে তাহাদের পরস্পরের সহিত যে আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে সেই শক্তির বলেই কাহারও কোন বিঘ্ন ঘটিতেছে না । পৃথিবীর সহিত আকর্ষণী শক্তির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই পৃথিবীস্থিত

যাবতীয় পদার্থের সহিত সমূহ গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্র, সূর্য্য আদি, সকলেরই বিশেষ সম্বন্ধ আছেই আছে । ইহার প্রমাণ জন্ম দেখিতে গেলে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সময় পৃথিবীস্থিত সমুদ্রের সহিত একরূপ সম্বন্ধ আছে যে তাহাতেও জোয়ার এবং ভাটা হয় অর্থাৎ ঠিক চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে জোয়ার ভাটারও হ্রাস বৃদ্ধি হয় । জ্বর ও বিকারগ্রস্ত রোগী ব্যক্তির শরীরে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায় যে অমাবস্যা বা পূর্ণিমাদি তিথিকালে জ্বরের বেগ আদৌ কমে না বরং বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, তিথির হ্রাস হইলে রোগেরও হ্রাস হয় । বাতব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তি সতত সুস্থই থাকে কিন্তু চন্দ্রের তিথি অনুসারে তাহার একরূপ জ্বর হইয়া পড়ে যে, একবারেই অজ্ঞান ও অচেতন হইয়াই থাকে, তাহার পর তিথির হ্রাস হইলে বিনা চিকিৎসাতে সুস্থ হইয়া যায় ও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে । এক চন্দ্রের সহিত যখন একরূপ সম্বন্ধ তখন অন্যান্য অপর সকলের সহিত যে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই ইহাতে সন্দেহ করা অণ্যায় বলিতে হইবে । ইহাই জগৎ পিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের অপার মহিমা, তিনি যেমন মহান তাহার ক্ষমতাও অসীম । এই সব গ্রহ নক্ষত্রাদির সেই নিয়মের অথবা ক্ষমতা বা অধিকারের গুণেই মনুষ্যের মধ্যে যাহার যখন ভাল বা মন্দ, উন্নতি বা অবনতি, ক্ষতি বা বৃদ্ধি, সুখ বা দুঃখ ও মৃত্যু ইত্যাদি যাহা হইবার হয় তাহা হইয়াই থাকে, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হয় না । এই জন্ম যেরূপ গুণ বা ক্ষমতা বিশিষ্ট গ্রহ বা নক্ষত্রের অধিকার কালে যে মনুষ্যের উৎপত্তি, তাহারই নিয়ম অথবা ক্ষমতানুসারে সেই

মনুষ্যের জীবনে অবিকল তাহাই ফলিতে থাকিবে । সাধারণে ইহাকেই অদৃষ্টের লিপি कहিয়া থাকে, তাহা কখনই খণ্ডন হয় না বলে । অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব ইহা আর কিছুই নহে, ইহা কেবল দৃষ্টির অগোচর সেই গ্রহ ও নক্ষত্রাদিকেই বুঝাইতেছে । ঈশ্বর সেই গ্রহ ও নক্ষত্র সমূহের গুণ বা ক্ষমতাকে অপরিবর্তনীয় সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কখন খণ্ডন ও পরিবর্তন হয় না এই নিমিত্ত অদৃষ্টের লিপি কখনই খণ্ডন হয় না বলিয়াই সকলে বলে । এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম যাহাতে না হয় ও সকলেই যাহাতে এই নিয়ম অনুসারেই কার্য করেন এই উদ্দেশ্যেই আমাদের জনাব রসুলে করিম দঃ আপন উম্মৎগণকে আপন আপন শক্তি ও ক্ষমতাদির উপর বিবেচনা করিয়া এক সময়ে চারি স্ত্রী পর্যন্ত পানি গ্রহণের আদেশ ও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । কি মহান উদ্দেশ্য, ধন্য মহাপুরুষের মহৎ উদ্দেশ্যকে ধন্য (প্রত্যেক স্ত্রীকে সম্যকপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে একের অধিক স্ত্রী করিতে পারা যায় নচেৎ নহে) । এই নিমিত্তই পুরাকালে মনুষ্য শক্তির আধিক্য প্রযুক্ত এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু বিবাহের জন্য ঈশ্বরের আদেশ ও ব্যবস্থা ছিল । এই সূত্রেই এখনও বিজ্ঞ ও জ্ঞানি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অর্থাৎ কুলীন ব্রাহ্মণগণের নিকট এই প্রথার ব্যবস্থা বর্তমান আছে । ঈশ্বরের এই নিয়ম ও ব্যবস্থার প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাস করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, এইরূপে এক শুভক্ষণেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধনাঢ্য ও দরিদ্রের বীৰ্য্য অসংখ্য স্ত্রী গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু সেই সব

গৰ্ভোৎপন্ন সন্তান সন্ততির জন্ম পরে, শিক্ষিত ও ধনাঢ্যের সন্তানগণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান হইতেছেন এবং অশিক্ষিত ও দরিদ্রের সন্তানগণ হতবুদ্ধি ও হতভাগা হইতেছে কেন ? ইহার কারণ কেবল শিক্ষা ও সহবাস । অশিক্ষিত ও দরিদ্রের ঔরসে শুভ নক্ষত্রের অধিকার কালে উৎপন্ন সন্তানগণ প্রায়ই সংশিক্ষা ও সংসহবাস না পাইয়া যে সহবাসে থাকে ও যাহা শিক্ষা পায় তাহারই গুণ অনুসারে অবিকল ফল প্রাপ্ত হইতে থাকে । এই শিক্ষা ও সহবাসগুণে অশিক্ষিত ও দরিদ্রের এইরূপ সন্তানগণকে অনেক স্থলে বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান দেখিতে পাওয়া যায় এবং অসংখ্য শিক্ষিত ও ধনাঢ্যের সন্তানগণ এই দোষেই বিপরীত হইয়া উঠে । এই নিমিত্ত আমার পবিত্র রসূলে করিম দঃ বলিয়াছেন :—

আরবি ।

“অস সহবতো মওসসরুন”

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি যে সহবাসে থাকে তাহাতে তাহারই গুণ অসর অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়া যায় । ইহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে । এই মর্মে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পার্সী ।

“সহবতত সালেহ তোরা সালেহ কুনদ

সহবতত তালেহ তোরা তালেহ কুনদ”

ইহার অর্থ এই যে, উত্তম সহবাসে থাকিলে উত্তম হইবে ও মন্দ সহবাসে থাকিলে অধম হইতে হইবে । ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত

চক্ষের উপরেই দেখিতে পাওয়া যায় । আপন দেশ ও পাড়া প্রতিবাসীর মধ্যে ইহার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইতে পারিবেন । অসৎসঙ্গ ও অসৎ সহবাসে থাকিয়া কত ভদ্র লোকে আপন স্বভাব চরিত্র, আচার ও ব্যবহারকে হারাইয়া দিয়া সমাজে ও সাধারণের নিকট অশেষ প্রকারে নিন্দনীয় হইয়া পড়িতেছেন এবং আবার অভদ্র লোকে ভাল লোকের সঙ্গে ও সহবাসে থাকিয়া ভাল হইয়া যাইতেছে । এই সব কারণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের মাতৃগর্ভে উৎপত্তির কাল অনুসারেই মনুষ্যের ভাগ্য ও কর্ম । ইহাতে পূর্বজন্ম বা জন্মান্তরের অধিকার কিছুই নাই । হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে অনেকেই বলেন মনুষ্য জীবের কর্মফলের পরিণামানুসারে তাঁহার সেই আত্মা পরজন্মে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয় ও পুনর্জন্ম হইয়া থাকে অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মের ফল অনুসারেই পরজন্মে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও এই নিমিত্তই অন্ধ, খঞ্জাদি ও নানা রোগগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াই জন্ম হয় অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মের ফল অনুসারেই মানুষে ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারেন না । তাঁহারা যে প্রমাণ দেখান তাঁহাদেরই মধ্যে অনেকেই আবার তাহার অলীকতা প্রমাণ করিয়া দেন ও আমার পবিত্র কোরাণ-সরিফ ও বাইবেল আদির পোষকতা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা পুনর্জন্মে আদৌ বিশ্বাস করেন না । বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও ইহার সম্বন্ধে বিস্তর মত ভেদ আছে । এইরূপে

হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের ভিতর কতক ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের ভিতর কতক ব্যক্তি ব্যতীত জগতে কোন ধর্ম্মেই ইহা বিশ্বাস করেন না । পুনর্জন্মবাদী ব্যক্তিগণ বলেন এক পিতা ও এক মাতার জন্মিত পুত্র বা কন্যাগণের মধ্যে কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কেহ অন্ধ বা কেহ খঞ্জাদি হওয়া কেবল তাহাদের পূর্ব জন্মের পাপের ভোগ ও সৎকার্যের ফলের নিমিত্তই ঘটয়া থাকে ; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তাঁহাদের ভ্রম, ইহাতে পূর্ব ও পরজন্মের সংশ্রব কিছুই নাই, ইহা কেবল জগতপাতা জগদীশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার নিয়ম অনুযায়ী মতেগর্ভে মনুষ্যের স্থানপ্রাপ্ত কালীন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির মধ্যে যাহার অধিকার কালে যাহার জন্ম, তাহারই ক্ষমতা বা গুণের কার্য্যানুযায়ী ফল হইতেছে মাত্র । ঈশ্বর মনুষ্যকে গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির পরিচয়, প্রমাণ, ক্ষমতা বা গুণের বিষয়, জানিবার নিমিত্ত সর্ববিদ্যাতেই অধিকার দিয়াছেন । মানুষে বিদ্যাবলে এই সমূহ বিষয় সম্যকরূপে জানিতে পারেন ও পারিয়াছেন । পণ্ডিতগণ আপন আপন লিখিত পুস্তকে নানা ভাষায় ইহার প্রচার ও বিস্তার করিয়া আসিতেছেন । যেরূপ বিদ্যাবলে মানুষে ঈশ্বরকে চিনিতে পারেন, সেইরূপ বিদ্যাবলে তাঁহার মহিমা ও সৃষ্টি কৌশলকে বুঝিতে পারেন, যাহারা এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই উত্তমরূপে জানিতে পারেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক কিরূপ এবং কাহার উপর কিরূপ অধিকার রহিয়াছে ও কিরূপে তাহা ঘটয়া থাকে ; তাঁহারা বিদ্যাবলে এই অধিকার বা

ক্ষমতা পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা যে প্রকারে তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । এই মনুষ্যজীবনের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, উন্নতি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত এই একমাত্র দ্বী-সহবাস বিধি রক্ষা করিয়া কার্য্য করা মনুষ্য মাত্রেরই উচিত । *

* এই পুনর্জন্মের পোষকতার হিন্দুভাষাগণ তাঁহাদের গীতা আদি পুস্তকে যে ২১০টি শ্লোক দেখাইয়া থাকেন তাহারই মধ্যে ইহার বিপক্ষবাদীগণ সেই সমূহ শ্লোকের অর্থ ও ভাব পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করেন, ইহাতে বুঝা যায় যে পুনর্জন্ম নাই । মনুষ্য জন্মের পর তাহার কার্য্যের ফল অনুযায়ী পশুজন্ম হওয়া অথবা পশু জন্মের পর মনুষ্যরূপে জন্ম হওয়া একেত ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, তাহার পর কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা প্রমাণ হইতে পারে না এবং আজ পর্য্যন্ত তাহা কেহ কোন প্রকারে প্রমাণ করিতেও পারেন নাই । আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মেও পুনর্জন্ম আছে বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নহে, আমার পবিত্র কোরাণ বা হাদিস সন্নিবিষ্ট হইতে কোন প্রমাণ দিতে পারেন না কেবল মাত্র হুজুরত মওলানা ক্রমের লিখিত গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা মওলানাক্রমের কবিতা নহে উহা মওলানা শেখ ফারদউদ্দীন অত্তারের লিখিত কবিতা ।

পাশী ।

“শশ সাদা হফতাদ কালেব দিদাআম
হমচু সবজা বারহা কহদা আম”

ইহার অর্থ এই যে ৬৭০ দেহ আমি দেখিয়াছি এবং দুর্কীঘাসের ন্যায় অসংখ্যবার আমি উৎপন্ন হইয়াছি । ইহাকেই প্রমাণ বলিয়া ইসলাম ধর্ম্মকেও দোষারোপ কুরতে ছাড়েন না । ইহা তাঁহাদের ভ্রম, ইহার ভাব তাহা নহে । লেখক মহাশয় একজন মহা সাধু ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তিনি আপনার যোগ বিদ্যা ও সাধনার অবস্থাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । যোগবিদ্যা অনুসারে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধনা করতে গেলে যোগীগণ প্রতি নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের বিধি এই যে, প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত না হইলেই তাঁহার জীবন যত্ন তুল্য বলিয়া গণ্য, তাহার পর পুনরায় ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইলেই তাঁহার পুনর্জন্ম হইল বলিয়া ধর্তব্য হইবে । লেখকের এই কবিতাটি লিখিবার ভাব এই যে, আমার সাধনা করিবার আরম্ভ কাল হইতে বলিবার সময় পর্য্যন্ত ৬৭০ বার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি । কোন বিষয়ের সাধনা কালে শীঘ্র ও সহজে তাহা সাধনা বা অন্ত্যস্ত হয় না, অনেকবার ভুল ও

১১। মাতৃগর্ভে পুত্র বা কন্যার জন্ম ঈশ্বরাধীন কার্য্য, ইহাতে কাহারও কোন অধিকার নাই ; তবে মাতা অপেক্ষা পিতার বীৰ্য্য বলবান হইলে পুত্র ও পিতা অপেক্ষা মাতার রজঃবলবতী হইলে কন্যার জন্ম হইয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেন এবং অধিকাংশ স্থলে পরীক্ষাতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায় ; এই জন্য বীৰ্য্যের সবলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা পুরুষ মাত্রেই কর্তব্য । আবার কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন অন্ধকার পক্ষে সন্তানের উৎপত্তি হইলে পুত্র হয় ও যোৎস্না পক্ষে হইলে কন্যা হয় । সন্তান উৎপাদন পক্ষে নিয়মিত পরিশ্রম, পরিমিত আহার ও স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ এবং বীৰ্য্যের অপব্যয় যাহাতে না হয়, এই সব নিয়ম রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যিক । সন্তান হইলে সাধারণ লোকে কেবল সন্তানের শিক্ষার জন্যই চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ততির শিক্ষার নিমিত্ত আদৌ বিবেচনা করেন না, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অশ্রায় ।

জানিত হইয়াই যায়, তদনুসারে তাঁহার সাধনাত যতবার দোষ ঘটয়াছিল তাহাই তিন ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । ধরিয়া লওয়া হৃদক যাদও তাঁহার এতাব ছিল না, তবে তিনি কি প্রকারে স্বঠিক সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছিলেন ? এবং অন্য কোন ব্যক্তি ও তদনুরূপ কোন কথা বলেন না কেন ? এই ৬৭০ জীবনে তাঁহার কত কি পরিবর্তন হইয়াছিল তাহারও কিছু আভাস দিলেন না কেন ? প্রত্যেকবারে কি তাঁহার মনুষ্য দেহই হইয়াছিল কি কোন প্রকার দেহান্তর হইয়াছিল তাহারও কিছু বর্ণনা করিলেন না কেন ? কেতাবে আছে হজরত আদমের পর ৬৭৫০ বৎসর পরে জনাব রহুলে করিমের দঃ জন্ম হয়, ইনি যদি প্রত্যেক বারে মনুষ্য জন্মই পাইয়া ছিলেন তবে কোন সময় হইতে কোন সময়ের মধ্যে অর্থাৎ কত বৎসরের মধ্যে এতবার তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল । মুহাতুলা নিদ্রিতাবস্থায় অলৌক স্বপ্নে কাহারও কোন ঘটনা ঘটয়া গেলে তাহা তাঁহার আজীবন পর্যন্ত স্মরণ থাকে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্বজন্মে দীর্ঘকালব্যাপী জীবদ্দশায় কাহার কি ঘটয়াছিল পরজন্মে কাহারও কি স্মরণ থাকা সম্ভব নহে ? একাল পর্যন্ত কেহ কি এ বিষয়ে কোন একটা

বাল্যকালে পিতা ও মাতার দ্বারা সন্ততিগণ শিক্ষা না পাইলে অথবা শিক্ষার আশ্বাদ না পাইলে তাহারা অশিক্ষিতাই রহিয়া যায় । পুত্র ও কন্যা উভয়কে শিক্ষা দেওয়া পিতা ও মাতার প্রধান কর্তব্য । সন্তানগণ শিক্ষিত হইলে যেমন জ্ঞান লাভ করিয়া উপায়ক্ষম হইতে পারে তেমনই সন্ততিগণও শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান ও সন্ততিগণও তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক শিক্ষিত বা শিক্ষিতা হইতে পারিবে । মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তান ও সন্ততিগণ বাল্যকালে যে প্রকারে জ্ঞান ও শিক্ষা পাইতে পারে, মাতা অশিক্ষিতা হইলে তাঁহার সন্তান বা সন্ততিগণের প্রতি তদ্রূপ আশা করিতেই পারা যায় না, এই নিমিত্ত স্ত্রী শিক্ষা আমার শাস্ত্রে ফরজ হইয়াছে । বালক ও বালিকাগণের শিক্ষা যেমন পিতা ও মাতার পক্ষে

প্রমাণ দিতে পারেন ? ইহাই অবিশ্বাসের প্রধান কারণ । ঈশ্বর আপন সৃষ্টিকৌশলের নিয়ম অনুসারে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও তারা নক্ষত্রাদি সৃজন করিয়াছেন তাহাদের উপর এই সংসারের এবং এই সংসারের উপর তাহাদের প্রত্যেকের অধিকার কাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী এই সংসারস্থিত প্রত্যেক জীবজন্তুর ভাল ও মন্দে সঞ্চক্ষে তাহাদের ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন । যে কালে যাহার যেকোন ক্ষমতা, সেই সময়েই মনুষ্যের উৎপত্তি হইলেই সেই মনুষ্যকে সেই নক্ষত্রের ক্ষমতা অনুসারেই পরিচালিত হইতে হয় অর্থাৎ তাহার গুণ অনুসারেই যখন যাহা হইবার হয় তখন তাহার তাহাই হইয়া থাকে । এই প্রণালীতেই মনুষ্যের ভাল বা মন্দের কল ঘটে । ঈশ্বরের এই নিয়মের গুণেই মনুষ্যের একই গুরুত্ব ও গর্ভ নানাপ্রকার গুণ ও দোষ বিশিষ্ট ভাল ও মন্দ, সবল ও দুর্বল, বিদ্যান ও মূর্খ, ভাগ্যবান ও হতভাগ্য ক্ষীণায়ু ও দীর্ঘায়ু, অন্ধ ও ব্ধ, ধনি ও নির্ধন, আদি প্রকারের সন্তান ও সন্ততির উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা পূর্বজন্মের কার্য বা ফলাফল নহে । ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে অথবা তাঁহার অসীম গুণ বা ক্ষমতায় এমন কোন দোষ বা অভাব নাই যে, তিনি একটি জীব বা আত্মা লইয়া নিরত তাহাকেই নাড়া চাড়া করিতেছেন । তিনি অসীম ক্ষমতামণ্ডলী, তিনি এক সময়ে একটি জীব বা আত্মাকে যখন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তদনুসারে জ্ঞানও যে তিনি নিত্য নিত্য অসংখ্য জীবের সৃষ্টি

কর্তব্য, তেমনই তাহাদের শৈশবাবস্থায় সুন্দররূপে লালন ও পালন তদপেক্ষা আরও অধিক কর্তব্য, কারণ শৈশবকাল ভবিষ্যৎ জীবনের দেহ গঠনের ভিত্তি স্বরূপ। সন্তানের জন্মের পরে তাহাকে মাতৃ স্তন্য পান করিতে না দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত, স্তন্য পান করিলে মাতার স্বাস্থ্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্যে পুনরায় সন্তান বা সন্ততির জন্ম হইলে তাহারা ক্রমে দুর্বল হইতে থাকে। সন্তান, সন্ততিগণ মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকিলে মাতৃগণ মমতা বশতঃ শীঘ্র স্তন্যপান ত্যাগ করাইতে পারেন না, শীঘ্র স্তন্যপান ত্যাগ না করিলে অর্থাৎ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে থাকিলে সন্তানের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল বলিয়া অনেক অবোধ ব্যক্তি ভাবিয়া থাকেন কিন্তু উহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। স্বাস্থ্য ভাল হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু তদ্বারা বালক, বালিকার বুদ্ধি বৃদ্ধি আদৌ তীক্ষ্ণ হয় না,

করিতে না পারিবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? অথবা তিনি যে সমূহ জীবই এককালীন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া না দিয়াছেন তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও বৃষ্ট ধর্মের মত এই যে, সমূহ জীবাত্মাই এককালীন সৃষ্টি হইয়াছে। বাহা ইউক প্রত্যেক ধর্মই স্বীকার করেন যে ইহকালের পর পরকাল আছে। পরকালে ঈশ্বর অনুব্যক্তির ইহকালের কার্যের বিচার করিবেন, কিন্তু যদি ইহকালের কার্যের ফল অনুযায়ী ভাল বা মন্দ রূপে তাহার পুনর্জন্মই হইয়া যায় তবে আর পরকালের প্রয়োজন কি? তবে ইহা হিন্দু মহোদয়গণের গীতা আদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টি শৃঙ্খলতা হেতু শাসন আজ্ঞা মাত্র; তাহা না হইলে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মত ভেদ হইত না ও গীতাকার পণ্ডিতগণ অবশ্যই আপন পুস্তকে ১০১২০ জনের পূর্বজন্ম ও পর জন্মের সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতে পারিতেন। কেহ কোন অপরাধ করিয়া সেই অপরাধ জন্ত দণ্ড ভোগ করিলে সহজেই সে বুঝিতে পারে যে, এই কার্য্য এই ফল হইয়া থাকে, বা হইয়াছে; তাহা না হইয়া যদি কেবলমাত্র মন্দ বা অসৎ কর্ম জন্ত এইরূপ ফল হইবে বলিয়া পুঁথিতেই থাকে অথচ কেবল বিবেচনা বাতিল তাহা কেহ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিতে বা বুঝিতে না পারে, তবে সেই পুঁথিপত

একবারেই জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যায়, এই কারণেও সাধারণ সমাজে অধিকাংশ ছেলে গণ্ড মূর্থ হইয়া পড়ে । কোন প্রকার সুধাপানেরও আধিক্য হইলে যেমন বিপরীত ফল দেয় তদ্রূপ মাতৃ দুগ্ধপানের আধিক্যেও সন্তান সন্ততিগণের প্রতি তদনুরূপই ফল দিয়া থাকে । মাতা স্তন্য পান করাইলে শীঘ্র স্তন্য ত্যাগ করাইতে পারিলে মঙ্গল নচেৎ অমঙ্গল । শৈশবকালে বালক, বালিকাগণের পক্ষে গো দুগ্ধ অশেষ উপকারী ও সুস্বাস্থ্য-কর, অথবা অন্য একটা প্রসূতি নিযুক্ত করিয়া ছেলেকে তাহার স্তন্য দুগ্ধ খাওয়াইবার বিধিও রহিয়াছে, তাহারা সহজেও শীঘ্র ছেলেকে মাই খাওয়ান ত্যাগ করাইতে পারিবে, সে বেতনভোগী চাকরাণী মাত্র, ছেলের সহিত তাহার মায়া ও মমতা কিসের । এই প্রকার প্রসূতিকে সতত আপন অধিকারে রাখা আবশ্যক, যাহাতে সে কোন প্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য খাইতে না পায় ও পীড়িত হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং সেও যেন অনিয়মিত সময়ে বা অপরিমিতরূপে ছেলেকে

বিধানের ব্যবস্থায় কাহারও কোন দোষ ত্যাগ বা কোন দোষ সংশোধনের আশা কখনই করা যাইতে পারে না ; অতএব পূর্বজন্মে কে কি মন্দকার্য্য করিয়াছিল যে তাহার জন্ত তাহাকে ইহজন্মে একরূপ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, অথবা একরূপ নিকৃষ্ট আকার বা প্রকারে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে । ইহা প্রত্যক্ষ কেহ দেখিতে না পাইলে বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে না পারিলে কোন প্রকারেই কাহারও কোন দোষ সংশোধন হইতেই পারে না । পুনর্জন্মবাদী ব্যক্তিগণ ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিয়া কাহাকেও দেখাইতে বা বুঝাইতে পারেন না ; কারণ তাঁহাদের কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত, নাই এইজন্ত কেহ কোন প্রমাণ দিতেই পারেন না । অতএব হিন্দু গ্রন্থকারগণের এই ব্যবস্থা কেবল ভয় প্রদর্শন মাত্র কিন্তু ইহার পরিণাম মন্দ, কারণ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানত্ব গুণের ঋকতা হইয়া পড়ে এই নিমিত্ত উহার প্রতি বিশ্বাস করা জ্ঞানবান ব্যক্তির কার্য্য নহে ।

মাই না খাওয়ায়, তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত । এই প্রকারে গো দুগ্ধের নিয়মও প্রতিপালন করা আবশ্যিক । ক্রমে সন্তান সন্ততি বড় হইতে থাকিলে নিয়মিত সময়ে, পরিমিত ও অল্প আহার করাইবার অভ্যাস করা উচিত । অপরিমিত ও অধিক ভক্ষণের অভ্যাস হইয়া পড়িলে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়, আয়ুক্ষয় হইয়া পড়ে এবং হতবুদ্ধি ও হতভাগা হইয়া উঠে । আমাদের দেশে ও সমাজে নির্বোধ ও হতভাগ্য মাতৃগণ অনেকেই আপন আপন সন্তান সন্ততিগণকে এই প্রকারে নানা কারণে আদরের ধন করিয়া তুলেন ; তাঁহাদেরই স্নেহের আধিক্য প্রযুক্ত সন্তানগণ মোমের পুতুল হইয়া পড়িতেছেন, সময়ে তাঁহারা কায়িক বা মানসিক কোন পরিশ্রমই করিতে পারেন না । পিতা বা মাতার অত্যধিক স্নেহই পুত্র ও কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় । সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর ৭ম দিবসে তাহার “আকিকা” করা পিতা ও মাতার উপর নিতান্ত কর্তব্য, ইহা আমার হনফি মতাবলম্বীগণের পক্ষে ওয়াজেব । পুত্র হইলে দুইটী ও কন্যা হইলে একটী ছাগল, খাশি, পাঁঠা, ভেড়া, ভেড়ী বা দুগ্ধা দ্বারা “আকিকা” হইতে পারিবে । ৭ম দিবসে না হইলেও যে অন্য কোন দিবসে হইবে না এমন নহে, ১৪শ ও ২১শ দিবসে ইহা সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তদ্ব্যতীত আরও যে অন্য কোন দিবসে ইহা হইতে পারিবে না এমন নহে, জীবনের মধ্যে যখন হয় একবার এই ক্রিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যিক । জনাব রসুলে খোদা, দঃ আপন ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন । লোকে এই কার্যে

অনেক প্রকারে ব্যয় করিয়া থাকে তাহা অন্যায় ও অপব্যয় ; কেবলমাত্র আকিকা করিয়া সেই ছাগ বা মেষের অস্থি ও মাংস পাকের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া পাড়া প্রতিবাসী ও দীন দুঃখীকে বিতরণ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় । শাফই মজহবে তাহার অস্থি ভগ্ন করেন না, আমার হনফি মজহবে তাহার অস্থি ও মাংসকে কোরবানীর মাংসের ন্যায় প্রস্তুত করিতে পারা যায় । এই আকিকার ন্যায় বালকের খৎনা দেওয়াও পিতা বা মাতার কর্তব্য । বাল্যকালেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত, ইহা আমাদের পক্ষে সুন্নৎ অর্থাৎ আমার রসূলে পাকের দ্বঃ আদেশ ; এই জন্যই ইহাকে সাধারণে “সুন্নৎ” কহে । এই ক্রিয়া পুরুষের পক্ষে মহোপকারী বলিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানি ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন । এই ক্রিয়া সমাপন কালে অধিক ব্যয় করা অন্যায়, করিলে অপব্যয় মধ্যে গণ্য । বালকের পূর্ণ চারি বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়া গেলে এক দিবস শুভ লগ্ন ও দিন স্থির করিয়া বালকের বিদ্যারম্ভ করান আবশ্যক । সেই দিবস হইতে সৎগুণান্বিত, নিষ্ঠাবান ও বয়োধিক সুপণ্ডিত দ্বারা বালককে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । শিক্ষাগুরুই মনুষ্য জীবনের প্রথম ও প্রধান গুরু । শিক্ষাগুরু যেরূপ গুণ বা দোষ বিশিষ্ট হইবেন তাঁহার ছাত্রও তাঁহার সহবাসে এবং শিক্ষাতে সেইরূপ গুণ বা দোষের অনুকরণ করিবে । গুরুমহাশয় উপযুক্ত হইলে বালককে বাল্যকাল হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি স্বরূপ নীতি শিক্ষাকে মৌখিক গল্পের ছলে ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নানা প্রকারে তাহার চরিত্র গঠন করিতে পারিবেন । বালকে

বাল্যকালে যেরূপ শিক্ষা পায় ও যে প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া থাকে, উহা তাহাদের কমল হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত অঙ্কিত হইয়া যায় । এই নিমিত্ত বাল্যকালে উপযুক্ত ও সিদ্ধ গুরু মহাশয়ের দ্বারা বালকের শিক্ষা না করাইয়া যে সে গুরু দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত । গুরু দুই প্রকার, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু, উপযুক্ত দীক্ষাগুরুর দ্বারা যেমন পরকালের শুভ ফলের আশা করিতে পারা যায়, তদনুরূপ উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর দ্বারা ইহকালের অথবা জীবনের অশেষ প্রকার সুখ ও সচ্ছন্দতার বিষয় নির্ভর করে । দীক্ষাগুরু মহাশয় বাক্য সিদ্ধ হইলে তাঁহার দীক্ষায় যেমন লোকে আশু ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনই শিক্ষাগুরুও শিক্ষা সিদ্ধ হওয়া আবশ্যিক । এই জন্য যিনি বহুকাল শিক্ষকতা করিয়া অভিজ্ঞতা ও প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন ও নিজের স্বভাব এবং চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আপন আচার ও ব্যবহারে সৎগুণাঙ্ঘিত হইয়াছেন তিনিই উপযুক্ত শিক্ষাগুরু ।

১২ । বালক উপযুক্ত হইয়া উঠিলে বিবাহের আবশ্যক হয় । বিবাহ জন্য শ্বশুরালয় অপরিচিত স্থানে করিতে হইলে বিবাহের পূর্বের শ্বশুরালয়ের লোকের ব্যবহার, স্ত্রীলোকগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি এবং যে, যে স্থানে তাঁহাদের আত্মীয়, স্বজন ও যে, যে স্থানে যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাঁহাদের, আচার, ব্যবহার ও সামাজিক দোষ ও গুণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষরূপে তত্ত্ব অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ কন্যা

শিক্ষিতা কি না, কিরূপ ও কত দূর শিক্ষা করিয়াছেন ; সেই পরিবারস্থ অশ্রান্ত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন আছে কি না, স্ত্রীলোকগণ যত্নশীলা ও পরিশ্রমী হইতেছেন কি না, কন্যাটী যত্নশীলা, পরিশ্রমী ও গৃহকার্য্যে অর্থাৎ কারু কার্য্য ও পাকক্রিয়াতে পটু কি না, এই সব তত্ত্ব লওয়া অত্যন্ত আবশ্যক । পুরুষ প্রায় শিক্ষিত হইয়াই থাকেন তদ্ব্যতীত স্ত্রী শিক্ষিতা ও সর্ববিষয়ে পটু হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়, উভয়ে এই প্রকারে উপযুক্ত হইলে তাঁহাদের সম্ভানসম্মতিগণ স্বভাবত বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যান হইয়াই থাকিবেন । স্ত্রীলোক যত্নশীলা ও পরিশ্রমী হইলে তিনি আপন পরিবারস্থ অধিকাংশ কার্য্যে অপরের অর্থাৎ চাকর চাকরাণীর মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেই তাহা শুচারূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন তদ্বারা তাঁহার উন্নতি ব্যতীত কোন অংশেই ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকিবে না । অলস, অপটু অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী এমন কি চাকর চাকরাণীর উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করিলে কোন প্রকারেই তাঁহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবার আশা নাই । শিশুরালয়ের দোষ ও গুণ দেখিতে গেলে পিতা ও মাতাতে যে গুণ বা দোষ থাকিবে তাঁহাদের কন্যাতেও সেই সকল দোষ থাকাই সম্ভব । যে রূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও সহবাসে তাঁহাদের কন্যা লালিতা, পালিতা ও শিক্ষিতা তাঁহারও সেই গুণ বা দোষ থাকিতে পারে, অতএব এই সমূহ বিষয় তত্ত্ব, অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ করা উচিত । কোন দোষ সংশোধনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে তথায় বিবাহের সম্বন্ধ

করা অনুচিত। পুত্র বা কন্যা উভয়েরই বিবাহে এই সম্বন্ধ বিচার করা আবশ্যিক। পুত্র বা কন্যার বিবাহ যত দূর দেশে হয় ততই মঙ্গল, নিকট কুটুম্ব হইলে অনেক প্রকার অশ্রায় ও অধথা ব্যয়ভার সততই বহন করিতে হয়, তদ্বারা লোকে অনেক প্রকার দায়গ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তবে উভয় পক্ষে বুদ্ধিমান হইলে তাহা হয় না। নিকটে আপন মনোমত অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী পাওয়া না গেলে দূরদেশে বা বিদেশে যেখানে মনোমত উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী পাওয়া যায় সেই স্থানেই বিবাহের সম্বন্ধ করা কর্তব্য। যাওয়া, আসা বা তত্ত্ব লইবার অসুবিধা হইবে বলিয়া এই সামান্য বিষয়ের জন্য উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, নিকটে উপযুক্তের পরিবর্তে অনুপযুক্ত ঘরে সম্বন্ধ করা অর্থাৎ চিরকালের জন্য নানা প্রকার কষ্ট সহ করিতে থাকা অথবা ছেলে বা মেয়েকে সেই কষ্টের স্থলে নিপতিত করিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে। অনেক ছেলে দূরদেশে বা বিদেশে বিবাহ করিয়া আপন নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আপন জন্ম স্থান এমন কি পিতা, মাতা ও আত্মীয়স্বজনের মায়া ও মমতা একবারেই ত্যাগ করিয়া বসেন। শগুর, শাশুড়ি ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনকে আপন গুরু এমন কি গুরুর গুরু মহাগুরু ভাবিয়া তাঁহাদেরই সেবা ও মনোজুষ্টিতে সততই নিমগ্ন থাকেন। এমন পুরুষ সমাজ ও ঈশ্বর সমীপে কাপুরুষ মধ্যে গণ্য।

১৩। যে বংশ বা পরিবার বহুকালের পুরাতন হওয়ায় অবনত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে অথবা অবনত হইবার উপক্রম

হইয়াছে কিম্বা তৎ সম্বন্ধীয় কারণ সমূহ যাহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই পরিবারে বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া মেয়ে দেওয়া বা মেয়ে লওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে । কোন বহুকালের পুরাতন পোকা খাওয়া বৃহত বৃক্ষের পতনোন্মুখ অবস্থায় তাহার নিম্নে আশ্রয় লইলে উহার পরিণাম যেরূপ আশঙ্কা করা যায়, অবনত অবস্থায় পরিণত পরিবারের সহিত মেয়ে বা ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ করিলেও তাহাই হয় । যে পরিবারের উন্নতির অবস্থা অথবা যে পরিবার ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে (অসৎ বা অন্যায ও অত্যাচারের সহিত নহে) এমন পরিবারের দোষ ও গুণাদি বিচার ও বিবেচনা করিয়া সেই পরিবারে বিবাহের সম্বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত । সুদৃঢ় বৃক্ষের আশ্রয় লওয়ায় যেমন ফল ইহারও ফল তদ্রূপ । বহুকালের পুরাতন অবনত অবস্থায় পরিণত পরিবারের সহিত সম্বন্ধের অমঙ্গলজনক ফল অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ দেখিতেই পাওয়া যায় । বহুকালের খানদানী ও বুনইয়াদী ব্যক্তিগণকে শরিফ বলা হয় অর্থাৎ যে পরিবারে এই কয়টি লক্ষণ থাকে তাহাকেই শরিফ বলা যায়,— যথা যে পরিবারের মধ্যে বহুকালাবধি (১ম) বিদ্যা, (২য়) অর্থ (৩য়) রাজপদ বা সামাজিক সম্মান ও বংশমর্যাদা ও (৪র্থ) এইরূপ তিন প্রকার গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত যাঁহাদের পুত্র বা কন্যার আদান ও প্রদান ঘটিত সম্পর্ক ও সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে তাঁহারাই শরিফের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । আজ কাল দেখা যায় সময়ের গুণে এই প্রকার শরিফগণের মধ্যে অনেক বংশই ধ্বংসপ্রায়, অতএব এই প্রকার ধ্বংসপ্রায় বংশ বা

পরিবারের সহিত পুত্র বা কন্যার আদান বা প্রদান ঘটিত সম্বন্ধ ও সম্পর্ক করিলে অনেকেই গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং কথাও তাহাই, কিন্তু ইহার পরিণাম নিতান্ত অমঙ্গলজনক, তাহাতে কোন প্রকারে সুখ ও সন্তোষ লাভ করিতে কাহাকেও দেখা যায় না । কোন কবি বলিয়াছেন—

উর্দু ।

“ক্ষিসে ইনকার দোজখ কা হায় আওয়ে হম দেখা দেওঁ
দিলে সোজা হমারা এক নিমুনা হায় জহন্নমকা ।”

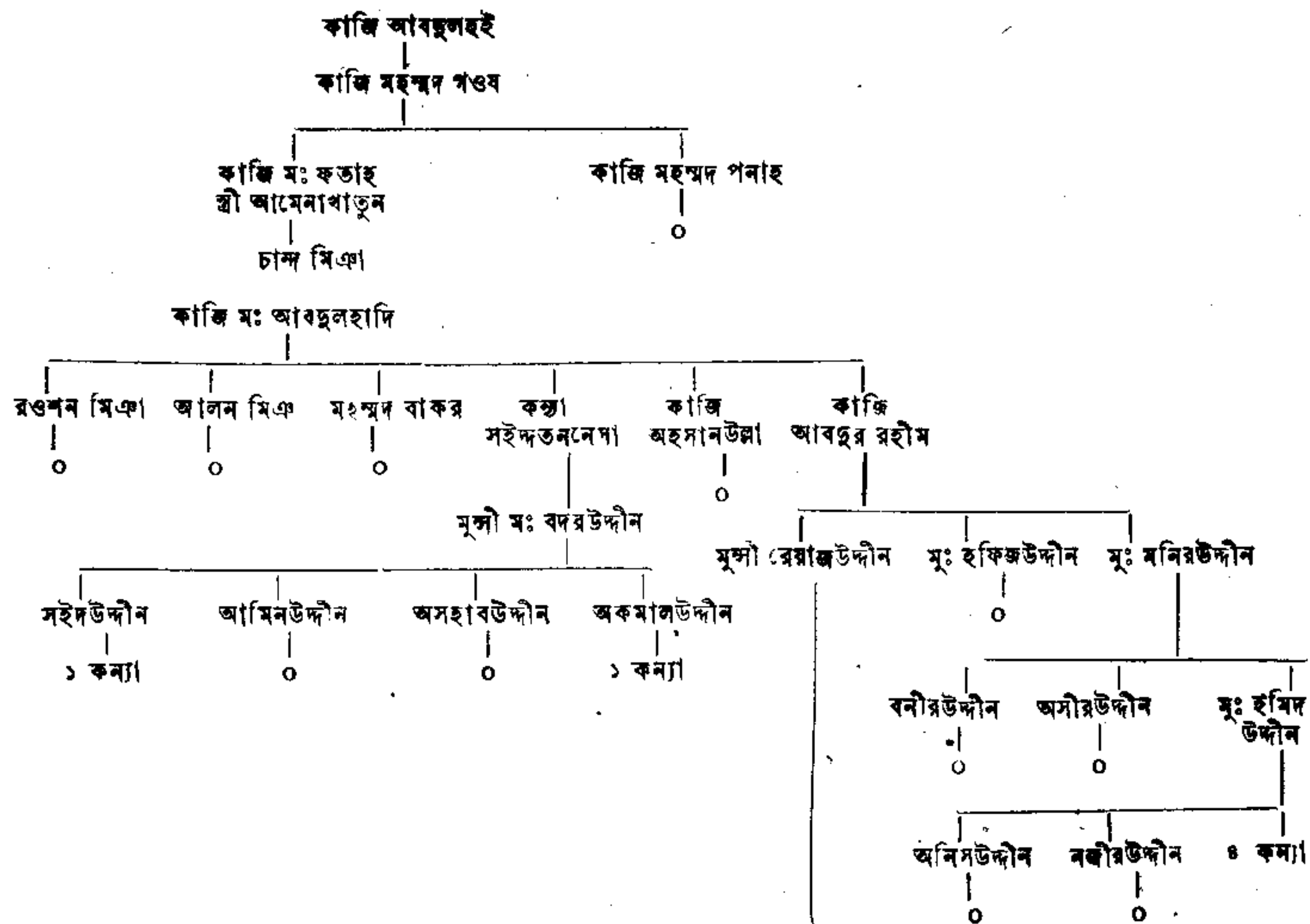
ইহার অর্থ এই যে, নরকের প্রতি যাঁহার অবিশ্বাস থাকে তিনি আমার নিকট আসিতে পারেন আমার দক্ষ প্রাণই নরকের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । প্রকৃতপক্ষে আমি আপনার দৃষ্টান্তানুরূপ অসংখ্য প্রমাণ দেশে ও নগরে দেখাইয়া দিতে পারিব । এই উদ্দেশে মহাজ্ঞানি হজরত মওলানা সাদী বলিয়া গিয়াছেন—

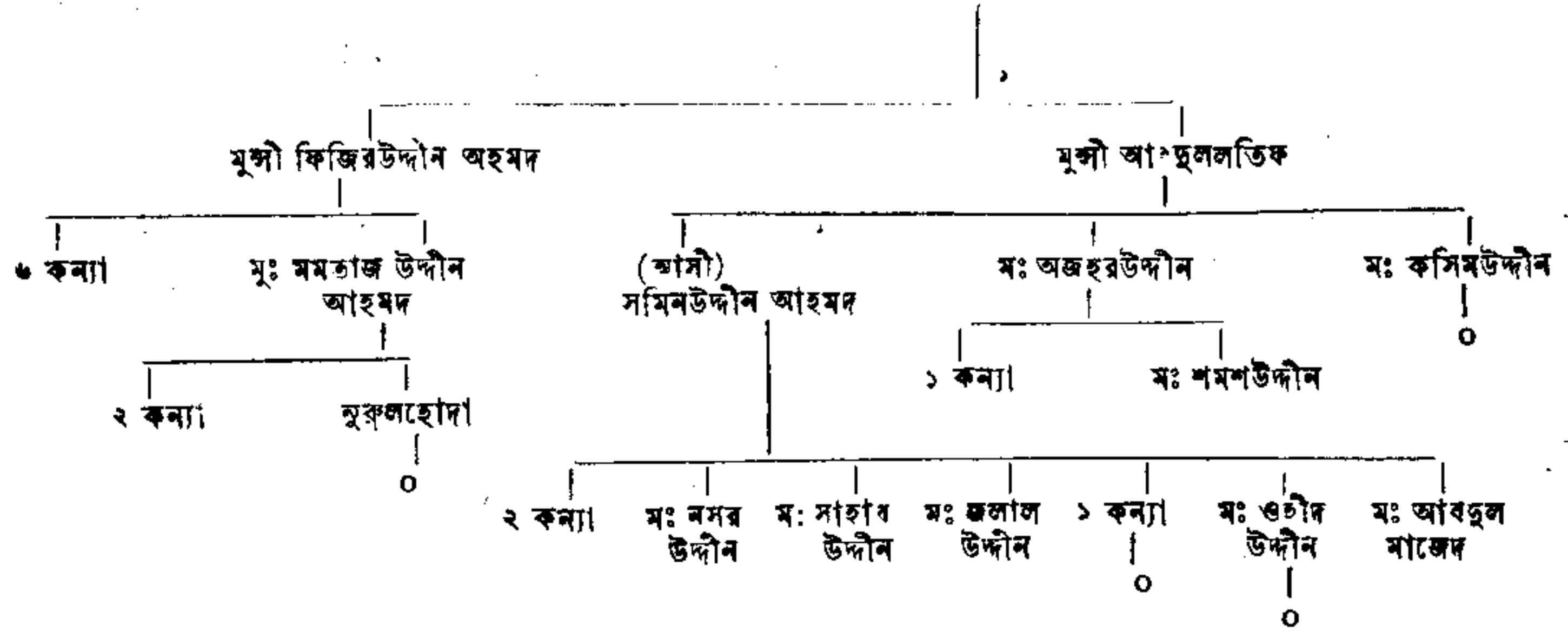
পার্সী ।

“থাক্কা দর বন্দ নখ্‌স আয়ওয়ানস্ত
খানা অজ পায় পস্ত ভিরানস্ত ।”

ইহার অর্থ এই যে, যে অট্টালিকার ভিত্তি নিশ্চূল হইবার সম্ভাবনা তাহার উপর সুশোভিত গৃহ নির্মাণ করিলে তাহার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের আশা করা যাইতে পারে না ।* দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় কুসীনা মা দেওয়া হইল ।

* শরিফের বিপরিত রজিল অর্থাৎ আধুনিক অথবা সাধারণ বুঝায়, এই দুই সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা যেমন আকাশ ও পাতাল, স্বর্গ ও নরক । পরস্পরের কার্য ও ব্যবহারেই ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় । মানসিক প্রবৃত্তির উচ্চতায় ও নিম্নতায় ইহার দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারা যায়, তবে ব্যবহার করিতে হইলে শরিফের সহিতই ব্যবহার করা কর্তব্য । শরাকতের লক্ষণের অভাব হইলেই সাধারণ মধ্যে গণ্য ।





স্বর্গীয় মহাত্মা কাজি আবদুল হাই মরহুম ও মগফুর সাহেব দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার রাজ্য লাভের পূর্বে খঃ ১৬০২ শালে কজায়ী পদে আকৃষ্ট হইয়া মেদিনীপুর সহরে আগমন করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন মহাত্মা সন্মুখে কোন দলিল বা সনন্দ পাওয়া যাইতেছে না।

১৪ । গৃহস্থশ্রমে থাকিতে গেলে অগ্রে বাসগৃহের প্রতি লক্ষ্য করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য, অনেক বাসগৃহের পক্ষে তাচ্ছিল্য ও অনভিজ্ঞতাসহকারে ঘর প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত মন্দ । গৃহ নির্মাণ কালে তাহার ভিত্তি খুব উচ্চ করা উচিত । প্রত্যেক ঘরে প্রচুর পরিমাণে ছুয়ার ও জানালা রাখা আবশ্যক, যাহাতে ঘরের মধ্যে আলো, রোদ্র ও বাতাসের গতিবিধি বিশেষরূপে হইতে পারে তাহাই করা কর্তব্য । ঘরের পক্ষে ইহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিষয়ের অভাব হইলে তাহাতে বাস করা উচিত নহে । আলো না থাকিলে বিষাক্ত জন্তু থাকিয়া প্রাণের আশঙ্কা ঘটিবে, রোদ্র না পাইলে ঘর শুষ্ক হইবে না । নিয়ত ভূমি হইতে এক প্রকার বাষ্প উঠিয়া থাকে তাহা শুষ্ক না হইলে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট ঘটে, প্রচুর পরিমাণে বায়ুর গতিবিধি না হইলে দূষিত বায়ু বহির্গত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না । দূষিত বায়ু থাকিলেই তাহার সংশ্রবে স্বাস্থ্যের অশেষ অনিষ্ট হয়, এই নিমিত্ত ছুয়ার ও জানালা গুলি বেশ রুজু রুজু হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । জানালাগুলি কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে হওয়া কর্তব্য, কারণ বাতাস দূষিত হইলেই হাল্কা হয় ও বাতাস হাল্কা হইলে উপরে উঠে, অতএব জানালা উপরে থাকাই প্রয়োজন, তাহা হইলে সহজেই সেই দূষিত বায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে, ইহাই স্বভাবের নিয়ম । সতত ভূমিতে শয়ন করা কর্তব্য নহে । ভূমি হইতে নিয়ত যে বাষ্প উঠিয়া থাকে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর । শয্যা ভূমিতে

থাকিলেই সেই বাষ্প অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই নিমিত্ত কোন না কোন প্রকার উচ্চ আসনে শয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন । ঘরের মেঝে পাকা বা কাঁচা থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না । পাকা মেঝে হইলেও তাহাতে শয়ন করা অকর্তব্য । দিবাভাগে ঘরের জানালা ও দুয়ার খুলিয়া রাখা (তবে গ্রীষ্মকালে নহে) এবং রাত্তিকালে, বৃষ্টি ও কুজ্জটিকার সময়ে বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক । রাত্তিকালে নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের শিরা ও ধমনী আদি সমূহ যত্ন শিথিল হইয়া পড়ে, তৎকালে যদি দুয়ার ও জানালা খোলা থাকে অথবা বাহিরে ঘুমাইলে ঘরের ও বাহিরের মাটি হইতে এবং নিকটবর্তী বৃক্ষলতাদি হইতে যে বাষ্প নির্গত হইতে থাকে তাহা বায়ুবেগে নিশ্বাস ও প্রশ্বাসসহ শরীরের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হয় ও সহজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইয়া দেয় । যে, যে, দেশের বা স্থানের লোকে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে বিধি ও ব্যবস্থাদির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া থাকেন সেই স্থানেই নানা প্রকার রোগের আধিক্য, মৃত্যুর সংখ্যা বেশী, এমন কি অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অধিক দেখা যায় । যাঁহারা স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে নিয়ম বেশ প্রতিপালন করেন, বিশেষতঃ যে অঞ্চলের লোকে প্রচুর দুয়ার ও জানালা বিশিষ্ট ঘরে ও উচ্চ আসনে শয়ন করেন তথায় জ্বর বা সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব খুব কম ।

১৫ । ঘর করিতে হইলে অগ্রে জলের আশ্রয় সম্বন্ধে তত্ত্ব করা কর্তব্য ; ঘরের নিকট পুকুরিণী না থাকাই মঙ্গল, কূপ

থাকাই উচিত । নিকটে পুষ্করিণী থাকিলে সতত জলের বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হয় । পল্লিগ্রামে অধিকাংশ স্থানে কূপ হইয়া উঠে না, যে দেশে কূপ হয় না তথায় পুষ্করিণী নিকটে না হইয়া অন্তরে থাকাই মঙ্গল । পল্লিগ্রামে জলাশয়ের জলের প্রতি সকলেই অবহেলা করেন বলিয়াই নানা প্রকার ঘাস ও পত্রাদি জলে পচিয়া জল অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে । লোকে সতত জলের ব্যবহার জন্ত ঘরের নিকটেই জলাশয় করিয়া লন অথবা জলাশয়ের নিকটেই ঘর প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ বিবেচনা করেন না । গৃহের দক্ষিণে অর্থাৎ ডাহিনে বা বামে পুষ্করিণী থাকা অনুচিত একরূপ গৃহকে পুষ্করিণীর গর্ভস্থিত গৃহ কহে, সে গৃহে কেহ কখন সুখে থাকিতে পারে না, নিয়ত রোগ লাগিয়াই থাকে । অগ্রে বা পশ্চাতে পুষ্করিণী থাকিলে তত দোষ হয় না, তবে পুষ্করিণী যতদূরে থাকে ততই মঙ্গল । ঘরের নিকটে এমন কি গ্রামের মধ্যে জলাশয়ের সংখ্যা অধিক হইলে অযত্ন ও অসাবধানতা বশতঃ তাহার জল দূষনীয় হইয়া ম্যালেরিয়া আদি সংক্রামক পীড়ার আধিক্য হয়, এই নিমিত্ত যে দেশে বা পল্লিগ্রামে জলাশয়ের সংখ্যা যতই কম ততই শুভ ; তবে আমাদের দেশে মৎস্যের নিমিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ২১১টি পুষ্করিণী থাকা আবশ্যিক । গৃহের সন্নিহিত কতক পরিমাণ খোলা বা ফাঁকা স্থান থাকা আবশ্যিক । ঘরের নিকট তাল ও তেঁতুল বৃক্ষ না থাকাই বিধি । তালগাছ থাকা অলক্ষণ, তেঁতুল গাছের বাতাস অস্বাস্থ্যকর । এই জন্ত

ঘরের নিকট তাল ও তেঁতুল গাছ রাখা অশ্রায় এই নিমিত্ত
লোকে বলে।

“তাল, তেঁতুল মান্দার,
ঘরকে করে আন্ধার।
তাল, তেঁতুল, কুল,
গৃহস্থকে করে নিশ্চুল।”

পুষ্করিণীর পাড়ে তেঁতুল গাছ থাকিলে আরও অমঙ্গল।
তালগাছ থাকি তাল, তাহার পাতার শব্দে তৎস্থিত মৎস্য
অনবরত ছুটা ছুটি করিয়া শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। তাল
ব্যতীত অন্য কোন্ বৃক্ষই পুষ্করিণীর পাড়ে রাখা অনুচিত।
গৃহস্থের পক্ষে ঘরের সন্নিকটে কাঁচা আনাঙ্গের ও নানা
প্রকার পুষ্প বৃক্ষের একটি বাগান থাকা প্রয়োজন। পুষ্প-
বৃক্ষ থাকিলে নয়ন ও মনের প্রফুল্লতা জন্মে। কাঁচা আনাঙ্গ
করিতে পারিলে অশেষ উপকার পাওয়া যায়, উহাতে
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয়। আলু, মূলা ও বেগুণাদির
সাময়িক চাষ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপকারী, সামান্য পরিমাণ
জমীতে এই সব ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে পরিবারস্থ
দৈনিক আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া অতিরিক্ত হইলে
তাহা বিক্রয় করিয়া দিলেও কোন দোষ হয় না। সচ্ছন্দে
তাহার খরচ তাহাতেই নির্বাহ হইয়া যাইতে পারে। এক
জমীতে এক প্রকার শস্য নিয়ত জন্মায় না, প্রতিবৎসর
তাহার ফসল পরিবর্তন করা আবশ্যক। ধানের জমীতে আলু

চাষ করিতে পারা যায় অর্থাৎ ভাদ্র মাসের ও আশ্বিন মাসের
 জমিতে প্রচুর পরিমাণে আলু জন্মিয়া থাকে । যাহারা এই
 আলুর চাষ করেন তাহারা প্রতি বিঘায় শতাধিক টাকা লাভ
 পান । ইহার চাষের সহজ উপায় হইতেছে যে ৮।৯ বা ১০ ইঞ্চি
 পরিমাণ গভীর করিয়া জমিতে চাষ দেওয়া কর্তব্য । আলু ও
 মুলার মাটি তুলার গায় ধূলা হওয়া উচিত । মুলার বীজ
 ভূমিতে ছড়াইয়া বুনিতে হয় কিন্তু আলুর চাষ সারি সারি
 করিয়া বীজ পুতিতে হয় । বীজআলু বালীর উপরে রৌদ্র-
 বিহীন খোলা স্থানে রাখিয়া দিলে তাহার ১।১টী আলুতে
 ৫।৭টী স্থানে অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে, তাহাকে সাধারণ ভাষায়
 “চোখ” কহে, সেই চোখগুলি চাকু ছুরির দ্বারা কিঞ্চিৎ গর্ত
 করিয়া কিছু আলুসহ তুলিয়া লইতে হয়, তাহাই ভূমিতে পুতিলে
 আলুর গাছ হইবে । লোকে ছোট ছোট বীজ আলুও পুতিয়া
 থাকে, অধিক চাষ করিতে গেলে তাহাই করিতে হয় । আলুর
 গাছ হইয়া উঠিলেই তাহার শিকড়ে আলু ধরে । এক একটী
 গাছের শিকড়ে জমী অনুসারে ও চাষের কার্যগতিকে এক সের,
 দুই সের ও ততোধিক আলু ফলিয়া থাকে । যে বীজআলু
 কোন না কোন প্রকারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে
 তাহার একটীমাত্র চোখও না লইয়া সমূহ আলু ফেলিয়া
 দেওয়া কর্তব্য নচেৎ সমূহ ক্ষেত্রের আলু নষ্ট করিয়া ফেলিবে ।
 দুইটী সারের মধ্যে এক ফুট পরিমাণ চওড়া জুলী করা আবশ্যিক,
 সারগুলি দুই ফুট পরিমাণ চওড়া হওয়া উচিত । বীজ পুতিবার
 সময় ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ অন্তরে ১।১টী বীজ পোতা

আবশ্যক । বীজ পুতিবার পর জলের ছেঁচ দেওয়া কর্তব্য তবে বেশী না হওয়াই মঙ্গল । জলের পর মাটি বসিয়া গেলে পুনরায় মাটি আলাগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক । কোন স্থানে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে অমঙ্গল, অতএব কোন স্থানে জল যেন দাঁড়াইয়া না থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । মাটি আলাগা করিয়া না দিলে মাটি জমাট বাঁধিয়া যাইবে তাহাতে আলু প্রচুর পরিমাণে ধরিবে না । গাছগুলি ও ইঞ্চি পরিমাণ উচু হইয়া উঠিলেই একবার মাটি চাপা দিতে হয় তাহার পর আরও দুইবার এই প্রকারে মাটি চাপা দেওয়া আবশ্যক তাহা হইলে প্রতি গাঁইটে আলু ধরিবে । গাছগুলি ও পাতা শুকনা হইয়া গেলে পর আলু তোলা উচিত । একবার একখণ্ড ভূমির আলুতে কোন দোষ দেখা দিলে পুনরায় তথায় আর আলুর চাষ করা অনুচিত । আশ্বিন মাসেই আলুর চাষ আরম্ভের উপযুক্ত সময় । নাইনীতাল আলুর চাষেই লাভ অধিক হইয়া থাকে । মূলা চাষও ঠিক এইরূপ । বেগুণের চাষ বার মাসই করিতে পারা যায়, তবে প্রতিবৎসর একখণ্ড জমীতে হয় না । এই প্রকারে কোপি, শালগম ও গাজরের চাষ করিতে পারিলে বেশ লাভ ও উপকার হয় । কলা চাষ করিতে পারিলে বেশ উপকার হয় । তাহার মাটি আলু ও মুলার স্থায় ধূলা করিতে হয় না, কেবল বৎসরান্তে কোদাল দিলেই চলে । জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে কলাগাছ পুতিবার উপযুক্ত সময় । কলাগাছের চাষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানী চাষি

বান্দালা ।

“আট হাত অন্তর একহাত গাঁই (গর্ত)

কলা পোতরে চাষা ভাই ।

শীতকালে না কাটিস পাত,

তাতে কাপড় তাতেই ভাত ।

তিনশত ষাটি ঝাড় কলা পুতিয়ে,

থাক গিয়ে চাষা খাটে শুইয়ে ।”

ইহাই কলা গাছ রোপণ করিবার নিয়ম । একটী গাছ রোপণ করিলে তাহার গোড়ায় অনেকগুলি চারা বাহির হয়, তন্মধ্যে ১টী বা বড়জোর ২টি রাখিয়া অবশিষ্ট চারাগাছগুলি তুলিয়া দেওয়া কর্তব্য । ঝাড়ে অধিক পরিমাণ গাছ থাকিলে একটীও গাছ মোটা হইতে পারিবে না, গাছ মোটা না হইলে কলাও উত্তম হইবে না । গাছে ফুল ধরিয়া কলা বাহির হওয়া শেষ হইলেই তাহার ফুলটী কাটিয়া লওয়া আবশ্যিক তাহাতে কলা গুলি শীঘ্র ফুটপুষ্ট হয় । চোর বা দুর্ঘট ব্যক্তির ভয়ে গাছে কলা পাকিবার সময় পর্য্যন্ত রাখিতে সাহস না হইলে কলা কান্দি সহ গাছটী গোড়া হইতে কাটিয়া ঘরে আনিয়া কান্দিটী নীচে বুলাইয়া ও গাছের গোড়ার ভাগ উপরে তুলিয়া সূর্যে ১০।৫ দিন রাখিয়া দিলেই কলাগুলি শীঘ্রই বেশ পুষ্টিকর হয় ও পাকিয়া যায় । কলাগাছ লাগাইতে হইলে একস্থানে তিন বৎসর মাত্র লাগাইতে পারা যায় ; ক্রমান্বয়ে বৎসর বৎসর ২।২ হাত অন্তর রোপণ করিলেই হয় এই নিমিত্ত, প্রথম বারে ৮ হাত অন্তর গাছ রোপণের ব্যবস্থা । কলা গাছের শুকনা

পাতা ব্যতীত কাঁচা পাতা কাটিলে গাছ জখম হইয়া যাওয়ায় কলা উত্তম হয় না ও কলাতে বীচি হয়। কলাবাগান করিতে হইলে কলাগাছের গোড়ায় আম, জাম, লিচু আদি নানা প্রকার সুমিষ্ট ফলের গাছ রোপণ করিলে তিন বৎসরের মধ্যে ফলেবও একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত হইয়া পড়ে। গৃহের সন্নিগত অথবা চতুঃপার্শ্বে নানা প্রকার ফলের গাছ থাকিলে উহাতে বিশেষ উপকার ও লাভ আছে। ঘরও সতত শীতল থাকে, গাছের পাতার বর্ণে চক্ষু শীতল হয়। আজকাল সর্বত্রই সর্বপ্রকার গাছের চারা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পরিচিত ও বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট কলমের চারা লইয়া রোপন করিলে শীঘ্রই ফল পাওয়া যায়। এই প্রকারে বাগান করিতে হইলে বিশেষতঃ আম বাগান করিতে গেলে অন্ততঃ ৩০।৪০ হাত অন্তর ১।১টী গাছ রোপণ করা আবশ্যিক। এই সমস্ত গাছ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপকারী; প্রতি বৎসর প্রায় সকলকেই এই সব ফল ক্রয় করিয়া খাইতে হয়, ইহাতে লোকের বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে, ঘরে বাগান থাকিলে সেই ব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও বিশেষ লাভও হয়। প্রতি বৎসর শীতকালের প্রারম্ভে বাগানের মাটিতে কোদাল দেওয়া কর্তব্য, অন্ততঃ পক্ষে লাঙ্গল করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। প্রতি বৎসর আশ্বিন বা কার্তিক মাসে কাঁঠাল গাছে সরু সরু ১০।২০টী প্রশাখা কাটিয়া দিলে সেই সেই স্থানে কাঁঠাল বেশী ধরে। কাঁঠালগাছে ফুল ধরিবার উপক্রম হইলেই তাহার গাছটিকে কাঁটা ও পালা দিয়া বেড় দেওয়া

আবশ্যক, তাহাতে যেন কোন মনুষ্য বা পশু স্পর্শ করিতে না পারে, তৎকালে তাহাতে তাড়িতের বেগ অধিক হয় সেই সময়ে কোন জীবের সংঘর্ষন পাইলেই তাহা নষ্ট হইয়া গিয়া আর ফল ধরে না । চারাগাছের গোড়ায় উই ধরিবার উপক্রম হইলে একটী হাঁড়িতে খেজুরের শুকনা পাতা পুরিয়া সেই স্থানে উবুড় করিয়া রাখিয়া দিলে সেই স্থানের উইপোকাকুলি সেই হাঁড়িতে প্রবেশ করে ২।৪ দিবস অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানা যায় ও সেই হাঁড়িটী আঙুনের উপর রাখিয়া দিলে উইগুলি নষ্ট হইয়া যায় । পিঁপড়া হইলে গাছের গোড়ায় ছাই অর্থাৎ পাঁষ দিলে পিঁপড়া নষ্ট হইয়া যায় । গাছের গোড়ায় ৫।৭ বৎসর অন্তর গো-হাড় চূর্ণ করিয়া ২ ফিট নিম্নে মাটি চাপা দিলে গাছ বেশ বলবান হয় ও উত্তম ফুলফল ধরে । আমগাছের গোড়ায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অন্ততঃ পক্ষে সপ্তাহে একবার ৫।৭ কলসী জল দিলে ফুল নষ্ট হয় না । যদি মাঘ মাসে জল না দেওয়া যায় ও ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইয়া পড়ে আমের সমূহ ফুল অর্থাৎ বকুল নষ্ট হইয়া যায় । তাই সাধারণে বলে :—

“আম, আমড়া, সিমুল
ফাল্গুণের জলে নিম্মূল”

তবে যে যে স্থানের মাটি উত্তম তথায় গাছের জন্ম কিছুই চেষ্টা করিতে হয় না । লোকে বাজারের কলম আমের চারা খরিদ করিয়া অনেকেই ঠকিয়া থাকেন ; হয়ত গাছ হয় না, না হয় উত্তম আম হয় না, এই নিমিত্ত ঘরে বা পাড়াপ্রতিবাসীর মধ্যে

ভাল আমের গাছ থাকিলে কলম করিয়া লওয়া বড় কষ্টকর
নহে । একজন গৃহস্থের ৫৭টী কলম আমের গাছ থাকিলে
তিনি তাহাতে আম খাইয়াও প্রতি বৎসর বেশ দু পয়সা উপায়
করিয়া লইতে পারেন । আষাঢ় মাসে উৎকৃষ্ট আমের আঁঠি
এঁটো না করিয়া ছায়াতে শুক করিয়া একটী হাঁড়িতে ১টি
গাছ উপন্ন করিতে হয়, হাঁড়ির নিম্নে ছিদ্র করিয়া দেওয়া
কর্তব্য নচেৎ জল জমিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যাইবে । প্রথমে
অন্যত্র গাছ উপন্ন করিয়া পরে হাঁড়িতে দিলে ভাল হয়,
কারণ তাহাতে দেখা যায়, যে গাছে বেশী শিকড় হয়, তাহাই
ভাল হয়, ভাদ্রমাসে সেই হাঁড়ি বা গামলাটী উৎকৃষ্ট আমগাছের
উপর সামান্য মাচা করিয়া তাহার উপর রাখিয়া দিয়া গামলাস্থিত
গাছের গোড়া হইতে ৫।৬ ইঞ্চি বাদ দিয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ
বঁটা অর্ধেক ছিলিয়া দিয়া মধ্যস্থানের রসপ্রণালী বাহির করিতে
হয় ও তদনুরূপ বড়গাছের নূতন সরুডাল ১টীকেও ঐ প্রকারে
ছিলিয়া উভয়ের ছেলা অংশ একত্রে মিশাইয়া উৎকৃষ্ট ও
মজবুত সূতা জড়াইয়া বাঁধিতে হয় । বন্ধনের পর সেই বন্ধনস্থলে
কিঞ্চিৎ মাটি লেপিয়া দেওয়া কর্তব্য । তাহার পর কার্তিক
মাসের ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেই হাঁড়ি বা গামলা তথায় থাকিবে,
তবে সময়ে সময়ে তাহার তত্ত্ব লওয়া ও তাহাতে জল দেওয়া
অবশ্যক । এই সময়ের মধ্যে উহাদের সন্ধিস্থলে বেশ গাঁইট
বাঁধিয়া যায় কাহারও বা আরও কিছু সময় লাগে । গাঁইট হইয়া
গিয়াছে দেখা গেলে প্রথমে চারাগাছের আগাটী কাটিয়া দিয়া
তাহার কয়েক দিবস পরে বড় গাছের প্রশাখাটী বেশ ধারাল

ছুরিদ্বারা কলমের মত কাটিয়া গামলাটী নীচে আনিয়া (কখন গাছ অনুসারে চারা গাছের আগাটী পরে কাটিতে হয়) ঐ গামলায় গাছটী কিছু দিন রাখিয়া মাটিসমেত তুলিয়া লইলেও বেশ থাকে এবং যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহার পর পৌষ ও মাঘ মাসে ইচ্ছামত স্থানে রোপণ করিলেই হয়, তবে রোপণ করিবার নিমিত্ত অগ্রে তাহার স্থান প্রস্তুত করা আবশ্যিক । দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪।৪ হাত পরিমাণ চতুষ্কোণ গর্ত করিতে হয় তাহার নীচের দিকে ক্রমে অপ্রসস্থ হইবে । তিন হাত নীচে গর্তটী যেমন ১।১ হাত হইয়া দাঁড়ায় । তাহা নদীর পলিমাটি দিয়া বন্ধ করা উচিত । খৎ বা সার, গোবর, থাকিলে উই ধরিবে । গাছটী রোপণ করিবার সময় তাহাতে যে জোড় থাকে তাহার প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ বাদ দিয়া গাছটী পুতিয়া দেওয়া কর্তব্য, জোড়টী যেন পোতা না হয় । গাছে বেশ বেড়া দিয়া সময়ে জল দেওয়া আবশ্যিক । গাছ হইয়া গেলেও ৩।৪ বৎসর রৌদ্রের দিনে প্রতি সন্ধ্যাকালে জল দেওয়া আবশ্যিক, সকালে জল দেওয়া উচিত নহে । প্রথম বৎসরেই তাহাতে বকুল ধরিতে পারে কিন্তু ১ম ও ২য় বৎসরের বকুলে ফল হইতে দেওয়া অনুচিত কারণ ফলের ভরে গাছ নষ্ট হইয়া যাইবে তবে বকুলের সময় বকুল নষ্ট না করিয়া চনা ধরিলে পর চনা নষ্ট করিতে হয়, বকুল নষ্ট করিলে গাছের অনিষ্ট হয় ; কিছুদিন পর্য্যন্ত জোড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে নচেৎ উই ধরিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, গাছ বড় হইলে তাহাতে আগাছা হইয়া যায় তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট করা উচিত নচেৎ সমূহ

গাছটাকে নষ্ট করিয়া শুকাইয়া ফেলে। গাছে আম ধরিলে কাঁচা বা পাকা আম ভূমে পতিত হইতে না দিয়া শূণ্যে নামাইয়া লওয়াই কর্তব্য। ঘরের নিকটে আম কাঁটোলাদি গাছ থাকিলে যেমন লাভ আছে তেমনই নিমগাছ থাকিলে উপকার আছে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও ইহার বীচি সংগ্রহ করিয়া তৈল করিলেও বিশেষ লাভ, এই নিমিত্ত ঘরের সম্মিকট পশ্চিমে বা দক্ষিণে নিমগাছ থাকা কর্তব্য। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে “বাজবরণ গাছের” বেড়া হইলেই ভাল (নানাস্থানে ইহার নাম নানা প্রকার) ঘরের নিকটে অথবা গ্রামের মধ্যে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে থাকিলে ইহার বায়ুতে কলেরা হয় না। নিকটে এই গাছ না থাকিলে ২।৪টী ডাল আনিয়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখা কর্তব্য। আজকাল লোকের নানা প্রকার কারণ ও অভাব প্রযুক্ত নগরের, দেশের ও জঙ্গলের গাছ গাছড়া সমূহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; কিন্তু বন, জঙ্গল ও বৃক্ষাদির বিনাশই আমাদের দেশের অমঙ্গলের ও দুর্ভিক্ষের যে সকল কারণ আছে তাহার মধ্যে ইহাও একটি প্রধান কারণ। বৃক্ষাদি অধিক পরিমাণে থাকিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশলের নিয়ম অনুসারে বৃক্ষাদির আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকাশে মেঘের উৎপত্তি বেশী হইয়া থাকে ও বৃষ্টি অধিক হয়, এই নিমিত্ত বৃক্ষাদির আধিক্য প্রয়োজন।

১৬। আজকাল কালের গতি অনুসারে সর্ববিশ্রোণীর লোকেই মাংসাশী হইয়া উঠিতেছেন। গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া নিজ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সতত জীব হিংসা করা অর্থাৎ নিজের স্বার্থের জন্য অন্ত জীব বধ করা বা কষ্ট দেওয়া কোন প্রকারেই

উচিত নহে। হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা, তদ্ব্যতীত অন্যান্য পশু সম্বন্ধে ধরিতে গেলে অনেকে বলেন পশু বা পক্ষীর পরকাল নাই, তাহাদের পুণর্জন্ম হইবে না (হিন্দুধর্মের মত পৃথক) ; পশু বা পক্ষীর ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থকে ঈশ্বর মনুষ্যের উপকারের জন্তই সৃষ্টি করিয়াছেন এই নিমিত্ত কোন পশু বা পক্ষীর বধে কোন দোষ বা পাপ হইতে পারে না। ইহা যদি প্রকৃত বা সত্যই হইত তবে ইহা প্রত্যক্ষ অনেকই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি নিয়ত পশুবধ করিয়া থাকে (পক্ষী নহে) শীঘ্রই তাহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে ; এই প্রকার অসংখ্য ব্যক্তিকে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যাইতে দেখা যায় ; পশুবধের জন্তই হস্তদ্বয় হইতে ঈশ্বর তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দিতেছেন ; তাহা ছাড়া অনেকে নানা প্রকার শঙ্কট পীড়াগ্রস্ত হইয়া অপারিসীম কষ্টভোগ সহকারে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহাদের এই সব দণ্ড বিধানের কর্তা সেই সৃষ্টিকর্তা এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহেন। পশু বধের কার্য্য তাঁহার অভিপ্রেত হইলে তিনি কখনই এই সব হত্যাকারীগণকে জগৎবাসীর শিক্ষার জন্ত একপ দশায় পরিণত করিতেন না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে সহরে, নগরে বা পল্লিতে যে স্থানে জীবহত্যার আধিক্য সেই স্থানেই ঈশ্বরের অভিসম্পাৎ অধিক, তথায় প্রায় নিয়তই নানা প্রকার রোগ, সংক্রামক পীড়া, মড়ক ইত্যাদিতে অকাল মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক, ইহাও ঈশ্বরের কার্য্য। এই সব কারণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রকারে জীবহত্যার কার্য্যে ঈশ্বর কখনই সন্তুষ্ট নহেন।

এই জীবহত্যার সংশ্রবে থাকা কাহারও উচিত নহে । নিজ গৃহে কি পল্লির মধ্যে যাহাতে জীবহত্যা না হয়, তদ্রূপ কার্য্য করা বুদ্ধিমানের কার্য্য ।

১৭ । গৃহস্থগণ অনেকেই অনেক প্রকার পশু ও পক্ষী পুষিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে গৃহস্থের পক্ষে গরু পোষাই উত্তম, ইহা অনেক উপকারে আসে এবং ইহাতে লাভও অশেষ আছে । মহিষ ও তদুপযুক্ত জন্তু । ছাগ বা মেঘ পোষা গৃহস্থের পক্ষে অনুচিত । ইহাদের প্রস্রাবের দুর্গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে গুরুতর অনিষ্টকর ; এই নিমিত্ত হিন্দুগণ বলেন যেখানে ইহারা থাকে তথায় লক্ষ্মী স্থান পান না । পরীক্ষাতেও দেখা যায় যাহারা ইহাদিগকে পোষে যদিও তাহাদের এক সময়ে কিছু না কিছু লাভ হয় কিন্তু তাহাতে তাহাদের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহার পরিণামে জীবহত্যা আছে বলিয়াই বোধ হয় ; ঈশ্বরের নিগ্রহ প্রযুক্ত পোষণকারীগণের অবস্থা কখনই সচ্ছল হয় না । যাহারা ইহাদের ও গো মহিষাদির ব্যবসায় করেন তাহাদের যদিও কদাচ কাহারও উন্নতি হয় তবে স্থিতি হয় না, তাহাদের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে । ইতর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকেই ছাগ ও মেঘের পোষানী অথবা ব্যবসায় সাজে, ইহা তাহাদেরই কার্য্য, তাহারাই ইহাদিগকে পুষিয়া থাকে । দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা যেমন তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে পোষে তেমনই তাহাদের দুঃখ ও কষ্ট চিরকালই লাগিয়াই থাকে । ঘরও নির্মাণ করিতে ঈশ্বর সামর্থ্য দেন না, সেই ভগ্নঘরে সচ্ছন্দে তাহাদের প্রিয় জন্তু ছাগ ও মেঘ

মনের আনন্দে নর্তন ও কুর্দগ করিতে থাকে । আমাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন পুরাকালে বড় বড় পীর ও পয়গম্বরগণ ছাগ বা মেষ পুষিতেন ও তাহাদিগকে চরাইয়া আপন আপন কালযাপন করিতেন ; তাঁহারা আমাদের ন্যায় সাংসারিক ব্যক্তি ছিলেন না, তন্নিমিত্তই আমাদের বিপরীত সমূহ কার্য্যই তাঁহাদিগকে শোভা পাইত । আমরা সাংসারিক হইয়া সংসারত্যাগী ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে গেলে কোন মতেই আমাদের উপকারে আসিবে না । অতএব সামান্য লাভের জন্য এই গুরুতর অনিষ্টকারী ছাগ ও মেষ পোষা গৃহস্থের পক্ষে অন্ত্যায় । ছাগের মাংস অতি উত্তম ও সুমিষ্ট এবং বিশেষ উপকারী, ইহারা অধিকাংশ স্থলে নানা প্রকার গাছ গাছড়া ও লতা পাতা খাইয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের মাংসে এত উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহাদের কিঞ্চিৎ অজীর্ণ ও অন্বলের দোষ থাকে তাঁহাদের পক্ষে নহে, নচেৎ ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভক্ষণে মনুষ্যের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপকার হয় । মেষমাংস আমাদের দেশবাসীগণের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ; ইহা কেবল শীতপ্রধান দেশবাসীগণের পক্ষেই উপকারী । আমাদের মধ্যে অনেক গৃহস্থেই হাঁসও মুরগী পুষিয়া থাকেন, তাহাদের মাংস অতি উত্তম । তন্মধ্যে মুরগীর মাংস মহোপকারী, সর্বসময়েই তাহার উপকারিতা পাওয়া যায় । ইহা অনুপকারী বলিয়া কোন অংশেই বলা যাইতে পারে না । ইহা আমাদের দেশে গৃহস্থগণের পক্ষে ঘরে পোষা অন্ত্যায় । বাহিরে রাখিতে পারিলেই মজল, নচেৎ ঘরে আসিলেই ঘরকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া দেয় ।

ইহার কাঁচা আনাজের বাগানের প্রধান শত্রু ; হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে কাঁচা আনাজের বাগানে মুরগী অপেক্ষা লাভ অধিক । ইহাদের দ্বারা বিস্তর ক্ষতি হয় এই নিমিত্ত ইহা ঘরে পোষা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে । হাঁস যে পুষ্করিণীতে পড়ে তাহার মলে এমন বিষাক্ত পদার্থ জন্মায় যে সেই পুষ্করিণীর জল ও মাছ অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জল ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট হয় । মুরগী আমাদের শাস্ত্রে হলাল অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে ; এমন কি সর্বশাস্ত্রেই ইহাকে সিদ্ধ বলিয়াছে ; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণ বলেন এবং এমন কি নিজ বিবেচনাতেও স্বীকার করে যে, যে মুরগী ছাড়া থাকে তাহাকে একাধিক্রমে ২৪ ঘণ্টা কাল আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহা খাওয়া সিদ্ধ নহে । কোন মুরগী পানীয় জলে মুখ দিলে তাহা খাওয়া নিষেধ । উজু করিবার জলে মুখ দিলে তাহাতে আর উজু হইতে পারে না । গরু ও ছাগ উজুর জলে মুখ দিলে খাওয়া বা না খাওয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । গরু আমাদের শাস্ত্রে হলাল হইয়াছে ; ইহার মল মূত্র ব্যতীত সকলই আমাদের শাস্ত্রে হলাল, কিন্তু আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীগণের পক্ষে ইহার মাংস অনিষ্টকারী, তন্নিমিত্ত কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—

পাশী ।

“গালিঙ্গ অস্ত সর্দ অস্ত লহমে বকর”

ইহার অর্থ এই যে, গোমাংস পেটকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করে । তবে বিবেচনা করা উচিত পেট পরিষ্কার থাকিলে রক্ত পরিষ্কার

হয়, রক্ত অপরিষ্কার হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ও নানা প্রকার রোগ ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং অপরিষ্কার রক্তে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে । এই মাংস ভক্ষণে আমাদের রিপু ছয়টির মধ্যে কাম, ক্রোধ ও মাংসর্ষের অত্যন্ত আধিক্য হয়, ইহাদের আধিক্যতাহেতু মনুষ্য দেহের প্রধান মনুষ্যত্ব অর্থাৎ জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি ও বিবেচনা আর তথায় স্থান পায় না । দেখিতে গেলে যে মনুষ্যে এই সব গুণ নাই তিনি পশুর সমান, কারণ পশুতে এই সব গুণ নাই । জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিহীন এবং নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত গোমাংসভোগী বীর্যবান মনুষ্যের ঔরসজাত সন্তান ও সন্ততিগণের নিকটে জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধির আশা করা যাইতেই পারে না । এই গোমাংসের গুণেই কামের আধিক্য প্রযুক্ত অধৈর্য্য হইয়া গিয়া ভাল ও মন্দ সময়ের অপেক্ষা না করিয়া অশুভ সময়ে স্ত্রী-সহবাস দোষে হতভাগ্য ও হতবুদ্ধি আদি দোষ বিশিষ্ট সন্তান সন্ততির উৎপত্তি করিতে থাকেন । এই নিমিত্ত এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিকাংশ স্থলে আমাদের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাহাদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন অধিক তাহাদের অধিক সংখ্যক বালক ও বালিকাগণকে জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাদের মস্তিষ্ক এত দুর্বল যে জ্ঞান উপার্জন ও বিদ্যা অধ্যয়নের ভার আদৌ সহ্য করিতে পারে না, সে দিকে আদৌ তাহারা মনোনিবেশও করিতে পারে না, তাহাদের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা বশতঃ প্রচুর পরিমাণে কায়িক পরিশ্রম ও করিতে পারে না । পরীক্ষা করিতে গেলে সাধারণ সমাজে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ

যে স্থানে হিন্দু ও গোমাংস ভক্ষণকারী মুসলমানের বাস
তথাকার উভয় সম্প্রদায় হইতে সমান সংখ্যক সমবয়স্ক বালক ও
বালিকাকে একত্রিত করিয়া বিদ্যা শিক্ষা অথবা অন্য কোন
প্রকারের কার্যিক বা মানসিক পরিশ্রমের কার্যে প্রবৃত্ত করিলে
স্পর্শই দেখিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে যে হিন্দু ছেলের মধ্যে
কয়জন মনোনিবেশ সহকারে আপন কার্য করিতেছে ও
মুসলমানের মধ্যে কয়জন মনোযোগ দিয়া আপন কার্য
করিতেছে । অবশ্যই ইহাদের মধ্যে আকাশ ও পাতালের
বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যাইবে । হিন্দুর ৫০ জনের মধ্যে
৪০ ও মুসলমানের ৫০ জনের মধ্যে ১০ জন মনোযোগী
দেখিতে পাওয়া যাইবে । একত্রে, একদেশে ও একস্থানে বাস
করিয়া একই জল ও বায়ু সেবন করিয়া প্রায় একই খাদ্য
সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া এরূপ বিভিন্নতার কারণ কি ? এই
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলমানগণের গো-মাংস
ভক্ষণ ব্যতীত আর বিভিন্নতা কিছুই নাই । এই গো-মাংসই
আমাদের সমাজকে সর্ব নিম্নস্তরে নিপতিত করিয়া রাখিয়াছে ।
তবু যেখানে গো-মাংস ভক্ষণের প্রচলন নাই তথায় সংসহবাস
ও শিক্ষার অভাব রহিয়াছে । সাধারণকে লইয়াই সমাজ, কিন্তু
আমাদের সমাজের দুর্দশা এইরূপ, এই গো-মাংস ভক্ষণরূপ
মহাব্যাধি হইতে যিনি যতদূর অন্তরে থাকিতে পারিবেন তাঁহার
ততই মঙ্গল ও তাঁহার পরপুরুষগণের পক্ষেও মঙ্গল । এই
গো-মাংস অত্যন্ত অনিষ্টকারী বলিয়াই জনাব রসুলে করিম,
পাক পয়গম্বর মহম্মদ মুস্তাফা সল্লুলে লাহ অলের হেও সল্লম

কখন গো-মাংস ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্মৃঢ় ও বিখ্যাত কোনই হাদিশ শরিফ পাওয়া যায় না । বরং পবিত্র হাদিশ শরিফ সম্বন্ধীয় “সাহি মসনদ” নামক সুবিখ্যাত আরবি গ্রন্থে পবিত্র অসহাবে করিম জনাব “সোহেবা রজি অল্লা অনহায়ের” কথিত এই গো-মাংস সম্বন্ধে খুদ রসুলে করিমের কালাম পাক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

আরবী

“অলেকুম বে অলবানিল বকরে
ফইন্নহা শেফাউন ও সমনোহা
দওয়াউন ও লহমোহা দাউন”

ইহার অর্থ এই যে, গাভীর দুগ্ধ অশেষ উপকারী, তাহার ঘৃত ঔষধ এবং তাহার মাংস অনুপকারী ও রোগের আনয়নকারী । আমাদের পরম পবিত্র রসুলে করিম দঃ যখন যে মাংসকে জীবনের মধ্যেও ভক্ষণ করেন নাই এবং যাহার দোষ বা গুণ সম্বন্ধে আপন পবিত্র বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তখন তাহার ভক্ষণ করা বা তাহার ভক্ষণের পক্ষপাতী হওয়া কতদূর আবশ্যক ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আমাদের উচিত । তাঁহার পবিত্র আজ্ঞাকে আন্তরিক ভক্তি সহকারে মান্য করিয়া প্রতিপালন করা বিধেয় । এই পশু অন্যান্য জন্তুর ন্যায় হিল্লতের মধ্য গণ্য হইয়াছে মাত্র । এই পবিত্র পুস্তকে ও হাদিসে পাক সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক পুস্তকে এই গো-মাংস সম্বন্ধে এইরূপে অনেক হাদিস পাক

দেখিতে পাওয়া যায় । ইদজজোহা অর্থাৎ বকরিদের সময়ে পবিত্র কোরবানীর কার্য্যে ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয়, কারণ কোরবানীতে খোদার আদেশ আছে, আমাদের পয়গম্বর তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ও তাহার জন্ত তাগিদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে তামিল করিতেই হইবে । গরু, মহিষ, মেষ, ছাগ, দুগ্ধা, ও উষ্ট্র এই ছয় জন্তুতেই পবিত্র কোরবানীর জন্ত আদেশ । এই পবিত্র কোরবানী অবস্থাপন্নব্যক্তির পরিবারস্থ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা এমন কি দাস, দাসীরও নামে নামে সম্পন্ন হওয়া বিধি । মেষ, ছাগ ও দুগ্ধা হইলে প্রত্যেকের জন্ত এক একটা জন্তুর আবশ্যক ; গো, মহিষ ও উষ্ট্র হইলে এক একটা জন্তু ৭৭ জনের নামে সম্পন্ন হইতে পরিবে । এক্ষণে দেখিতে গেলে, দুগ্ধা ও উষ্ট্র আমাদের দেশে দুপ্রাপ্য ; ছাগ ও মেষ গৃহস্থিত মনুষ্যের সংখ্যা অনুযায়ী পশুর আধিক্য বশতঃ ও অধিক মূল্য হেতু কাহারও দ্বারা এত অধিক ছাগ ও মেঘে প্রতি বৎসর এই পবিত্র আদেশ প্রতিপালন হওয়া দুঃসাধ্য । অবশিষ্ট গো ও মহিষের মধ্যে, মহিষ যদিও হলাল, তত্রাচ গো অপেক্ষা মহিষের মূল্য অত্যন্ত অধিক, এই কারণে এই পবিত্র কোরবানীর কার্য্যে গরুই প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী ; অল্পব্যয়ে একত্রে ২১টা মাত্র জীবেই গৃহস্থিত সমূহ ব্যক্তির নামে এই পবিত্র আদেশ পালন করা যাইতে পারে । এই পবিত্র আদেশ প্রত্যেক অবস্থাপন্নব্যক্তির পক্ষে অনিবার্য্য ; ইহাতে আপত্তি

করা কাহারও সাধ্য নাই ; ইহা অপরিবর্তনীয়, এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোনযুগে হয় নাই ও হইতেও পারে না । আজকাল আমাদের দেশে এমন এক সম্প্রদায় মুসলমান দেখা দিতেছেন যে তাঁহারা আমাদের বিপক্ষবাদী ও বিধর্ম্যাবলম্বীগণের ন্যায় গো-বধ অন্যায় বলিয়া পবিত্র কোরবানীর কার্য্যেও অমত এবং অযুক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন । বিধর্ম্মাবলম্বীগণ আমাদের এই পবিত্র কার্য্যে বাধা দিবার উদ্দেশে গো-কোরবানীর কার্য্যে দোষ ধরিতেছেন, কিন্তু কোরবানী শব্দের অর্থ, বলি, বলির অর্থ উৎসর্গ । এইরূপ বলি বা উৎসর্গ প্রত্যেক ধর্ম্মেই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে । প্রত্যেক সহরের মধ্যে প্রকাশ্য সদর রাস্তার উপরে দেবী মন্দিরের সম্মুখে প্রত্যহ শত সহস্র জীব কত প্রকার নিষ্ঠুরতা সহকারে বধ করা হইতেছে, আমাদের মধ্যে কেহ তাহাতে কখনও কোন প্রকার আপত্তি করেন না এবং আমাদের দয়ালু গবর্ণমেন্টও তাহাতে কখন কোন বাধা দেন নাই । রাজধানী কলিকাতা সহরেও রাজপুরুষ এবং সৈন্য সামন্ত-গণের জন্য প্রত্যহ অসংখ্য পরিমাণে গো বধ করিয়া গো-বংশ প্রায় একবারেই নির্মূল করিবার পথে বসিয়াছে, তাহাতেও কখন কোন ব্যক্তি কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন না, কিন্তু আমাদের এই পবিত্র ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিবার ভাব কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না । এ প্রকার জাতিগত বিদ্বেষভাব তাঁহাদিগের শোভা পায় না । কখন কাহারও ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেওয়া সৎ বা বুদ্ধিমানের পক্ষে উচিত নহে । মুসলমান হইয়া স্বীয়ধর্ম্ম কার্য্যের বিরুদ্ধে, যাহা আমাদের পবিত্র শাস্ত্র

অনুসারে কখন কোন প্রকারেই রীদ হইবার নহে, তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিধর্ম্মাবলম্বীগণের মতের পোষকতা করা ও তাঁহাদের অন্তায় কার্য্যে পক্ষাবলম্বন করা কোন প্রকৃত দিনদার মুসলমানের কার্য্য নহে । নিত্যনৈমিত্তিক গো-মাংস ভক্ষণ করা এবং খোদা ও রসুলের আদেশে বৎসরান্ত একবারমাত্র গো-কোরবাণী করা স্বতন্ত্র বিষয় । মুসলমান হইয়া বিধর্ম্মাবলম্বীগণের অন্তায় মতের পোষকতা ও সহায়তা করা এবং তাঁহাদের সহিত যে কোন কার্য্যে হউক না কেন এইরূপ প্রণয় করা অন্তায় ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ । পবিত্র হাদিস শরিফে আছে—

আরবী

“মনতশব বহা বে কওমিন ফ হওয়া মিনছম”

ইহার অর্থ এই যে, যিনি অন্যজাতির সমতুল্যতা প্রকাশ করেন তিনি তজ্জপ গণ্য হইবেন । প্রত্যেক নেক অর্থীৎ সৎকার্য্য যেমন সাধারণের চক্ষের অন্তরালে সম্পাদন করা বিধি তেমনই এই পবিত্র কোরবাণীর ক্রিয়াও সতত বিধর্ম্মাবলম্বীগণের চক্ষু হইতে রক্ষা করিয়া সম্পন্ন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । যে কার্য্যে পরের মনে কষ্ট হয় অথবা যাহাতে অপরে উত্তেজিত হইতে পারেন এইরূপে এইমাত্র কোরবাণী কেন কোন কার্য্যই করা আমাদের পক্ষে কখনই কর্তব্য নহে ; লোক দেখাইয়া সৎকার্য্য করা অথবা যে কার্য্যে লোকের নিকট সন্তোষভাজন কি অসন্তোষভাজন হওয়া যাইবে এই প্রকার জানিয়া কার্য্যকরা কাহাকেও আমাদের পবিত্র ধর্ম্মে অনুমতি

দেয় না । এই কোরবাণীর কার্যের কোন ক্রিয়াই যেন অপর কাহাকেও দেখাইয়া সম্পাদান করা না হয় । তাহাতে খোদার নিকট সওয়াব পাইবার আশা খুব কম । জনাব রসুলে করিমের দঃ গো-মাংস ভক্ষণের সম্বন্ধে যদিও কোন বিশ্বাস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সত্য কিন্তু “সোনান ইবনে মাজা” নামক হদিস শরিফের পবিত্র গ্রন্থে জনাব বিবি আয়েশা সিদ্দিকা রজি অল্লাঅনহার কথিত হদিস শরিফে ও অন্যান্য অসহাব করিমের কথিত হদিস শরিফে প্রকাশ পাইতেছে যে জনাব রসুলে করিম দঃ স্বয়ং গো-কোরবাণী করিয়াছিলেন । বিবি আয়েশার কথিত হদিস শারিফ—

আরবী ।

“অন্না রসুলল্লাহে সল্লুল্লাহো অলেয়হে ও সল্লাম

নহরা অন আলে মহম্মদিনফি হজ্জতলভেদায়ে বকরতন ওয়াহেদন”

ইহার অর্থ এই যে, নিজে জনাব রসুলে করিম দঃ তাঁহার শেষ হজ্জের সময় আপন ও আপন পরিবারবর্গের দিক হইতে একটী গরু কোরবাণী দিয়াছিলেন । উক্ত পবিত্র পুস্তকে জনাব রসুলে করিমের দঃ গো-কোরবাণী সম্বন্ধে আরও পবিত্র হদিস শরিফ দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের পাক পয়গম্বর দঃ এর পবিত্র ক্রিয়ার বিপরীত কার্য করা বা মত দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে, তবে গো-মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে যে যাহা বলুন সে কথা পৃথক । এই মাংস কেবল সৈনিকপুরুষগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিবেকের বিনাশ ও রাগের উৎপত্তি

করাই ইহার প্রধান গুণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক পুরুষগণের পক্ষে ইহাই আবশ্যিক ; এই নিমিত্ত এক সময়ে আমাদের সাধারণ সম্প্রদায়ে অর্থাৎ সৈনিক পুরুষগণের মধ্যে ও তাহাদের অনুচর ও পারিবারিকগণের মধ্যে ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক ছিল, এক্ষণে আর আমাদের ও আমাদের সাধারণ সম্প্রদায়ের সে দিন নাই ; এই জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনাবশ্যিক । সুসভ্য জাপানবাসীগণের ধর্ম্মে ইহার ভক্ষণ নিষেধ কিন্তু সৈনিকপুরুষগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক ভাবিয়াই এক্ষণে তাঁহারাও আপন সৈন্যবিভাগে গো-মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছেন ।

১৮ । মনুষ্য মাত্রেই আহার ও নিদ্রার নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যিক । নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার এমন কি ইচ্ছা ও ক্ষুধা অপেক্ষা অল্প ভক্ষণ করাই বিধি, অনিয়মিত ও অপরিমিত আহারে অজীর্ণতা দোষ ঘটিয়া থাকে । তদ্বারা নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া পড়ে, তাহাতে মানুষের আয়ুঃক্ষীণ হইয়া যায় এবং শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয় । মওলানা সাহি বলিয়াছেন—

পাশী ।

“আন্দক্ক খালিদার তা দরোগুর মারফত বিনি”

ইহার অর্থ এই যে, পেট খালি রাখিলেই তাহার শুভফল শীঘ্রই ভোগ করিতে পারা যাইবে । আরও একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

পার্শী।

“তম্বুরে শিকম দম বদম তাকতন
মুসিবৎ বুয়দ ওক্ত না ইয়াফতন”

ইহার অর্থ এই যে, অহরহঃ ভোজন করিবার অর্থাৎ অতিরিক্ত ভোজনের অভ্যাস থাকিলে অভাব অথবা অনাটনের সময়ে অর্থাৎ পরিণামে অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অল্প আহারে শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যায়। অধিক আহারী ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও বিবেচনা বেশী থাকে না। কোন বিজ্ঞ লোকে বলিয়াছেন।

হিন্দী।

“পেট বড়া গওঁয়ার কা মির বড়া সর্দার কা
পাঁ বড়া বদবখ্ত কা ও হাত বড়া নেকবখ্ত কা”

ইহার ভাব এই যে, অধিক আহারী ব্যক্তি মূর্থ হয়, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মাথাকেই বড় মাথা বলা যায়। যে ব্যক্তি অল্প লাভের নিমিত্ত অধিক ছুটা ছুটি করিয়া বেড়ায় তাহার পা কে বড় পা বলে ও দাতার হাত কে বড় হাত বলা যায় অতএব এইরূপ বড় পেট ও বড় পা বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই হতভাগা। অল্প আহারে যেমন আয়ুঃবৃদ্ধি হয় তেমনই অল্প নিদ্রাতে ও আয়ুঃবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যোগী ঋষিগণ আহার অল্প করেন ও অল্প নিদ্রা যান বলিয়াই দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত খোদাওন-তাল্লা আপন কলাম মুজিদের নিদ্রার অল্পতার জন্য আদেশ করিয়াছেন। পবিত্র কলাম মুজিদের “সুরায়ে মোজম্মেল” তাহা প্রমাণ

করিতেছে, এই জন্য অধিক নিদ্রা পাপের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, ইহা কেবল আমাদের ইসলাম ধর্মের কেন সব ধর্মেরই এই ব্যবস্থা । উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে শারীরিক বিঘ্ন ঘটে ও তৎসহ নিদ্রাও অধিক হইয়া থাকে, কেবলমাত্র আহারের অল্পতায় উভয় প্রকারের বিঘ্ন ও পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায় । এই সুন্দর নিয়মের বিপরীত কার্য্য বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ; উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করিলে অবশ্যই রাত্রি শেষ প্রহরে নিদ্রা ভঙ্গ হইবে । এই প্রকারে শেষরাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইবার অভ্যাস হইলে কেহ কখনই বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না । এই শেষরাত্রিই ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনার প্রধান ও উপযুক্ত সময় নির্ণীত হইয়াছে । বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তৎকালে ঈশ্বরের উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহকালে সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যাইবে এবং পরকালে আরাধনা ও উপাসনার ফলে স্বর্গবাসী হইতে পারা যাইবে । এই নিমিত্ত আমার জনাব রসুলে করিমের দঃ আদেশ হইতেছে যে—

আরবি ।

“অস সলাতো থএক্রম মিনন নওম”

ইহার অর্থ এই যে, নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা শ্রেয়ঃ, অতএব আমাদের পাক পয়গম্বরের আদেশ মান্য করা কর্তব্য ।

১৯ । ইহসংসারে শান্তিস্থাপন ও মনুষ্যজাতির মধ্যে নানা-প্রকার মঙ্গল ও অমঙ্গল জন্য আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মের

খোদায়ে পাক যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তৎসমূহ প্রতিপালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করা আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য ; তাহাদের মধ্যে হলাল ও হরামের বিষয় একটি প্রধান । ইহা বিবেচনা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ না করিলে অল্লাতালার আদেশের বিপরীত কার্য জন্ম আদিগকে জ্ঞানকৃত পাপের অপরাধে মহাপাপী বলিয়া ঈশ্বরসমীপে দণ্ডিত হইতে হইবে ; তজ্জন্ম দেশে ও সমাজে অপরিষ্কার ও নিন্দনীয় এবং পরকালে শাস্তির পরিবর্তে যে অশাস্তির পরাকাষ্ঠায় উঠিতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । পাক ও পবিত্র বস্তুকে খোদাওনতাল হলাল করিয়াছেন এবং অপবিত্র ও নাপাক বস্তুকে হরাম করিয়াছেন ; এইজন্ম মাদক দ্রব্য মাত্রই আমাদের শাস্ত্রে হরাম হইয়াছে ; কেবল আমাদের শাস্ত্রে কেন জগতের সর্ব শাস্ত্রেই ইহা হরাম মধ্যে গণ্য । ইহার এমনই গুণ যে সেবন করিলেই জ্ঞান লোপ করিয়া দেয়, আপন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা খোদায়ে পাকের ভয় থাকে না, তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, এমনকি আপন পিতা ও মাতাদি যাঁহারা সতত চক্ষের উপর বিচরণ করিতে থাকেন তাঁহাদিগকেও চিনিতে পারে না, তাঁহাদের সহিত কত প্রকার অসদালাপ ও অকথ্যকথন করিয়া বসে । ইহা স্বস্থ্যের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী, ইহার ব্যবহারে শরীরস্থ প্রধান প্রধান যন্ত্রসমূহ নষ্ট হইয়া যায়, নানাপ্রকার সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি হইয়া শীঘ্রই আয়ুঃক্ষীণ করিয়া দেয় ও অকালে কালগ্রাসে পতিত করিয়া ফেলে । এই সকল কারণ বশতঃ ইহার বিন্দুমাত্রও আমাদের পবিত্র

ইসলামধর্মের নাপাক ও হরাম বলিয়া ঈশ্বরকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। জনাব রসুলে করিম বলিয়া গিয়াছেন, হাদিস শরিফ হইতেছে যে—

আরবি।

“মা অসকরা ফা কলিলহ ও কসিরহ হরামুণ”

ইহার অর্থ এই যে, যাহাতে নেশা আছে তাহার বেশী বা কম সকলই হরাম। এই মাদক দ্রব্য হরাম মুতলক বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অতএব ইহার আশ্রাণ, আশ্বাদন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত একবারেই নিষেধ। শরীরের কোন স্থানে লাগিয়া গেলে স্নানবিধি, বস্ত্রের কোন এক স্থানে লাগিয়া গেলে সমূহ বস্ত্র ধোত করাই আবশ্যিক। যে গৃহে এইরূপ মাদক দ্রব্য থাকে তথায় আরাধনা ও উপাসনা নিষেধ। ইহার আরও এক মহৎ দোষ এই যে, ইহার ব্যবহারকারীগণ কখনই অল্পে সন্তুষ্ট হইনা ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না, ক্রমে নেশায় উন্মত্ত হইয়া মাত্রা বাড়িতে থাকে, তদ্বারা কত লোকে যে কত প্রকার অমঙ্গলজনক ও অনিষ্টকর কার্য্য করিয়া জগৎসংসারের ও নিজের কতই মন্দ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না; দুঃখের বিষয়, শিক্ষা ও সহবাস গুণে এক্ষণে অধিক সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাও এই নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন ও জ্ঞানকৃত অপরাধ করিয়া পরকালের নরকাগ্নিতে পুড়িবার পথ করিতেছেন এবং ইহকালেই আপন যশ, মান ও গৌরব নষ্ট করিতেছেন ও আপন এবং আপনার

পূর্ব পুরুষগণের সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পরপুরুষগণের জন্ত ভিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন । আপন পরকাল ও পর পুরুষগণের জন্ত একবারও ভাবিতেছেন না । খোদাওন্দ করিম যেন ইসলাম সমাজে আর ইহার বিস্তার না করেন ইহাই প্রার্থনা । ব্যবসায় উপলক্ষে আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম জগতে অমঙ্গল ও অত্যাচার নিবারণ হেতু এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন জন্ত সুদ ও বাড়ের প্রথাকে খোদায়ে পাক হরাম বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, পবিত্র কোরাণে আছে—

আরবি ।

“অহল লল লাহল বয়আ ও হররমররেবা”

ইহার অর্থ এই যে, তেজারত হলাল হইতেছে ও সুদ হরাম । জগৎপাতা জগদীশ্বর স্বয়ং দয়ার সাগর ও দয়ার মূলাধার, তিনি আমাদেরকে অহরহঃ তাঁহার আদেশের বিপরীত মন্দ কার্য সমূহ করিতে দেখিয়াও আমাদের প্রতি দয়া করিতে পরাঙ্গুথ হন না, তদনুসারে তিনি আমাদেরকে পরস্পরের মধ্যে সদয় ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন । মানুষের কখন অভাব বা আবশ্যক না হইলে কেহ কখন কোন ধনি বা মহাজনের নিকট দায়গ্রস্ত হয় না । দুর্ভাগ্য বশতঃ আপন অভাবজনিত দোষে শীঘ্রই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে কিছুদিন পরে সেই মহাজনের সুদ বা বাড়ের হিসাবে আসলসহ এত অধিক হইয়া পড়ে যে তাহার আর পরিশোধ করা অসাধ্য হইয়া উঠে ; তৎকালে দায়-

প্রকারে কাতরতা ও হীনতা প্রকাশ করিলেও মহাজন মহাশয়ের পাষণ্ড অন্তঃকরণে আদৌ দয়ার সঞ্চার হয় না। সৃষ্টিকর্তা আপন সৃষ্ট জীবে দয়া করিবার আদর্শ দেখাইতেছেন, কিন্তু সুদখোর মহাজনগণ তাহা দেখিয়াও তাহারই সৃষ্ট জীবের প্রতি নির্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন; এই নিমিত্ত যে মহাজন যতই দয়ার সহিত অল্প সুদের ব্যবহার করুন না কেন মাদক দ্রব্যের বেণী বা কম যেমন হরাম তেমনই ইহারও অধিক কি অল্প সকলই হরাম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে দ্রব্য হরাম তাহার ব্যবসায় ও পয়সা সকলই হরাম, ইহাই আমাদের পবিত্র কোরাণ শরিফের আদেশ ও ব্যবস্থা। পরের দ্রব্য তাহার অনিচ্ছায় লইলে অথবা তাহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অপহরণ করিলে কি কোন প্রকারে আত্মস্বাৎ করিলে কিম্বা সত্য বা মিথ্যা ভয় দেখাইয়া কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলে এবং মালিকের ইচ্ছা নাই যে তাহার কোন দ্রব্য অপরকে দেয় কিন্তু তাহার ইচ্ছার বিপরীত যে কোন প্রকারে হয় অন্যায় রূপে অথবা ছলে, বলে, কৌশলে কি আইন আদালতের আশ্রয়ে বা ভুলাইয়া কি বঞ্চনা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে তাহাও হরাম। ইহা কখনই হলাল হইতে পারে না। এইরূপে অন্যায় ও অত্যাচারের দ্বারা কেহ কিছু অর্থ বা ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করা যেমন, মদ বা সুদ খাওয়াও তেমনই। ইহার পরিণাম বড়ই মন্দ ও শোচনীয়, ইহা কোন প্রকারেই কাহারও পক্ষে শুভ ফলদায়ক হয় না, ইহা জ্ঞানকৃত মহাপাপ বলিয়া ঈশ্বরের নিকট গম্য, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ইহকালেই তাহার ফলভোগ করিতেই

হয়, পরকালেত হইবেই হইবে । এতদ্ব্যতীত এইরূপ ধনসম্পত্তির স্থায়িত্বও ইহ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার শত সহস্র প্রমাণ আমাদের চক্ষের উপরই আসিয়া পড়ে এবং ইহকালেই এই প্রকার মহাপাপী ব্যক্তির পরিণাম এত শোচনীয় হইয়া পড়ে যে তাহা বর্ণনা করা যায় না । এই প্রকার কর্মের ফল আমাদের নিমিত্ত জগৎপাতা জগদীশ্বরের দৃষ্টান্ত হইতেছে, এত দৃষ্টান্তের পর ও যাঁহারা এই রূপ কার্য করিবেন সেই আক্ষেপেই তিনি পরকালে তাহাদের বিচার নিজে না করিয়া সেই প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া দিবেন ইহাই তাঁহার ব্যবস্থা, এই নিমিত্ত এইরূপ ব্যক্তিকে পরকালেও চিরকালের জন্য নরকাগ্নিতে পুড়িতেই হইবে । জগতে এমন কোন ধর্ম নাই যে তাহাতে পরকাল স্বীকার করে না, জগতের সৃষ্টি অবধি এতাবৎকাল পর্যন্ত যত মহাপুরুষ, মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন, সকলেই পরকালে ঈশ্বরের বিচার স্বীকার করিয়াছেন । এখনই সামান্য লোকে বিজ্ঞা বলে ভবিষ্যতের বিষয় সহজেই বলিতে পারেন, তবে পয়গম্বর আদি ঈশ্বরানুগৃহীত, ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি যাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞার সাগর সেই মহাপুরুষগণও পরকাল আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সেই কথা কখনই অসম্ভব বা মিথ্যা হইবার নহে, অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, নিশ্চয় পরকাল আছেই আছে তথায় ঈশ্বর আমাদের কর্মের ফলানুযায়ী অবশ্যই বিচার করিবেন এবং অবশ্যই আমাদের কার্যের নিমিত্ত পুরস্কার ও দণ্ডের অধিকারী হইতেই হইবে । মাদক

দ্রব্য সেবন ও খুদ গ্রহণ ও অন্যান্য অন্যায কার্য যেমন আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ তেমনই গান বা বাজের ক্রিয়া অথবা তৎসম্বন্ধীয় অর্থ, জুয়াখেলা বা তদ্ব্যক্তি ধন আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মের নাপাক ও হরাম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাস, পাশা ও শতরঞ্জ আদি খেলার নেশাও আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মের জুয়া খেলার সমতুল্য। গান বাদ্য শ্রবণ করাও আমাদের শাস্ত্রে হরাম। ইহার দ্বারা মনুষ্যের মন এতই মুগ্ধ হইয়া যায় যে ক্ষণকালের নিমিত্তও আত্মহারা করাইয়া দিয়া মদের নেশার ন্যায় জ্ঞান শূন্য করিয়া ফেলে এমনকি ঈশ্বরকেও ভুলাইয়া দেয়। জুয়া খেলা ও অন্যান্য খেলাও ঠিক তদনুরূপ গুণ ও ক্ষমতা ধারণ করে; এইরূপ ব্যবহারে লোকে আত্মহারা হইয়া আপন অজস্র অর্থ নাশ করিয়া দেয়, তদ্বারা জগতের কতই অমঙ্গল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্তই এই সব বিষয় আমাদের শাস্ত্রে হরাম হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে এই সব হারাম হওয়া সত্ত্বেও কত শত মুসলমান ভায়া আপন আপন অসংখ্য অসংখ্য ধন ক্ষয় করিয়া নির্ধন হইয়া যাইতেছেন এবং জগতের কতই অমঙ্গল করিতেছেন। আমাদের কাছে এই সব দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই খোদাওন্দ করিম আমাদের জন্য ইহাদিগকে হরাম করিয়াছেন। গাঞ্জা, গুলী, ভাস্ক, তাড়ি ও তামাক আদিও মাদক দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। তামাক যদিও হরামের মধ্যে গণ্য নহে তাহা মকরুহ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। কোন নেশাতেই কোন উপকার নাই, যদিও কেহ কখন কোন এক প্রকার উপকার পায় কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শত প্রকার অনুপকার

উৎপন্ন হইয়া পড়ে । লোকে প্রথমে পরের দেখাদেখি ও সহবাস এবং সখের উপর নির্ভর করিয়াই ইহা অভ্যাস করিয়া বসেন, পরে তাহা গলগ্রহ হইয়া পড়ে তাহা না পাইলেই অস্থির করিয়া দেয়, জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ হইয়া যায়, সেই সময়েই তাহার পূর্ণ অধিকার, তাহার পর তাহা পাইলেই শরীর সুস্থ হয় ; মনে করা হয় যে ইহার দ্বারাই উপকার পাইলাম কিন্তু এটা ভাবেন না যে যখন ইহার অভ্যাস ছিল না তখনত এত অস্থির হইতে হইত না, জ্ঞানহারা হইত না, বুদ্ধি লোপ হইত না এবং তাহার পর বুদ্ধি আসিয়া জুটিতও না । গাঞ্জা, গুলী, ভাঙ্গ ও আফিং আদির নেশার ন্যায় তামাকেও এমন একটা ক্ষমতা আছে যে, সেও এইরূপে লোককে পাগল করিয়া বসে, এই নিমিত্ত ইহাকেও হরামের সমতুল্য জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করা কর্তব্য । তামাকখোরগণের দাঁত শীঘ্রই পড়ে, বিশেষত পানের সহিত যাঁহারা কাঁচা তামাক খান তাহাদের দাঁত আরও শীঘ্র পড়ে । ভাঙ্গ ও তাড়িতে মদের ন্যায় নেশা হয় । গাঞ্জা, আফিং, গুলি ও চরস আদি খাইলে মদের ন্যায় নেশা হয় না, কিন্তু না পাইলেই মাতালের ন্যায় পাগল হইয়া পড়ে । এইসব নেশাতে এত শীঘ্রই আয়ুঃক্ষয় করিয়া দেয় যে, যেন ইহাদের সেবনকারীগণ আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশে ক্রমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন, ইহাদের মৃত্যু আত্মহত্যার সমতুল্য । আত্মহত্যা মহাপাপ, নরকেই তাহার স্থান, কারণ জন্ম বা মৃত্যু আদি ঘটনা বা কার্য ঈশ্বরের অধিকার ; কেহ স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরকে তাঁহার অধিকার হইতে বিরত রাখিয়া নিজেই

ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত কার্যকে সম্পাদন করিলে অর্থাৎ আত্মহত্যা করিলে কেন না সে ঈশ্বরের নিকট মহাপাপী ও নরকভোগী না হইবে। মাদক দ্রব্যের দোষ অশেষ মদে ব্যভিচার প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়, গাঙ্গা কাম শক্তির হ্রাস করে, ভাঙ্গ বুদ্ধি লোপ করে, অহিফেন মিথ্যার দিকে ধাবিত করে। গুলি পরদ্রব্য অপহরণ প্রবৃত্তি আনয়ন করে, তামাক শরীরস্থ শক্তি সমূহের উপর অধিকার বিস্তার করে এবং প্রত্যেকের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া দেয়। আমাদের দেশে পানকেও কোন কোন ব্যক্তি নেশা বলিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পান নেশা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; যাঁহারা পান খান তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অনুপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাঁহারা পান খান না তাঁহাদের সে কষ্ট আদৌ কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। পান খাইলে দাঁতের কষ্ট অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করিতে হয় এবং বৃদ্ধাবস্থায় মুখে সম্পূর্ণ দাঁত লইয়া মরণ হয় না। লোকে বলে পানের অনুসঙ্গী চূণ ও সুপারিতে অম্বল নাশ করে, কিন্তু তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। পান খাওয়া অম্ব্যাসের আধিক্যতা হেতু সেই পানের সুপারি ও খয়েরে ক্রমান্বয়ে শুক্র ক্ষয় করিয়া দেয়, এমন কি অনেকের বীৰ্য্যে আদৌ সন্তান উৎপাদিকা শক্তিই থাকে না। যখন ইহার অধিক ব্যবহারে এই সব গুরুতর অনিষ্টকারী দোষ হয় তখন অল্প ব্যবহারে যে অল্প দোষ না হইবে তাহার বিচিত্র কি ? এই নিমিত্ত ইহার ব্যবহার যতই কম হয় ততই মঙ্গল। কেহ পান খাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে থাকিতে না পারিলে

এ পান না খাওয়াই ভাল ও বুদ্ধিমানের কার্য্য ; অশেষ কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও তদসহ অপব্যয় হইতে বাঁচা যায় ।

২০ । আমরা সাংসারিক ব্যক্তি, সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মে বাস করিতেছি, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করেন তাঁহারা কেবল মাত্র আরাধনা ও উপাসনা ব্যতীত অন্য কোনদিকে আপন মনোনিবেশ করেন না এবং মনোনিবেশের কোন কারণও তাঁহাদের হয় না । সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কর্তব্য যে, যে যার ধর্ম্ম ও বিশ্বাস অনুসারে আমরা যেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিনাশকর্তা ও পরকালের বিচারকর্তা, এক মাত্র সেই ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনা করিতে থাকি । তাঁহার আদেশ, ব্যবস্থা ও নিষেধ অনুসারে যে যার ধর্ম্ম অনুযায়ী যাঁহা কিছু করা আবশ্যিক তৎসমূহ কার্য্যই করা আমাদের কর্তব্য । কেবল মাত্র মিথ্যা বলিব না, সত্য বলিব, অন্যায় করিব না, শ্রায় করিব, অবিচার করিব না, বিচার করিব । নির্দয় হইব না, দয়া করিব, পাপ করিব না পুণ্য কার্য্যই করিব ইত্যাদি বিষয় অনুযায়ী কার্য্য করিলেই যে আমাদের কর্তব্য প্রতিপালন হইয়া গেল তাহা নহে, মন্দ কার্য্য হইতে বিরত থাকা ও সৎকার্য্য করা ইহসংসারে ধর্ম্ম মাত্রেরই সাধারণ নিয়ম, ইহা আমাদেরকে প্রতিপালন করিতেই হইবে তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রীতি লাভের উদ্দেশে যে যে মহাপুরুষ অর্থাৎ রসূল, পয়গম্বর,

প্রথা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য যেমন আমাদের রোজা, নমাজ বা অন্য কথায় আরাধনা ও উপাসনার আদেশ ও প্রতিপালন করিতে থাকা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । এখন উপাসনা করিবার সময় হয় নাই পরে করিব, বাস্তাবস্থায় করিব না, বৃদ্ধাবস্থায় করিব এইরূপ ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা না করা কোন প্রকারেই সৎব্যক্তির কার্য্য নহে । ঈশ্বর আমাদেরকে মৃত্যুর অধিকারে বশীভূত করিয়াই জন্ম দিয়াছেন ইহা তাঁহার সংসার রক্ষার নিয়ম ও ধর্ম্ম, কে কোন্ সময়ে মরিতেছে তাহা কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না, আমরা আমাদের জীবনের সমূহ অবস্থাতেই তাঁহার কার্য্য করিতে থাকিব বলিয়াই তিনি আমাদেরকে এই অধিকার দেন নাই । মৃত্যুর সময় জানিতে পারিলে সেই সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, তদ্বারা কখনই ইহ সংসারের স্মৃশ্ৰুততা হইত না, এক প্রকার অনায়াস ও স্বত্যাচারে পরিপূর্ণ অরাজকতা হইয়া পড়িত । ঈশ্বর মহান তাঁহার মহিমা অপার, তাঁহার কার্য্য ও উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা কাহারও সাধ্য নহে । আমরা যখন মৃত্যুর সময় জানিতে পারিব না তখন নিয়তই মৃত্যুকে মনে রাখা উচিত । আমরা আপন আপন সংসার যাত্রা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গেই অজুই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নহে ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অবশ্য আমাদের কর্তব্য । এখন নহে, অন্য সময়ে, যৌবনাবস্থায় নহে বৃদ্ধাবস্থায় উপাসনা করিব বলিয়া নিরস্ত থাকি আমাদের কর্তব্য নহে, এই মর্মে কোন জ্ঞানিব্যক্তি বলিয়াছেন—

উর্দু ।

“ন ছোড়্‌গা ফলক হরগিজ বগএর অজগোর মে ভেজে
সমঝ জেরে জমি উসকো জোইস বাগারে জমি আরা”

ইহার অর্থ এই যে, মৃত্যু অনিবার্য্য অতএব বুঝা উচিত যে যখন জন্ম হইয়াছে, তখনই যেন মৃত্যু ঘটয়া গিয়াছে, এই নিমিত্ত সততই মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকাই কর্তব্য । আমাদের বাল্যকাল অজ্ঞান অবস্থার কাল, তৎকালে কোন দোষ বা অপরাধ করিলে অথবা ঈশ্বরের কোন আদেশ প্রতিপালন না করিলে বিশেষরূপে ধর্তব্য হইতে নাও পারে । যৌবন কাল ও বৃদ্ধ কাল অজ্ঞান কাল নহে, স্বজ্ঞান কাল, এই কালের জ্ঞান যদিও কেহ আশা করিতে পারে না, তত্রাচ অনেকে যৌবনাবস্থা অতীত করিয়াও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে অনেকে একরূপ বৃদ্ধাবস্থাতেও বহুকালের ভ্রান্তির দোষে ঈশ্বরকে এত দূর ভুলিয়া যান যে, অতি সামান্য সময়ের জন্য একবার মাত্রও তাঁহার আদেশ ও ব্যবস্থাকে ভয় করেন না ; যদিও অনেকে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরাদেশানুযায়ী কার্য্য করুন সত্য কিন্তু তাহা তাঁহার বীরত্বের কার্য্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাঁহার সেই কার্য্যে হীনতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতার পরিচয় প্রকাশ পায়, তৎকালে তাঁহার সংসার সংগ্রামের শত্রুরূপ রিপু সমূহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দেওয়ায় বাধ্য হইয়া তিনি বৃদ্ধ বেষ্টার ন্যায় তপস্বিনীরূপে হস্তে মালা ধারণ করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না । ইহ সংসারেই কেহ বৃদ্ধ-বেষ্টা-

তপস্বিনীর প্রতি ভক্তি করেন না, ঈশ্বরের নিকট হইতে দয়া ও অনুগ্রহ পাইবার আশা তিনি কি প্রকারে করিতে পারেন। বীরত্বের সহিত বল ও বিক্রম সহকারে যৌবনাবস্থায় সম্মুখযুদ্ধে পরম শত্রু রিপুগণকে পরাজয় করিয়া যৌবনকাল হইতেই ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন সহ তাঁহার আরাধনা করাই বীর পুরুষের কার্য্য। বীরত্বের জন্য বীর পুরুষগণ ইহকালে সর্বত্র সর্বকালের নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের যশোরাশি জগৎময় প্রচারিত হইতে সময়ের আবশ্যক করে না, যৌবনকাল হইতেই শত্রুরূপ রিপু সমূহকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঈশ্বরভক্ত হওয়াও তেমনই, তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে দয়া ও কৃপার যেমন অধিকারী তদনুরূপ জগৎ-বাসিগণের নিকটও সমাদৃত। অসংখ্য লোকে যাহার পক্ষপাতী ঈশ্বর কখনই তাহার বিপক্ষ হইবেন না। অসংখ্য লোকে যাহার বিপক্ষবাদী ঈশ্বর কখনই তাহার পক্ষপাতী হইবেন না ; ইহাই তাঁহার সংসার ধর্ম্মের নিয়ম। যৌবনকালই আমাদের সংসার সংগ্রামের জয় লাভের উপযুক্ত সময়, এই কালে আপন মানসিক শক্তির দ্বারা বীরত্বের পরিচয় দিয়া এই দেহ ক্ষেত্রে আমাদের বিপক্ষ শত্রুর সেনাপতি রিপু সমূহকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বন্দীভাবে তাহাদিগকে স্বীয় অধিকারে আনিতে পারিলে অথবা তাহাদিগকে তাহাদের কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না দিলে কিম্বা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যই না করিলে ও আরাধনা এবং উপাসনার কার্য্য করিতে থাকিলে এই মহা সংগ্রামের জয় ও পরাজয়ের শুভ সংবাদ

অতি অল্প সময়েই জগৎময় ঘোষিত হইয়া যায়, সকলেই সেই মহাপুরুষের গুণরাশি শতগুণে কীর্তন করেন ও অস্তুরের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসেন ; এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরও তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কখনই থাকিতে পারেন না । এই প্রকারে যিনি ইহ সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতি লাভ করিতে পারেন তিনি শত সহস্র সংসারত্যাগী সাধু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । যৌবনকাল সংসারে সুখের কাল ও বৃদ্ধকাল দুঃখের কাল । সুখের কালে সুখে নিমগ্ন হইয়া সুখ দাতাকে ভুলিয়া যাওয়া ও দুঃখের সময় স্মরণ করায় তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের আশা খুবই কম । এই মর্মে মহাকবি কবির দাস বলিয়া গিয়াছেন—

হিন্দী ।

“কবির সুখে মে সমিরণ ন কিয়া দুঃখ মে যোকিয়া ইয়াদ
কহে কবির তা দাস কি কেঁও লগে ফরইয়াদ”

“দুঃখ মে সব হরি কো বোলাওয়ে সুখ মে ন বলাওয়ে কোই
সুখ মে যব হরি কো বোলাওয়ে তব দুঃখ কাহেকো হোই”

ইহার ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন ; এই নিমিত্ত সুখের সময়েই ঈশ্বরকে স্মরণ করাই অর্থাৎ তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করাই শ্রেয় ; এই প্রকারে যৌবন কালে ও বৃদ্ধকালে উভয় কালেই ঈশ্বরের আরাধনা করা আমাদের কর্তব্য । সতত ঈশ্বরের নাম আন্তরিক ভয় ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করিতে গেলে মন সতত পবিত্র থাকে, অন্যায় ও মন্দ কার্য্য হইতে বিরত থাকা যায় । পবিত্র অন্তঃকরণে আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে সতত

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করাই সর্ব শাস্ত্রের আদেশ ও ব্যবস্থা,
তাহাতেই ফল আছে বলিয়া ঈশ্বর বলিয়াছেন নচেৎ আমোদ
ও আহ্লাদের ছলে অথবা মন্দ কার্য্য করিবার সময়ে কিম্বা
মনোমধ্যে কতই কি ভাব ও আলোচনার উদয় হইতেছে
অথচ ঈশ্বরের নাম লওয়া হইতেছে তাহাতে কোন ফল নাই।
হজরত মক্তলানা সাদি বলিয়াছেন—

পার্সী ।

“বর জব্বা তসবিহ দর দিল গাও থর
ই চুনি তসবিহ কর দারদ অসর
সদ তমন্না দর দিলস্ত আয় বুলফজুল
কর কুনদ হুর হক দর দিল নজুল”

ইহার অর্থ এই যে মুখে ঈশ্বরের নাম হইতেছে ও মনের মধ্যে
কত গরু ও ঘোড়াদি ছুটিতেছে এরূপ নামে ফল নাই, যে
মনের মধ্যে সতত শত সহস্র বাসনা ও কল্পনা হইতে থাকে
তখন সে মনে কি ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতে পারে, তা কখনই
নহে। এই গল্পে কবির দাস ও বলিয়াছেন—

হিন্দী ।

“কবির মালাতো কর মে ফিরে
জিহ্বা ফিরে মুখ মাহি;
মনুয়া তো চৌদিস ফিরে
এতে সমিরণ নাহি”

ইহার অর্থ এই যে, হাতে মালা ঘুরিতেছে, মুখ মধ্যে জিহ্বা

বেড়াইতেছে ও মন চাঞ্চিদিকে ছুটিতেছে, এ প্রকারে ঈশ্বরের নাম লওয়া হয় না । মনের মধ্যে ভয় হইলেই ভক্তি আসিয়া স্থান প্রাপ্ত হইবে ; অতএব সতত ঈশ্বরের কঠোর দণ্ডাজ্ঞাকে ভয় করিলেই, দেহ ও মন সতত সুস্থ থাকিবেই থাকিবে, এজন্ত কি বৃদ্ধাবস্থা কি যৌবনকাল উভয় কালেই আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নাম লইতে পারিবে, তবে যৌবন কাল ইন্দ্রিয় সমূহের প্রবল পরাক্রমের সময়, এই সময়েই তাহাদিগকে আপন ইচ্ছার অধিকারে আনিতে পারিলেই সর্ব সুখ, নিজ মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল ; তা বলিয়া এই যৌবন কালে সংসার ত্যাগ করা, বিবাহ না করা, অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন না করা এমন কি স্ত্রী সহবাস না করা, কোন প্রকারেই বুদ্ধিমান বক্তির কার্য্য নহে এবং জগৎ-পাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অথবা ইচ্ছাও তাহা নহে । তিনি এই উদ্দেশ্যেই আপন সৃষ্টিতে জীবের বুদ্ধি নিমিত্ত এই কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা না করিলে তিনি অশ্রু কোন প্রকারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন । তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী যখন যে কার্য্য করা কর্তব্য তদনুসারে সেই কার্য্য করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । যৌবন কালেই স্ত্রী গ্রহণ তাঁহার অভিপ্রায়, সম্ভান সম্ভতির উৎপত্তি তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ; অতএব তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাহা না করিয়া সংসার ত্যাগী সাধুগণের ন্যায় যৌবনাবস্থায় স্ত্রীর প্রতি অভক্তি কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে ; তাঁহারা এই স্ত্রী সম্বন্ধে বলেন—

হিন্দী ।

“দিন কি মোহিনী রাত কি বাধিনী

পলক পলক লেহুসে

ছুনিয়া সব বওরা হোকে ঘর ঘর বাধিনী পোষে”

ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী, দিবসে মনমুগ্ধকারিণী, রাত্রে ব্যাঘ্র-
রূপিণী, পলকে পলকে রক্ত শোষনকারিণী, সাংসারিক
ব্যক্তিগণ পাগল হইয়া আপন ঘরে ঘরে এইরূপ ব্যাঘ্রী
পুষিতেছেন। এই জন্তই তাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করেন না।
এইরূপ ভাব মনোমধ্যে রাখিয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করা
কাহারও কর্তব্য নহে। এই কালে উভয় দিক বজায়
রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিলে ঈশ্বরের নিকট
তাঁহার সম্মান শত সহস্র সংসারত্যাগী সাধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
সাধুকুলচুড়ামণী জনাব রসুলে খোদা দঃ ও জনাব হজরত
অলী করম অল্লাহ ওজুই আমাদিগকে তাহার দৃষ্টান্ত
দেখাইয়া গিয়াছেন।

২১। মানুষে অধিকাংশ স্থলে মাদক দ্রব্যের নেশার শ্রায়
আপন যৌবন, ধন, পদমর্যাদা ও সুখের নেশায় এরূপ উন্মত্ত
হইয়া যায় যে তৎকালে তাহার অন্তঃকরণে পরকালের চিন্তা
আদৌ স্থান পায় না, আপন সুখ ও সমৃদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরের কথা আপন মহতাগুণে অকৃতজ্ঞ
হইয়া গিয়া আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার গৌরব প্রকাশ করিতে
থাকেন। এমন কি অজ্ঞানের শ্রায় নির্ভিকতা সহকারে খোদা

ও রসুলের আদেশের প্রতি আদৌ গ্রাহ্য করেন না, বরং বিপরীত কার্য্য করিতে থাকেন । খোদাওন্দ করিম তাঁহাদের প্রতি যতই অনুগ্রহ ও কৃপা করিতে থাকেন তাঁহারা তাঁহাকে ততই ভুলিয়া গিয়া তাঁহার আদেশ ও ব্যবস্থার অবমাননা করেন । এই প্রকারেই ঈশ্বর আমাদিগকে পরীক্ষা করেন, যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং আপন বিবেক ও রিপু সমূহের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঈশ্বরাদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকেন ইহকালে তিনিই অশেষ প্রশংসনীয় ও পূজনীয় হন এবং পরকালেও খোদা ও রসুলের দঃ নিকট তদ্রূপ আদর পাইবার পাত্র হন ; নচেৎ ইহকালে যেমন নিন্দনীয় পরকালেও সেইরূপ ঘৃণিত হইবেন । খোদাওন্দ করিমের এই প্রকার অকৃতজ্ঞ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের আচার, ব্যবহার, নিষ্ঠা ও প্রবৃত্তির অনুকরণে সাধারণও ক্রমে অকৃতজ্ঞ হইয়া যায় ; যখন বিদ্বান্, ধনী, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের মতি ও গতি খোদা ও রসুলের দঃ প্রতি ছিল তৎকালে সর্বসাধারণও তাঁহাদেরই বশবর্তী হইয়া একতা, একাগ্রতা ও পরস্পরের সৌহৃদ্যতার সাহায্যে এই সমাজ উন্নতির চরম সীমায় গিয়াছিল ; এক্ষণে সেই অকৃতজ্ঞ, বিদ্বান, ধনী ও উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী রাজকর্ম্মচারিগণের আচার ব্যবহারাদির অনুকরণেই আমাদের দুর্দশা ।

২২ । মনুষ্য জীবনে ধর্ম্মই ইহকাল ও পরকালের সুখের প্রধান উপায়, (কোন ধর্ম্ম বিশেষে বলা হইতেছে না), যে উপায়ে আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে জানিতে, চিনিতে ও পাওয়া

যাইতে পারে তাহাই ধর্ম । রসূল কার্থীৎ পয়গম্বর মাত্রৈই ঈশ্বরকে জানাইবার, চিনাইবার ও তাঁহাকে পাওয়াইবার প্রথম অবলম্বন । জগতে অনেকেই পয়গম্বর হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বর আদেশে যে যার সময়ানুযায়ী আপন আপন মতাবলম্বী-গণের ইহকাল ও পরকালের সুখ, সচ্ছন্দতা, সংসারে শান্তি এবং সুশৃঙ্খলতা নিবন্ধন হেতু নানা প্রকার আদেশ ও নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন । ঈশ্বর তাঁহাদের ব্যবস্থার দৃঢ়তা জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ পূর্ব ও পরের ঘটনা সম্বন্ধীয় বিবরণ ও ইতিহাস যুক্ত ধর্ম পুস্তকও তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন । ঈশ্বর আপন সৃষ্টি কৌশলে তাঁহার সৃষ্ট জগৎ ও জগৎময় যাবতীয় পদার্থের আয়ুর সীমা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন । যেমন যাহার সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনই তাহাকে, উন্নতি, স্থিতি, অবনতি ও বিনাশের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন । তাঁহার সেই নিয়ম গুণেই জগৎময় যাবতীয় পদার্থে আমরা উৎপত্তি, উন্নতি, স্থিতি, অবনতি ও বিনাশ দেখিতে পাইতেছি, তদনুরূপ এই জগৎ সংসারের অবস্থাও তাহাই, ইহাকেও তিনি তাঁহার সেই একই নিয়মের বশীভূত করিয়াছেন । এক সময়ে ইহার নাম মাত্রও ছিল না, পরে উৎপত্তি হইল, তাহার পর ক্রমান্বয়ে ইহার উন্নতি, স্থিতি ও অবনতি সকলই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ; অবশেষে যাবতীয় পদার্থে বার্কিক্যের পরিণাম যেমন বিনাশ, তেমনই ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে এক সময়ে এই জগতেরও বিনাশ হইবেই হইবে । ঈশ্বর যখন আপন সৃষ্টি কৌশলের নিয়ম অনুসারে জগৎকেও উৎপত্তি ও উন্নতি

আদি নিয়মের বশীভূত, করিয়াছেন তখন সময় অনুসারে এই জগতেও যে তিনি নানা পরিবর্তন না করিয়াছেন ও না করিতেছেন এমন নহে; সেই পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী জগতে শাস্তিস্থাপনহেতু সময় অনুসারে একের পর অন্য ও অন্তের পর অপর রসূল অর্থাৎ পয়গম্বরের আবির্ভাব করিয়া আসিতেছেন; এই নিমিত্ত যখন যে সময়ে যে রসূলের আবির্ভাব হইয়াছে তখন তাঁহারই আদেশ ও ব্যবস্থা জগৎবাসি-গণের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সকলেই তাঁহার আদেশ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য করিতে ও তাঁহার অনুগামী হইতে বাধ্য, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। এই সংসার রাজ্যে যখন যে দেশে যিনি রাজা হইয়া থাকেন তখন তাঁহারই আদেশ সমূহ রাজ্যে ঘোষিত হইয়া যায় এবং সকলেই তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই জগৎ সংসার ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্য বিশেষ এবং রসূল ও পয়গম্বরগণ তাঁহার সেই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা। ধর্ম্ম বিষয়ে যখন যে রসূলের রাজ্য তাঁহারই মত সর্ব্ব জগতে প্রচলিত হওয়াই বিধি এবং ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, এই জগৎ এইরূপ হইয়াই আসিতেছে। এক্ষণে দেখিতে গেলে জগতের বর্ত্তমান কালই এক প্রকার জগতের অবনতির কাল বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এক্ষণে এই জগতে যাহাতে যত প্রকার অবনতি হইতে পারে সমূহ বিষয়ই একপ্রকার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, কেবল বিনাশের সময় অপেক্ষা মাত্র। জগতের এই শেষ সময়ে খোদাওন্দ করিম আপন ধর্ম্মরাজ্যের অবশিষ্ট কালের জগৎ সুখ ও শান্তির নিমিত্ত

আপন প্রিয়তম সর্বশেষ পয়গম্বর জনাব রসুলে মকবুল দঃকে অবতীর্ণ করেন ও পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে পূর্বস্থিত পয়গম্বরের অধিকার লোপ করিয়াছেন। এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ আমার পাক পয়গম্বরের দঃ আদেশ ও ব্যবস্থাই জগতে সর্বের সর্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তাঁহার পর জগতে আর কেহ পয়গম্বর হন নাই ও হইবেন না, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। জগতের এই শেষ সময়ে আর অন্য কোন পয়গম্বরের আবশ্যকতা নাই বলিয়াই তিনি আমার পাক পয়গম্বরকে শেষ পয়গম্বর বলিয়াই সমস্ত ধর্ম্য পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমার পাক পয়গম্বরের মতানুস্মরণ করিলেই ঈশ্বরকে জানিবার, চিনিবার ও প্রাপ্ত হইবার অতি সহজ উপায় পাওয়া যাইবে। এক্ষণে এই উপায় ব্যতীত আর অন্য কোন সহজ উপায় নাই ; অতএব এক্রূপ রসুলের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলেই আর কোন বিষয়েরই চিন্তা নাই। আন্তরিক ভক্তি সহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করা ও প্রতি সৎকার্য্যে তাঁহার দয়া প্রার্থনা করা মুখ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া লওয়া কর্তব্য। তাঁহারই দয়্য আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তির সোপান এবং ইহ সংসারে সুখের আগার ; অতএব কায়, মন ও বাক্য অর্থাৎ অন্তর, মুখ ও শরীর দ্বারা তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাই আমাদের কর্তব্য। অন্তর ও মুখের দ্বারা প্রীতি লাভের জন্য অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না, শরীরের দ্বারা প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হস্ত ও পদ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করা ও কার্য্য করিবার নিমিত্ত গমন

করাই হস্ত ও পদের কার্য্য । এই হস্ত আবার লেখনী অর্থাৎ কলমের সাহায্যেও তাঁহার পবিত্র গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঈশ্বর এই কলমের অশেষ গুণ ও ক্ষমতা দিয়াছেন এই জন্য কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“কলম গোএদ কে মন কাহে জাঁহানম

কলম কশরা বদওলং মি রসাঁনম

অগর বদ বখ্ত বাশদ মন চেদাঁনম

ওলেয় একবার দওলং মি রসাঁনম”

ইহার অর্থ এই যে, কলম বলিতেছে, আমি জগতের সামান্য তুণ বিশেষ, যে আমাকে চালায় আমি তাহাকে ধনসম্পত্তি দিয়া থাকি, যদি সে হতভাগ্যও থাকে তাহাতে আমার দোষ নাই, তত্রাচ তাহাকে একবারের জন্যও কিছু প্রদান করি । অতএব এই কলম যখন যাহার দ্বারা অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে তখন সেই কলম অগ্রে হাতে আসা মাত্রই সর্ব্ব প্রথমে তাহার দ্বারা খোদাওন্দ করিম ও তাঁহার প্রিয় পাক পয়গম্বর রসুলে খোদার দঃ নাম লিখা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অভ্যাসের বশীভূত হইয়া থাকা আমাদের উচিত । এই উদ্দেশে কোন ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“চু” কলম বদস্ত আরেদ নাম অল্লাহ

বারেদ নওস্ত, বাদ অজাঁ নামে রসুল”

ইহার অর্থ এই, প্রথমে হাতে কলম আসিলেই অগ্রে ঈশ্বরের নাম ও পরে মহম্মদের দঃ নাম লিখা আবশ্যক ।

২৩। খোদাওন্দ করিমের ফজ্জ অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয় আদেশ সমূহ আমাদের দ্বারা নিয়ত সূচারূপে, প্রতিপালিত হইতে থাকিলে তাঁহার সৃষ্ট জগতে সতত সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে, ইহাই খোদার বাসনা, এই জন্তই এই আদেশ সমূহকে ফজ্জ করিবার উদ্দেশ্য। আমরাও সেই কার্য্য সমূহ উত্তমরূপে সম্পাদনের ফলে ইহকালে সর্বপ্রকার সুখে সুখী ও দীর্ঘায়ু হইয়া চিরশান্তিতে কালযাপন করিতে থাকিব এবং তাঁহার ও তাঁহার রসূলে পাকের দঃ প্রিয় হইয়া পরকালে স্বর্গ-বাসী হইব ইহাও খোদার ইচ্ছা। আমাদের প্রতি পাক পরওরদেগারের ইহাই বাসনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইলে, আপন আত্মাকে কলুষিত ও কলঙ্কিত না করিয়া এবং পরের জীবনে কষ্ট না দিয়া, এই জগৎ সংসারকে অসুখি ও অশান্তি-কর না করিলেই যে প্রকারে হউক না কেন, খোদায়ে পাকের ফজ্জ সমূহ আদায় করিতে থাকিলে, এমন কি তন্মধ্যে সর্ব প্রধান ফজ্জ পবিত্র নমাজকে সূচারূপে সম্পন্ন করিতে থাকিলে, নমাজকালে মনোমধ্যে সত্য বা মিথ্যা, ভাল বা মন্দ, যতই যা কল্পনা উদিত হইতে থাকুক না কেন, তাহাতে পবিত্র নমাজের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না। পবিত্র নমাজকালে মনোমধ্যে কোন কামনা বা বাসনার চিন্তা আসিয়া পড়িলে নমাজ হইবে না বলিয়া যে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের আদেশ বা উপদেশ আছে তাহা কেবল মন ও আত্মার বিশুদ্ধিতার নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন মাত্র; অতএব নিজ দেহ ও মনকে এবং পর দেহ ও মনে অযথা বা অণ্ডায়রূপে অর্থাৎ নিজ স্বার্থের জন্ত

কষ্ট না দিয়া, ঈশ্বরের সৃষ্টি সংসারকে কিঞ্চিৎমাত্রও বিশৃঙ্খল না করিলেই খোদাওন্দ করিমের দরগাহে সর্বপ্রকার অবস্থাতেই এই পবিত্র নমাজের সম্পাদন জন্য শুভ ফল অবশ্যই পাওয়া যাইবেই যাইবে। এইরূপে পবিত্র হজরত সমাপনের ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ক অন্যান্য বিধি সমূহের জন্য, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ আমার জনাব রসূলে করিম দঃকে অগন্য ধন্যবাদ না দিয়া কেহ থাকিতে পারেন না, তাহাতেও এই জগতে সুখ ও শান্তির অশেষ কারণ নিহিত রহিয়াছে। তিনি যে এই চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই পবিত্র হজরুপ অতুলনীয় মহাসমিতি আমাদের ইসলাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং আপন জীবদ্দশায় যে সভা করিয়া প্রধান অমাত্য চারি জনার ও অন্যান্য সহায্যে করিম অর্থাৎ সভাসদগণের কার্য্য, যুক্তি ও পরামর্শানুসারে ধর্মরাজ্য পরিচালনা ও বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহার গুণের বর্ণনা ও তাহার উপকারিতার তুলনা করে কাহার সাধ্য। এক্ষণে তাঁহারই সেই অসাধারণ গুণের অনুকরণেই কত দেশে ও রাজ্যে কত প্রকার কংগ্রেস ও পার্লীয়ামেন্টের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে।

২৪। গৃহস্থধর্ম্যে বাস করিতে গেলে আমাদেরকে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণের বচন গ্রাহ্য করিয়া চলা কর্তব্য; যদিও আমাদের ইসলামধর্ম্যের শরশরীফে তৎসমুদয়কে কুসংস্কার বলিয়া থাকেন তাহা এক পক্ষে ন্যায় ও সঙ্গত; তবে অন্য পক্ষে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বচনের তাচ্ছিল্যতার ফল যখন দেখিতে পাওয়া যায় তখন উহা না মানিয়া থাকিতে পারা যায় না, উহা

মান্য করিতে গেলে অর্থাৎ তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলে যে কাহারও ধর্ম্মে কোন বিঘ্ন ঘটে তাহা নহে ; ইহা কেবল সাংসারিক ব্যবস্থা অনুসারে কোন কোন জীব জন্তু ও বস্তুর সহিত আমাদের শারীরিক গুণের সামঞ্জস্য মাত্র । মনুষ্যের মধ্যে যেমন পরস্পরে সন্মুক্ত রহিয়াছে ও গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত আমাদের যেমন ঘনিষ্ঠতা আছে প্রত্যেক জীব জন্তু বা পশুর সহিতও আমাদের তদনুরূপ কোন প্রকার সন্মুক্ত অসম্ভব নহে ; তদ্ব্যতীত অস্ত্র বা বস্ত্রের সহিতও আমাদের কোন না কোন প্রকার সন্মুক্ত থাকা বিচিত্র নহে ; বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সব বিষয় সম্যক্রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তদনুরূপ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, অতএব তাহা তাচ্ছিল্য করা অকর্তব্য । এমন অনেক দেশ আছে যে, তথায় এপ্রকার ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা ইহা জানেন না বলিয়াই মানেন না এবং তাহার কোন ভাল বা মন্দ ফলও বুঝিতে পারেন না কিন্তু তাঁহাদের দেশেও এমন অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে যে তাহা আমাদের দেশে বা আমাদের মধ্যে নাই এই নিমিত্ত আমাদের দেশের সংস্কার কোন দেশ বা জাতির সহিত তুলনা হইতে পারে না ; যে দেশে যে ব্যবস্থা বা সংস্কারের প্রচলন থাকে তাহারই অনুসরণ করিয়া চলা অনুচিত নহে । বিজ্ঞ লোকে বলিয়াছেন যাত্রাকালে বা পথিমধ্যে হটাৎ বামে সর্প বা দক্ষিণে শৃগাল দেখা দিলে সেই যাত্রার ফল অশুভ হইয়াই পড়ে ও দক্ষিণে সর্প বা বামে শৃগাল দেখা দিলে যাত্রা শুভ হয় । তদনুরূপ যাত্রাকালে হটাৎ হাঁচি টিক্‌টিকির শব্দ হইলেও যাত্রা

শুভ হয় না অথবা মাথায় বা পায়ে হটাৎ কিছু বাজিয়া গেলে
 কিম্বা শূণ্য কলস দেখিতে পাইলে কি কোন তেলী বা কলু
 দেখা দিলে যাত্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে । যাত্রাকালে হটাৎ
 কোন মনুষ্যের মৃতদেহ দেখা গেলে যাত্রার ফল ভালই হয় ।
 এই প্রকারে শৃগাল, কুকুর, বিড়াল ও কাকের ক্রন্দন ধ্বনি
 নিতান্ত অমঙ্গলজনক ফল দিয়াই থাকে । ইহারা যে স্থানে
 ক্রন্দন করে সেই গৃহে বা গ্রামে কি পল্লিতে অবশ্যই মনুষ্যের
 মৃত্যু ঘটয়াই পড়ে । চক্ষুর স্পন্দনও নিজের মঙ্গল এবং
 অমঙ্গলজনক ফল অনেক সময়েই দিয়া থাকে । বাম চক্ষের
 স্পন্দনে অমঙ্গল ঘটে, তবে বামচক্ষের উর্দ্ধ অংশের স্পন্দনে
 প্রায় ততদূর ঘটে না, একপ্রকার ভালই হয় কিন্তু নিম্নদেশের
 স্পন্দনে অমঙ্গল অনিবার্য, দক্ষিণ চক্ষে উর্দ্ধ কি অধঃ অংশের
 স্পন্দন শুভফলই দেয় । নাপিতের ক্ষৌরকার্য্যেও অনেক
 সময়ে ভাল ও মন্দ ফল ফলিয়া যায় । পূর্বেই বলা হইয়াছে
 যে, মনুষ্যশরীরের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদির বিশেষ অধিকার আছে,
 তন্নিমিত্ত সাধারণতঃ যে বারে অর্থাৎ দিবসে যে গ্রহ বা নক্ষত্রের
 অধিকার থাকে সেই গ্রহ বা নক্ষত্রের গুণানুসারে সেই সময়ে
 মনুষ্যশরীরের মধ্যে কোন অঙ্গের কোন অংশ ক্ষৌর করণ কি
 ছেদন করিতে গেলে তাহার ফল তদনুসারেই ভাল বা মন্দ
 হওয়াই সম্ভব । এই শরীরের মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি
 বিবেচনা ও গ্রহ, নক্ষত্রের ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিস্তৃত
 ব্যক্তিগণ ক্ষৌর কার্য্যের জন্য সোমবার ও বুধবারের ফল শুভ
 বলিয়াই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমার পবিত্র শ্রী

শরীফ অনুসারে পবিত্র শুক্রবার দিবস এই সব বিষয় ও অন্যান্য সমূহ কার্যের জন্য বিশেষ শুদ্ধ ও প্রশস্ত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বৃহস্পতিবারও তাহার নিম্নে স্থান পাইয়াছে। ইহার উপর আমাদের কাহারও কোন প্রকার বিজ্ঞা বা বুদ্ধি খাটাইবার কোন ক্ষমতা নাই, তবে ইহা কেবল বারের পবিত্রতার উপর নির্ভর করিয়া কার্য করা মাত্র। এই পবিত্র বারদ্বয় ও সোমবার আমাদের পবিত্র শরা শরীফ অনুসারে বিশেষ পবিত্র বার বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই বারত্রয়ের রাত্রিও বিশেষ পবিত্র এবং শুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। আমার ধর্ম অনুসারে রাত্রি অগ্রে ও তাহার পর দিবস গণনা হইয়া থাকে, ইহাই সঙ্গত, কারণ সূর্যের সৃষ্টি হইবার পূর্বে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্নছিল; সূর্যের সৃষ্টি হইলে পর জগতের অন্ধকার দূর হইয়া আলো হয়, সেই আদি কালের অন্ধকার ও আলো ধরিয়াই অগ্রে রাত্রি ও পরে দিবস ধরা হইয়া আসিতেছে; এই অনুসারে এই বারত্রয়ের মধ্যে সোমবার ও শুক্রবারের রাত্রি অর্থাৎ রবিবারের দিবস গণ্য হইবার পর ও বৃহস্পতিবারের দিবস গণ্য হইবার পর যে যে রাত্রি তাহাকেই সোমবারের রাত্রি ও শুক্রবারের রাত্রি বলা হয়, এই রাত্রি দুইটী আমাদের পবিত্র শরা শরীফ অনুসারে বিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই দিবসদ্বয়ে ও তাহাদের রাত্রে যে সৎকার্যই করা হউক না কেন খোদাওন্দ করিম তাহার শুভফল দিয়াই থাকেন, ইহাও খোদাও রসুলে পাকের দঃ বাক্য, তাহা কখনই লঙ্ঘিত হইবার নহে। বিদেশে

বা স্থানান্তরে যাইতে হইলে শরা শরিফ অনুসারে পবিত্র বার ধরিয়াই যাওয়া কর্তব্য কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিকার ধরিয়া ও বারের শুভ ও অশুভ ফলের বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতগণ যাত্রা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও মান্য করিয়া চলা অকর্তব্য নহে, তাহার বৈলক্ষণ্যে অনেক সময়ে অনেক প্রকার অশুভফল ফলিতে দেখা গিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“ব এক শম্বা, আদিনা, ব মগরব মরও,
ব শম্বা, দোশম্বা, ব মশরক মশও,
ব সেশম্বা, চাহার শম্বা, শোমালেখতা,
ব পঞ্জশম্বা, রফতন জুববে বলা ।”

ইহার অর্থ এই যে, রবিবার ও শুক্রবার পশ্চিমদিকে যাওয়া নিষেধ, শনিবার ও সোমবার পূর্বাভিমুখে যাত্রা নাস্তি, মঙ্গল-বার ও বুধবার উত্তরদিকে গমন দোষ, বৃহস্পতিবারে দক্ষিণাভিমুখে গমন বিপজ্জনক, হিন্দুগণের মতও ঠিক ইহাই। এইরূপে কোন স্থানে যাত্রা ও কোন শুভকার্যে হস্তার্পণাদি বিষয়ে বারবেলাদি (যাহাকে আমরা জওয়ালের সময় বলিয়া থাকি) অন্যান্য অশুভ নক্ষত্রাদির অধিকার কাল বাদ দেওয়াও কর্তব্য। বিবাহাদি শুভকার্যের সময়ে অন্ততঃ পক্ষে আর কিছু হউক আর না হউক যাত্রার জন্য দিকশূল ও শুভ বিবাহের জন্য চান্দ্র মাসের গণনা অনুসারে ৩।১৩।২৩ ও ৮।১৮।২৮ এই

ছয়টি তারিখ বাদ দিয়া বিবাহের দিন স্থির করা নিতান্ত কর্তব্য, ইহা আমাদের পবিত্র শরা শরিফের ব্যবস্থা। ঈশ্বর যে মনুষ্যকে যে গ্রহ বা নক্ষত্রের অধিকার কালে জন্ম দিয়াছেন, সেই গ্রহ বা নক্ষত্রের গুণানুসারে বা ক্ষমতাবলে সেই মনুষ্যের প্রতি যখন যাহা মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটনা ঘটিবার থাকে ঠিক তখনই তাহা ঘটয়াই যায়। অধিকাংশ স্থলে পূর্ব হইতে তাহা কেহ সম্যক্রূপে নির্ণয় করিতে পারে না। এইরূপে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের প্রতি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না বলিয়াই উপস্থিত গ্রহ ও নক্ষত্রের ফলাফলের উপর বিচার করিয়া সকলে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ অনুশীলনের বিচার ফল বিদ্যাবলে সম্যক্রূপে নির্ণীত হইতে পারে না ও ভবিষ্যৎ বিষয় লোকে জানিতে পারিলে সংসারে বিহ্বলতার শ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া অরাজক পুরি হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে এই প্রকারে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা নিষেধ আছে ; তবে দেশাচার ও লোকাচারে কোন কোন বিষয়ে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায় বলিয়াই আমাদের পণ্ডিতগণও তাহার এক একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যেমন কোন নূতন বস্ত্র প্রস্তুত জন্য কোন বস্ত্র কাটাইতে হইলে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মান্য কর্তব্য যথা :—

পার্শী ।

“বুরিদন আময়ে নও রা তুমি দাঁ,
ব এক শহা বুঅদ গম গিঁ পেরেশাঁ,

কোশায়েদ, রিঙ্কক রোজি দর দোশয়া,
 বদরুদ ইয়া বসোজদ দর সে শয়া,
 ব রোজে চাহার শয়া শাদ বাশদ,
 ব পঞ্জ শয়া মোবারক বাদ বাশদ,
 ব রোজে জুমা গঞ্জ ও মাল ইয়াবদ,
 বশয়া রঞ্জ ও গম ফিল হাল ইয়াবদ ।”

ইহার মর্ম এই যে, রবিবার, মঙ্গলবার ও শনিবার দিবস নব বস্ত্র কর্তন কোন প্রকারেই উচিত নহে ইহার ফল মন্দ অপর বারে নূতন বস্ত্র কর্তন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র নির্মাণ করিলে তাহার ফল মঙ্গলদায়ক হইয়াই থাকে । এই প্রকারে নব বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ শুভ ও অশুভফলের বিচার করিয়া তাহার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহার তাচ্ছিল্য করা কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে । ইহার অমঙ্গলজনক ফল অনেকই পাইয়া থাকেন ; হয়ত অনেকই তাহা জানিতে পারেন না বলিয়া বুঝিতেও পারেন না । এই উদ্দেশে কোন্ বহুদর্শী ও জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“অগর খাহি কে পোষি জাময়ে নও
 অজাএব হিকমতে নেকোস্ত বিশনও,
 ন পোষি রোজ শয়া জামা জিনহার,
 চো পোষি জামা খাহি গস্ত বিমার,
 ব এক শয়া চো জামারা বপোষি,
 বসদ রাহত বসে নিয়ামৎ বনোসি,

ব দোশবা চো পোশি জাময়ে থাক,
 পয়ে মহৈয়ং কুনি আঁ জামা রা চাক,
 ব সেশবা কে জাময়ে নও ব পোশি,
 ব শোজদ ইয়া মিয়ানে আব বাশী,
 বকুন দর চাহার শবা জামা দর বর,
 কে আয়েদ বর সরঁ জামা দিগর,
 ব পঞ্জশবা চো পাশি জামা শায়েদ,
 কে তা আঁ জামায়ং জেবা নাময়েদ,
 ব রোজে জুমা তু মিপোশ জামা,
 চে অজ তাজ ও চে দস্তার ইমামা,
 কে তা আঁ জাময়ে তু বর তনত হস্ত,
 তু বাশী শাদ ছ'নয়া অও দহদ দস্ত।”

ইহার মর্ম এই যে, শনিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার নব বস্ত্র
 পরিধান ফল মন্দ, অবশিষ্ট বারে নব বস্ত্র পরিধান করিবার
 ফল উৎকৃষ্ট।

দশম অধ্যায় ।

দীক্ষা অর্থাৎ পিরো ও মুরিদী ।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে বিদ্যার দ্বারা ঈশ্বরকে চিনিতে পারা যায় সেই বিদ্যাই মহাবিদ্যা । যে কোন বিদ্যাই হউক না কেন, তাহার অধ্যয়নে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই ঈশ্বরকে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়, ইহাই বিদ্যার গুণ । লোকে সাধারণ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধি ও বিবেচনা বলে কেবল আপন সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিয়া থাকে মাত্র কিন্তু ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে বা উৎপন্ন করিতে পারে না । বিদ্যাবলে ঈশ্বরের সহিত বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রণয় স্থাপন হইতে পারে এবং তাঁহার দর্শনলাভও করিতে পারা যায়, তাহা কিন্তু স্বতন্ত্র বিদ্যা ; এই বিদ্যাই মহাবিদ্যা ও অসাধারণ বিদ্যা ; ইহার দ্বারা আপন পরকাল উদ্ধার করিতে পারা যায় । সংসারযাত্রা নির্বাহ জন্ম যে বিদ্যা অধ্যয়ন করা যায় তাহার নিমিত্ত শিক্ষক ও পুস্তকের আবশ্যক কিন্তু পরকালের বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য পুস্তকের আবশ্যক করে না, তাহার পুস্তক পাঠ করিয়া কোনই ফল হয় না, সাংসারিক বিদ্যার জন্য যেমন শিক্ষক আবশ্যক তেমনই ইহার জন্যও দীক্ষাগুরু অর্থাৎ মুরশেদের আবশ্যক । ইহার গুরুই সর্বো সর্বো, এই বিদ্যাকেই যোগ বিদ্যা বলে । ইহার জন্য গুরুর মন্ত্রও গুরুর আদেশ

অনুযায়ী সাধনাই প্রধান । সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও মজ্জের সাধনা হইতে পারে এবং সংসার ত্যাগ করিয়াও অনেকে সাধনা করেন । সংসারে লিপ্ত থাকিয়া ইহার সাধনা করিতে পারিলে পরিণাম অতি উজ্জ্বল হইয়া থাকে । যে কোন ধর্মাবলম্বী হউন, না কেন সাধনা করিতে গেলে তাঁহার গুরুর দীক্ষা আবশ্যিক, গুরুর দ্বারা দীক্ষিত না হইলে সাধনায় কোন ফল হয় না । এই দীক্ষার জন্য আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে পবিত্র কলাম শরিফের সূরায় “ফতেহ” তাহা প্রমাণ করিতেছে । আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে এই বিদ্যা আবহমান কাল কেবল সীনা দর সীনা অর্থাৎ অন্তরে অন্তরেই হইয়া চলিয়া আসিতেছে । ইহাই মারফতের বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য যোগ বিদ্যা, (ইহার ব্যখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে) ইহাকেই ফকিরী অর্থাৎ দরওয়েশী বিদ্যা কহা যায় । আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে জনাব রসুলে করিম দঃকে খোদায়ে পাক মায়রাজ শরীফে খিরকয়ে দরওয়েশী প্রদান করিয়া তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান দান করেন । পুস্তকে এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, তিনি নিম্নলিখিত দশজন মহাপুরুষকে মুরিদ করিয়া জ্ঞান দান করিয়া ছিলেন, ও আপন খিরকয়ে দরওয়েশী খোদায়ে পাকের আদেশ অনুসারে আপন প্রিয় জামাতা আমিরুল মওমিনিন হজরত অলি করম অল্লাহ ওজহকে সমর্পণ করেন । হজরত অলি ৭০ জনকে মুরিদ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক জনকে খেলাফৎ অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রত্যেককে খলিফা অর্থাৎ স্বাধীনরূপে

দীক্ষা করিবার ক্ষমতা বা অধিকার প্রদান করেন । প্রথম দশ মহাত্মার পবিত্র নাম :—

- ১। হজরত আলি মুরতেজা রজি অল্লাহ অনহ ।
- ২। ” আবু বকর সিদ্দিক ”
- ৩। ” উমর কারুখ ”
- ৪। ” উসমান গনী ”
- ৫। ” তলহা ”
- ৬। ” জোবয়ের ”
- ৭। ” বুওবেদ বিনজব্রাহ ”
- ৮। ” সাদ বিন কাস ”
- ৯। ” সইদ ”
- ১০। ” অবদুর রহমান ”

হজরত আলি করম আল্লহ ওজহ যে সকল ব্যক্তিকে মুরিদ করেন তাঁহাদের মধ্যে ৪ চারিশ্পীর ৭ সাত গোরোহ ও ১৪ চৌদ্দ খানওয়াদার সৃষ্টি হইয়া সিল-সিলায়ে ফকিরী হইয়া আসি-
তেছে । (যে যার পীরের পর হইতে হজরৎ আলিপর্ষ্যন্ত সিলসিলা অনুযায়ী মুরসেদগণের নামের লিষ্ট অর্থাৎ ফর্দকে “শীজরা” কহে) । এই চারি পীর সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বলেন ।

প্রথম মতে ।

- ১। হজরত ইমাম হসন রজি অল্লাহ অনহ
- ২। ” ” হোসেন ”

- ৩। হজরত খাজা কমিল বিন জিয়াদ রহমতুল্লা অলৈয়হে
৪। ” ” হাসন বসরী ”

দ্বিতীয় মতে ।

- ১। হজরত খাজা ওয়েসকর্ণী রজি অল্লাহ অনহ
২। ” ” হাসনসিরুরী ”
৩। ” ” কমিল বিন জিয়াদ রহমতুল্লা অলৈয়হে
৪। ” ” হাসন বসরী ”

তৃতীয় মতে ।

৩য় ও ৪র্থ মহাত্মার নাম আছে, তদ্ব্যতীত ১ম ও ২য় স্থলে হজরৎ আবদুল্লামক্কি ও হজরত আবদুল্লা বহরির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন মতের মধ্যে কোন্ মত প্রবল তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ; আজ পর্যন্ত তাহার মীমাংসা হয় নাই। এই চারি পীর হইতে সাত গোরোহ অর্থাৎ খানদান হইয়াছেন, যথা—

১ম কমিলিয়া	হজরত খাজা কমিল বিন জিয়াদ হইতে
২য় বসরিয়া	” ” ওয়েস কর্ণী হইতে
৩য় অনসারিয়া	” ” অনসারী হইতে
৪র্থ কলন্দরিয়া	” ” মদায়েওনী কলন্দর হইতে
৫ম সোলেয় মানিয়া	” ” সোলেমান ফার্সী হইতে
৬ষ্ঠ নখশ্ বন্দিয়া	” ” কাসেম বিন মহম্মদ বিন অবি- বকর সিদ্দিক রজি অল্লা অনহ হইতে

৭ম সিরুরীয়া হজরত খাজা হসন সিরুরী সকতি হইতে । উপরি
লিখিত চারি পীরের মধ্যে ৪র্থ পীর হজরত খাজা হসনবসরী
ক একজন খলিফা করেন তাঁহাদের মধ্যে—

১ম হজরত খাজা আবদুল ওয়াহেদ বিনে জয়েদ কুদস্থল্লাহ সিরুর
২য় ” ” হবিব অজমী ”

প্রধান ছিলেন, তন্মধ্যে

১ম হইতে	১। জয়েদ
	২। আয় আজিয়া
	৩। অধমিয়া
	৪। হায় বরিয়া
	৫। চিশ্‌তিয়া
২য় হইতে	১। হবিবীয়া
	২। তায় ফেরিয়া
	৩। করখিয়া
	৪। সকতিয়া
	৫। জোনায় দিয়া
	৬। গাজরওনিয়া
	৭। তিরতওসিয়া
	৮। ফের দওসীয়া
	৯। সহর ওরিয়া

ইহাদের এই ১৪ চৌদ্দ মহাপুরুষের নামেই ১৪ চৌদ্দ খান
ওয়াদা জারি হইয়া আসিতেছে । ইহাদের সহিত ৭ সাত

[illegible]

- ৩। করখিয়া হজরত খাজা মারুফ করখী অজীজ হইতে
 ৪। সকতিয়া „ „ হসনসিরুরী সকতি „ „
 ৫। জোনায় দিয়া „ „ জোনায়েদ বোগদাদী „ „
 ৬। গাজরওনিয়া „ „ আবু এসহাক গাজর ওনী „ „
 ৭। তির তওসীয়া „ „ আবুল করেহ তেরতওসী „ „
 ৮। ফের দওসীয়া „ „ নজিবউদ্দীন কবরা ফেরদওসী „ „
 ৯। সহরওরিয়া „ „ সেখ শাহাব উদ্দীন সহরা ওরদি „ „
 এই কাদরিয়া খানওয়াদা হইতে ১৭ গোরোহ হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে এক গোরোহ আছেন তাঁহাদিগকে সদা গোহাগ বলে। আর এক গোরোহ আছেন তাঁহারা পায়ে ঘুঙ্গুর পরিয়া থাকেন। আর এক গোরোহ আছেন তাঁহারা আপন মুখে মাটি মাখেন ও চারি আবরু সারফ করিয়া রাখেন এবং মাথায় একটী রুমাল বান্ধিয়া থাকেন। আর এক গোরোহ আছেন তাঁহারা আপন আপন কপালে আলিফ অক্ষরের খায় খুলির দ্বারা দণ্ডরেখা একটী করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দু ফি মুসলমান তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারা কঠিন। এই কাদরিয়া খান ওয়াদার ৭ম খানওয়াদার মধ্যেই হজরত গওস রব্বানী, সরচশময়ে হক্কানী জনাব গওস্থল আজম পীরান পীর দস্তগীর

✓ হজরত খাজা সইয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদর জীলানী কুদ সুল্লাহুল অজীজ হইতেছেন, এক্ষণে ইহারই তরিকা পৃথিবী মধ্যে প্রের্ত ; খোদাওনতাল্লা ও রস্থলে মকবুল দঃ ইহাকে অসাধারণ ক্ষমতা ও অসীম ইজ্জৎ এবং মরতবা প্রদান করিয়াছেন। এই মতের মুরিদানই পৃথিবী মধ্যে অধিক। হিজরী

সন ৪৭০ সালে অজম দেশে ইঁহার জন্ম, ইনি বগদাদনগরে দেহত্যাগ করেন, এই নগর তাঁহার পাক ও পবিত্র দেহ ধারণ করিয়াছে বলিয়া জগতে বগদাদ শরিফ বলিয়া খ্যাত । জনাব হজরত পীরান পীর দস্তগীর রবিওসমানী মাসের ১১ই তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করেন বলিয়া তাঁহার মতাবলম্বীগণের মধ্যে অনেকেই প্রতি বৎসর ঐ তারিখ ধরিয়া কাতিহয়ে এয়াজ্জদহম করিয়া থাকেন । নখশ বন্দীয়া খানদানের মধ্য হইতে মুজদদিয়া খানদান হইয়াছে, এই খানদান হজরত আহমদ মুজদদেসানী হইতে জারী হইয়াছে । জনাব রসুলে খোদা দঃ হইতে আপন পীর পর্য্যন্ত, কে কাহার মুরীদ, তাহা জানিবার পন্থাকে সিল-সীলা কহে । এই পীরগণের যোগ, তপস্যা ও সাধনার প্রক্রিয়া ভেদে ইঁহাদের মতভেদ ও তদনুসারে অনেকের মধ্যে বাহ্যিক আচার ও ব্যবহারেরও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় ; ফলে সকলই এক, কেহ শরীরের উপর কষ্ট স্বীকার করিয়া সাধনা করেন, কেহ বা নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা তপস্যা করেন । হিন্দু ধর্মের যোগ অনুযায়ী সাধনা ও এইরূপ, আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মের যোগ সাধনার নিমিত্ত চারি স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা “নাস্তত,” “মলকুত,” “জবরুত” ও “লাহুত” । সাংসারিক চারি পথের সহিতও ইঁহাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, (যথা “শরিয়ত,” “তরিকত,” “হকিকত” ও “মারফত” । ইঁহাদিগকে তরিকা কহা যায় । এই চারি তরিকা হইবার কারণ এই যে, জনাব পাক পয়গম্বর মহম্মদ মুস্তফা দঃ প্রকাশ্যভাবে পবিত্র বাক্য দ্বারা যাহা প্রকাশ করিয়া

(গিয়াছেন তাহাই শরিয়ত, উহা কিন্তু অন্ধকার রাত্রেৰ শ্মায়
 (ইহা ফকির অর্থাৎ সাধুব্যক্তিগণের বচন) । তরিকত তাঁহার
 কার্য্য, নক্ষত্র স্বরূপ । ইকিকত তাঁহার বিবরণ, চন্দ্রের সম-
 তুল্য । মারফত তাঁহার গুঢ় মর্ম্ম, উহা সূর্য্য সদৃশ । কিন্তু প্রকৃত
 প্রস্তাবে তুলনা করিতে গেলে শরিয়ত যেমন তরলী, তরিকত
 সমুদ্র, ইকিকত ডুবুরু ও মারফত মুক্তা হইতেছে । এই যোগ
 বা সাধনা বিজ্ঞার শিক্ষা অবলম্বন করিলে ক্রমান্বয়ে প্রথম
 তিন স্থান অতিক্রম করিয়া যখন সর্ববশেষ স্থান লাভিত অর্থাৎ
 মারফত প্রাপ্ত হন তখনই তিনি মুক্তা হস্তগত করিতে পারেন
 অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারেন, এমন কি তিনি
 ঈশ্বরে লীন হইয়া যান ।) এই মহাবিজ্ঞা ও অসাধারণ বিজ্ঞার
 জ্ঞান প্রকৃত ও সিদ্ধ গুরুর নিকট দীক্ষা বা মন্ত্র লওয়া আবশ্যক ।
 প্রত্যেক ধর্ম্মেই দীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং প্রায় সকলেই
 দীক্ষিত হইতেছেন ও ধর্ম্মের আদেশ পালন করিতেছেন ;
 এই নিমিত্ত অনেকেরই পৈত্রিক গুরু রহিয়াছে, তিনি পৈত্রিক
 বলিয়া জোর করিয়াই মন্ত্র দিয়া থাকেন ও অনেকে তাঁহা-
 দিগকে আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের গুরু বলিয়াই ছাড়েন না
 তাঁহারই নিকট মন্ত্র লইয়া থাকেন । এই প্রকার পৈত্রিক গুরুর
 কোন গুণ বা ক্ষমতা আছে কিনা তাহা দেখেন না ; অনেকের
 এই বিবেচনার ধারণাই নাই এবং অনেকের আবার এইরূপ
 বিচার ও বিবেচনা করিবার কোন ক্ষমতাই নাই এই জ্ঞান আপন
 সেই পৈত্রিক গুরুকেই মহৎ বলিয়া বুঝিয়া লন ; এই নিমিত্ত
 মুরিদান অর্থাৎ শিষ্য মণ্ডলীর এইরূপ বিবেচনা শক্তির খর্ব্বতা

দেখিয়া এই প্রকার গুরুগণ একবার একদিন মাত্র মন্ত্রদিয়া বা দীক্ষা দান করিয়া আপন জীবদ্দশার জন্ত অথবা পুরুষানুক্রমে সময়ান্তরে এমন কি বৎসরান্তে আগমন করিয়া এক প্রকার উপায় করিবার নিমিত্ত বেশ, সুন্দর ও সহজ পদ্মা অবলম্বন করিয়া লন ; এবং সময়ে মন্ত্র, তন্ত্র দ্বারা ও কবজ, মাটুলী অর্থাৎ দোয়া তাবিজ আদি প্রদান করিয়া কিস্মা কেহ সাদা কাগজ এক খণ্ডকে (ইহা স্বচক্ষে দেখা) উত্তমরূপে ভাঁজ করিয়া দিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে গলায় বা বাহুতে বান্ধিয়া রাখিবার জন্ত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ও বেশ দু পয়সা উপায় করিয়া লন। এইরূপ গুরুর নিকট বিশেষতঃ যাঁহার এই প্রকার ব্যবসায় আছে তিনি পৈত্রিক হউন কি নাই হউন, উপযুক্ত হউন কি নাই হউন, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া বা দীক্ষিত হওয়া কোন অংশেই উচিত নহে। যিনি আপন রিপূর বশীভূত, অর্থাৎ যিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না ও যিনি আপন অযথা অন্তায় স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না এবং যাঁহার অন্তঃকরণে ঈর্ষা, দ্বেষ ও মিথ্যার সংশ্রব বিদ্যমান আছে ও তাঁহার দেহ ও মনকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার নিকট মন্ত্র লওয়া অথবা দীক্ষিত হওয়া দূরের কথা, তাঁহার সংশ্রবে থাকাই অকর্তব্য। এইরূপ অবস্থায় যিনি আপন পরকাল উদ্ধার করিবার জন্ত চিন্তা করিবেন, তিনি গুরু অন্বেষণ করিয়া অর্থাৎ গুরুর দোষ ও গুণ তত্ত্ব করিয়া এমন কি গুরু নির্বাচন করিয়া দীক্ষিত হইতে পারেন। সাধারণ কথায় বলে :—

“গুরু করবে জেনে ও জল খাবে ছেনে।”

অতএব গুরুর গুণ পরীক্ষা করিয়া গুরু অবলম্বন করা কর্তব্য, তবে যেন গুরুর তত্ত্ব করিতে করিতে অদীক্ষিত থাকিয়াই কাল কাটিয়া না যায় । প্রত্যেককে মন্ত্র লওয়া চাই এবং সেই মন্ত্রের সাধনা করাও আবশ্যিক, নচেৎ পরকালে পরিত্রাণের আশা খুব কম । এই মন্ত্র বা দীক্ষার দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা হইয়া থাকে, আত্মা বিশুদ্ধ হইলে দেহ ও মন উজ্জ্বল ও নিশ্চল হইয়া অন্যান্য ও অধর্ম্য কার্য্য হইতে বিরত থাকে, অতএব ইহাতেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধিত হয় । এক্ষণে অনেক গুরু অর্থাৎ পীর সাহেবগণের গুণ অনেক প্রকার প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তবে ইহা যে কেবল হালের, তাহা নহে, বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে । আমাদের মধ্যে স্থান বিশেষে ইহাঁরা কোথাও “মিঞাজি” কোথাও “মিঞা সাহেব” কথিত হইয়া থাকেন । ইহাদের মধ্যে কেহ বাৎসরিক কর আদায়ের পীর সাহেব, কেহ ছুরী পড়িয়া দিবার পীর সাহেব, কেহ পৈত্রিক পীরত্ব গুণেই পীর সাহেব, কেহ দোয়া তাবিজের জন্তই পীর সাহেব, কেহ সামান্য ভূত ও পেত্নী ছাড়াইবার জন্তও পীর সাহেব, কেহ বা জীনখবিস তাড়াইবার ও তেগ চাপাইয়া অথবা ধরিবার জন্তই পীর সাহেব, কেহ মোলুদ শরিফ পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্তও পীর সাহেব, কেহ বা টুমটাম ওয়াজ, নসিহত ও মুরিদানগণের মনরক্ষার্থের হৃদিস বয়ান করিবার পীর সাহেব, কাহারও বা রুজুয়াতের ইসম ২৪টি অমল থাকায় তাঁহার কেরামত ও বুজুরুগাঁ দেখিয়াই পীর সাহেব, কেহ বা প্রকাশ করেন আমি মুরিদ করি না, পিরী ও

মুরিদী করিবার জন্য আমার পীরের আদেশ আমার প্রতি নাই, তবে (আমতা আমতা করিয়া) লোক বিশেষে ২।৪ জন মাত্র । কেহ বা ২।৫ জন কিস্বা ক্ষমতা অনুসারে ১০।২০ জন অনুচর বেষ্টিত হইয়া কিস্বা বেতনভোগী অনুচর নিযুক্ত করিয়া রাখেন, তাঁহারা নিয়ত অপরের নিকট পীর সাহেবের গুণের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াই থাকেন, কখন প্রকাশ করেন “অন্য দশ দিন হইল হুজুর গোশাতে আছেন ;” কখন বলেন “পাঁচ দিন হইল হুজুর চিল্লা লইয়াছেন, আহা! অন্ন একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন কেবলমাত্র এক গণ্ডুজ জলের উপর নির্ভর, এই সামান্য বয়সে হুজুরের এই প্রকারে ১০।২০ চিল্লাই হইয়া গেল, খোদায়ে পাক তাঁহাকে ভূত ও ভবিষ্যত ও বর্তমান সমূহ বিষয় রওশন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি হাসেলের কলাম অর্থাৎ বাক্যসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, যখন যাহাকে যাহা বলেন তখনই তাহার প্রতি তাহাই ফলিয়া যায় । হুজুরের দর্শনলাভ করাই দুর্কর, হুজুরের আদেশ না হইলে নিকটস্থ হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই । হুজুর অনেক সময়ে রোজাই রাখেন এবং তসবিহ ও তেলাওতে মশগুল থাকেন” ইহাতে পীর ও অনুচরগণের ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্ন হইয়া যায়, অনুচরগণের এইরূপ কার্য্যেই পীর সাহেবের গুণ ও ইজ্জতের আর সীমা থাকে না । বহুকালের বচন আছে—

পাশী ।

“পীর! নমি পরন্দ মুরিদ! মি পরানন্দ ।”

ইহার অর্থ এই যে পীরগণ উড়িতে পারেন না কিন্তু মুরিদানগণ

পীরগণকে উড়াইতে থাকেন। এই প্রকারে পীর সাহেবগণ অনেকেই ইহসংসারে যে যার গুণ ও ক্ষমতা অনুসারে বেশ দু পয়সা উপায় করিয়া লইতেছেন ; ইহাদের অর্থই সংসারের সার। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও স্থান ও ভাষা বিশেষে ‘খোন-কারজী’ও বলিয়া থাকেন। ইহাদের স্বভাব চরিত্র ও কার্য-কলাপ দেখিয়া ইহাদিগকে “খুঁখার” অর্থাৎ রক্তশোষক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে এমন কেহ বলিতে পারেন না যে, এখন কোথাও উপযুক্ত পীর নাই, অনেক স্থলে অনেকেই পীরের উপযুক্ত পীর রহিয়াছেন, এইরূপ অনেক স্থলে পীরের দরগা রহিয়াছে। আমি এস্থলে এরূপ কোন স্থান ও ব্যক্তি বিশেষের নাম করিতে পারিলাম না এবং আমিও যে সকলকেই জানি তাহাও নহে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমি আপন পীর ও মুরশেদ জগদ্বিখ্যাত, বিদ্যার সাগর, প্রকৃত সাধু ও সিদ্ধ-পুরুষ, নিঃস্বার্থবান মহাপুরুষ, প্রসিদ্ধ জোনপুর নিবাসী প্রাতঃ-স্মরণীয় জনাব মন্তুলানা সৈয়দ কেরামত আলিশাহ কুতুব রব্বানী মরহুম ও মগফুর সাহেবের মাত্র নাম পাক উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। খোদায়ে পাক আপন রসুলে মকবুলের দঃ তোফায়েলে তাঁহাকে অশ্রদ্ধাশে প্রশংসার অতীত করিয়াছিলেন। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতা কি যে তাঁহার প্রশংসা করি ; ইসলাম জগতে তাঁহার নাম এখন ও কাহারও অবিদিত নাই। খোদাও রসুল দঃ তাঁহার পবিত্র আত্মার ও তাঁহার বংশধরগণের মঙ্গল করুন এবং রোজগারী পীর সাহেবগণকে হেদাত্রং করুন ইহাই প্রার্থনা।

২। (পীর ও মুরশেদগণ স্বভাবত “সুফি” নামেই অভিহিত হন, ইহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়, “সালেক” ও “মজজুব”) ইহাদিগকেই পীর, ফকির, দরওয়েশ ও আওলীয়া আদি বলা হয়। মজজুবগণ সচরাচর “তারেকদ-দুনিয়া” অর্থাৎ সংসার-ত্যাগী হইয়া থাকেন, সালেকগণ তাহা হন না, তবে কোন মজজুব পরে সালেকও হইয়া যান এবং কোন সালেকও পরে মজজুব হইরা পড়েন। সালেকগণ স্বভাবত পবিত্র শরা শরিফের বশবর্তী হইয়া থাকেন কিন্তু মজজুবগণ প্রায়ই তদ্রূপ হন না, ইহারা আপন কর্মে যে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে থাকেন তাহার নিকট সাংসারিক মিথ্যা সুখ তুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান হয় এবং সাংসারিক বিধি ও ব্যবস্থা অর্থাৎ পবিত্র শরা শরিফের বশীভূত হইয়া থাকিতে পারেন না। কেহ বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন, কেহ উদাসীন হন, কেহ বা বোবা, কেহ বা পাগল সাজিয়াই নানা স্থানে বেড়াইতে থাকেন, কেহ বা সাধারণের নিকট ঘূর্ণায় হইবার বাসনায় অপবিত্র স্থানে থাকিয়া কুকুর ও বিড়ালাদি সহ উচ্ছিষ্টাদি অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণের প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন; ফলতঃ যিনি যখন যে প্রকারে থাকিবার জ্ঞান আদিষ্ট হন তিনি তখন তদ্রূপই কার্য করিতে থাকেন। ইহারা যাহাকে আপন মত হইতে পারিবে বলিয়া দেখিতে বা বুঝিতে পারেন তাঁহাকেই আপন গুরুপুত্র অর্পন করেন অর্থাৎ তাঁহাকেই শিষ্য করিয়া দীক্ষা দান করেন। তাঁহাদের কঠোর যত্না ও সংসারত্যাগত্ব দেখিয়া সাংসারিক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের নিকট দীক্ষা

প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেও সাহসিক হন না ; যাঁহারা সাহসিক হন তাঁহাদের মধ্যেও যিনি তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন। সাংসারিকগণ সালেকগণের নিকটই দীক্ষা প্রাপ্ত হন ; ইহাদের নিকট মজ্জুভূব গণের ন্যায় সংসার ত্যাগের অর্থাৎ তরুণ কঠোর যন্ত্রণা নাই, তবে “চিল্লাকশী ও “তর্কহয়ওয়ানাৎ” আদি সহকারে আরাধনা ও উপাসনা করিতে পারিলে তদনুযায়ী ফলও পাইতে পারেন। আজকাল সহরে, নগরে, গ্রামে, পল্লিতে, হাটে, বাজারে, পথে ও ঘাটে সর্বত্রই পীর সাহেবগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারাও সালেক, ইহাদের দীক্ষায় কাহারও কোন শিক্ষা বা জ্ঞান হউক আর নাই হউক, মন্ত্র সাধনায় কোন ফল পান আর নাই পান, অথবা কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন আর নাই পারেন, পীর মহাশয়গণের অভিপ্রেত অর্থ প্রদান ও অন্য আর একটি বিষয় বেশ উত্তমরূপেই শিক্ষা পান তাহা পীর সাহেবের খিদমৎ অর্থাৎ আপন পীরে আত্মসমর্পন অর্থাৎ পীরের পরশতেশ অর্থাৎ পীর পূজা। ইহাদের মুরিদানগণ এভাবে ও প্রকারে আপন আপন পীরের মনস্তৃষ্টির নিমিত্ত রূপ রূপানুবাদ ও সম্মান এবং খেদমৎ করেন যে দেখিলে বোধ হয় মুরিদানগণ যেন খোদা ও রসূল দঃকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন এবং দিন ও দুনিয়ায় সর্ববিষয়ের আশা ও ভরসা পীর সাহেবের কদমে মোবারেকে নির্ভর করিতেছেন। প্রকৃত সালেকগণ এই সব প্রক্রিয়া হইতে দূরেই থাকেন, কারণ তাঁহারা “শরিয়াৎ,” “তরিকৎ” “হকিকৎ” ও “মারফৎ”

হইতে এক পদ বিচলিত হন না । নাদান মুরিদানগণকে খোদা ও রসুলের দঃ খেদমতের পথ ভুলাইয়া দিয়া তাঁহাদের খেদমতের ন্যায় খেদমৎ লওয়াও জ্ঞানবান পীর বা সালেকের কার্য্য নহে, ইহা চারি তরিকার সম্পূর্ণ বিপরীত ; এই নিমিত্ত সাধুকুলশিরোমণি, মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত মন্তুগানাক্রম আলেয়হে রহমৎ বলিয়া গিয়াছেন ।—

পাশী ।

• “আয় বসা ইবলিস আদম ক্বয়ে হস্ত
পদ বহর দস্তে নবারেদ দাদ দস্ত”

ইহার অর্থ এই যে অনেক শয়তানই মনুষ্যাকৃতিরূপে জগতে রহিয়াছে অতএব যার তার হাতে হাত দিও না অর্থাৎ যে সে ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হইও না, এই নিমিত্ত যেমন তেমন সালেক অর্থাৎ পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হওয়া কর্তব্য নহে । এই প্রকার পীর শরাশরিফ অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে ধর্তব্য । মজ্জুবগণও পবিত্র শরাশরিফ অনুযায়ী প্রকাশ্য কোন কার্য্য করেন না বরং বিপরীত করেন, তদনুরূপ তাঁহারাও পবিত্র শরাশরিফের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না । এক সময়ে সাধুকুল চুড়ামণি ও মজ্জুব শ্রেষ্ঠ “মনসুর” “অনলহক” অর্থাৎ আমিই খোদা ও শম তবরেজ “কুমবইজনী” অর্থাৎ উঠ আমার আদেশে, শব্দ উচ্চারণ করিয়া ছিলেন বলিয়াই পবিত্র শরাশরিফের ক্ষমতা হইতে উদ্ধার হইতে পারেন নাই ; তৎকালে অলমায়েদিনগণ অবশ্যই জানিতেন যে ইঁহারা অসাধারণ সাধু ও

“ওয়াসেলে হক” ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু করিবেন কি শরাশরিফের মর্যাদা রক্ষা ও ভবিষ্যতে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সমাজে এই প্রকার বাক্যের ব্যবহার ও বিস্তার হইয়া গেলে ধর্ম ও সমাজে অশেষ অমঙ্গল ঘটিতে পারিবে এবং তাহারা কোন সময়ে খোদাওন্দ করিমের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও বসিতে পারিবে এই নিমিত্তই অলমাত্বেদিনগণ দ্বারা মহর্ষী মনসুরকে গুলী দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং শম্মতবরেজের ছাল ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। মনসুর ওজ্জে আসিয়া অর্থাৎ দশা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে খোদা বলিয়াছিলেন ও শম্মতবরেজ পশ্চিমধ্যে সম্মুখে একস্থানে একটী মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে “আমার আদেশে উঠ,” তাঁহার বলা উচিত ছিল, “কুম বই জনিল্লাহ” অর্থাৎ খোদার আদেশে উঠ কিন্তু খোদা আপন বন্ধুর বাক্যানুযায়ী তৎক্ষণাৎ সেই মৃত দেহকে জীবিত করিয়াছিলেন; পবিত্র শরাশরিফের এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ জন্য শরাশরিফ অনুসারে এইরূপ ব্যক্তি-গণেরও প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। সালেক ও মজজুবগণের দরজা ও মরতবার মধ্যে কোনই বিভিন্নতা নাই, ইহাদের উভয় সম্প্রদায়ই “গওয” ও “কুতব” আদি হইয়া থাকেন, তবে ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, সালেক মহাপুরুষগণ কর্তৃক জগতে অসংখ্য লোক শিক্ষা ও দীক্ষা পাইয়া অশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকেন কিন্তু মজজুবগণ দ্বারা তাহা হয় না, তাহারা নিজ কার্যেই অস্থির এবং পাগল। মনুষ্যদেহ যেমন আব, আতশ, খাক ও বাদ এই চারি ভূত দ্বারা গঠিত তেমনি

আমাদের ধর্মরূপ দেহের অবলম্বন “শরিয়ৎ”, “তরিকৎ,” “হকিকৎ” ও “মারফৎ” এই চারিটি পন্থা আমাদের ইহকাল ও পরকালের সুখ ও শান্তির আশ্রয় । সাংসারিক দেহের চারিটি ভূতের মধ্যে পরস্পারে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ধর্মরূপ দেহের পন্থা চতুষ্টয়ের অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ । একটি ভূতের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হইলে যেমন সমস্ত শরীরে অনিষ্ট হয় তেমনই এই পন্থা সমূহের সহিত ধর্মরূপ দেহের অবস্থাও অবিকল তাহাই হইয়া পড়ে ; একের সহিত অপরের অসামঞ্জস্য ঘটিলেই ধর্ম, কর্ম এমন কি ইমানে কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহাই আমার রসূলে পাকের দঃ ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য । এইজন্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ধর্মের “রুকুণ” অর্থাৎ স্তম্ভ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন । একটি ভূতরূপ স্তম্ভের বৈলক্ষণ্যতায় যেমন দেহরূপ অট্টালিকার বিঘ্ন ঘটে তেমনই এই স্তম্ভের মধ্যে কোন একটীর বৈলক্ষণ্য-তাতেও ধর্মরূপ অট্টালিকার অনিষ্ট হইয়া পড়ে ; এই নিমিত্ত

✓ প্রকৃত সালেকগণ চারি পন্থাতেই দৃঢ় থাকেন ; তাঁহাদের নিকট কোন স্তম্ভে কোন দোষ থাকে না । মজ্জুবগণকে প্রকাশ্য কোন বিষয়ে দৃঢ় দেখিতে পাওয়া যায় না ; তবে তাঁহারা সংসারত্যাগী, আমাদের ন্যায় সংসারে লিপ্ত নহেন । সংসারে লিপ্ত থাকিতে গেলে প্রকৃত সালেকের অনুগামী হওয়াই আমাদের অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ প্রকৃত সালেক দ্বারা দীক্ষিত হওয়াই উচিত । দীক্ষা অর্থাৎ মুরিদ হইতে গেলে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে দীক্ষা না হওয়াই কর্তব্য, কারণ ইহার মধ্যে

মনুষ্যের জ্ঞানে পূর্ণতা না হওয়াই সম্ভব, এই নিমিত্ত আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য খোদাওন্দ করিম আপন হবির মহম্মদ মুস্তাফা দঃকে ৪০ বৎসর বয়স্ক্রমের মধ্যে “নবুয়ৎ” প্রদান না করিয়া তাহার পর তাঁহাকে “নবুয়ৎ” প্রদান ও দীক্ষাদান করেন । দীক্ষার নিমিত্ত প্রকৃত সালেক চিনিয়া লইতে পারিলেই উত্তম নচেৎ সামান্য ব্যক্তির নিকট হইতে শুভ ফল লাভের আশা খুবই কম ।* (সাধারণ পীর সাহেবগণই একরূপ আমাদের সাধারণ সমাজের অধঃপতনের এক প্রকার কর্তা, বলিতে গেলে এক সময়ে ইহাদেরই “হেদাএতের” মহীমা গুণে আমাদের সমাজে সাধারণের মধ্যে রাজ বিদ্যার প্রতি বিস্তর অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা জন্মিয়া ছিল, তাহাই এক্ষণে তাঁহাদেরই উপর আমাদের সমাজে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে, কারণ যিনি মন্দ করিতে পারেন তিনিই ভালও করিতে পারিবেন, ইহাই সংসারের নিয়ম, যেমন “বিষেই বিষ ক্ষয় হয়” ইহাঁরা যদি আপনাদের মনোবাঞ্ছাপূর্ণোপযোগী “ওয়াজ” ও “নসিহৎ” করিবার পরিবর্তে অথবা যে যার “ওয়াজ ও নসিহতের শেষে যদি রাজ বিদ্যা অধ্যয়নের উপকারিতা এবং তাহার অবশ্যকত্বের

* বাহা দোষ বলিয়া সাধারণের নিকট ধর্তব্য হইতে পারে অর্থাৎ যিনি অর্থাতির সমতা ভাগ করিতে না পারিয়াছেন, অথবা যিনি কোন প্রকারের মিথ্যার সংশ্রব ভাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে সংগুরু বলিয়া কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না । কোন দোষ দেখা না গেলে অথবা গুরুতে যে সব গুণ থাকি আবশ্যক তাহা দেখা গেলে এবং মনের একান্ত অনুরাগ জন্ম হইলে তাঁহাকে গুরু বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; কলতঃ সংগুরুগণ যেমন শিষ্যকে পরিক্ষা করিয়া লন তদনুরূপ কিছুকাল গুরুর দোষ ও গুণ পরিক্ষার পর দীক্ষিত হওয়া উচিত অর্থাৎ পরিক্ষিত গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হওয়াই কর্তব্য ।

বিষয় বিশেষরূপে দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদের অজ্ঞ মুরিদানগণকে ও অপর সাধারণকে বুঝাইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে থাকেন তাহা হইলে ইহাদের এই অসাধারণ যত্নরূপ বৃক্ষে যে কত শীঘ্র সুমধুর ফল ধরিতে পারিবে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না । ইহারা পঙ্গপালের ন্যায় সতত সর্বত্রই বিচরণ করিতেছেন, ইহারা সাধারণের ইহকাল বা পরকালের কি যে উপকার বলিতেছেন তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক ; তবে তাঁহারা যে প্রকারে দীক্ষাদান করিয়া বেড়াইতেছেন তদসহ তাঁহারা যদি এই মহামন্ত্র দানও করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা জগতের ও সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিবেন । সাধারণ লোকে বিদ্যা অর্জন করিলে অর্থাৎ স্বজ্ঞান হইয়া উঠিলে আর কেহ এই প্রকার অসার পীর সাহেবগণকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া আপনাদের চিরকালের ভ্রান্তিমূলক ধারণাটী এখনও যদি তাঁহারা আপন আপন মনোমধ্যে পোষণ করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা যে খোদার দরগাহে কি প্রকার দণ্ডনীয় হইবেন তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে কাহার সাধ্য, তবে এক্ষণে কোন কোন মহাত্মা আপন আপন মহত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন রেখিয়া তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না) ।

৩। যিনি সৎগুরু অথবা সিদ্ধগুরু অর্থাৎ মুরশেদে কামেল তিনি সাংসারিক ব্যক্তিগণকে দীক্ষাদান করিলে তাহাতে তাঁহার সেই সাংসারিক শিষ্যমণ্ডলী আপন আপন সংসার-যাত্রা সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারেন এবং অশ্রায়

অত্যাচার, অবিচার, অধর্ম, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি কার্য্য হইতে বিরত থাকেন তদনুরূপই মন্ত্র দিয়া সেই মন্ত্রের সাধনা করিতে আদেশ করেন । এইরূপ মন্ত্রের দ্বারা সফলকাম হইবার বাসনা করিলেই এই প্রকার অসৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে নচেৎ ফল হইবার কোন আশা নাই । এই প্রকারে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলেই তিনি ইহ সংসারে অশেষ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে পারিবেন । ইহাই সাংসারিক ব্যক্তির দীক্ষা । যিনি সংসারের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অথবা নিষ্কাম হইয়া গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনা করেন তিনিই আপন গুরুর সাহায্যে, মন্ত্রের সাধনাবলে (আমাদের ধর্ম্মে) গুরুর গুরু মহাগুরু সেই পরম পবিত্র রত্নে খোদার দঃ দর্শনলাভ করিতে থাকিবেন এবং তাঁহারই কৃপাবলে স্বয়ং ঈশ্বরের সহিত প্রীতিলভ করিতেও পারিবেন । যেমন গুরুর মন্ত্র ও সাধনা বলে সংসারের যাবতীয় অসৎকার্য্য হইতে বিরত থাকিবার ক্ষমতা পাওয়া যায়, তেমনই সেই গুরুর আজ্ঞানুসারে ও মন্ত্রের সাধনানুসারে খুদ খোদাও রত্নের দর্শনলাভ করিতেও সক্ষম হওয়া যায় । মন্ত্রের সাধনার নিমিত্ত কেবলমাত্র গুরুর প্রীতি ও প্রসন্নতার সহিত আদেশ বা আজ্ঞা অর্থাৎ সমর্পণ বাক্যই যথেষ্ট, তবে গুরু উপযুক্ত অর্থাৎ সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক নচেৎ অনুপযুক্ত গুরুর অসংখ্য আজ্ঞায় এবং আজীবনকাল সেই মন্ত্রের সাধনায় কোনই ফল হইবার নহে । মহাজ্ঞানী কবির দাস বলিয়া গিয়াছেন :—

হিন্দী ।

“কবির সাধু সিপ হার সৎগুরু সিওরাতিবুন্দ
ত্রিধা গরী এক বন্দ সে কেয়া করে সমুন্দ ।”

ইহার ভাব এই যে, সমুদ্রে অগাধজলে ঝিনুক ভাসিতে থাকে তত্রাচ তাহার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের অধিকার কালে মাত্র এক বিন্দু জল সেই ঝিনুকে পড়িলেই তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়া সমুদ্র গর্ভেই ডুবিয়া পড়ে ও তাহাতেই মুক্তা জন্মে । সৎগুরু অর্থাৎ সিদ্ধগুরু যাঁহাকে মুরশেদে কামেল বলা যায় তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হওয়াই যথার্থ, তবে সৎগুরুগণ অধিকাংশ স্থলে কাহাকেও দীক্ষাদান করেন না অর্থাৎ মন্ত্রের সমর্পণ করেন না । যদিও কাহাকেও দেন তাহাকে মন্ত্রের সমর্পণ করেন না । যাঁহাকে তিনি আপন মত উপযুক্ত হইতে পারিবে বিবেচনা করেন বা আপন ক্ষমতাবলে বুঝিতে পারেন তাহাকেই মন্ত্র দেন ও মন্ত্রের সমর্পণ করিয়া থাকেন এই মর্মে করিব দাস বলিয়াছেন :—

হিন্দী

“কবির অমৃত কেরি রাখ সৎগুরু ছোরী
আপু সরিধা জো মিলে তাহি পিয়াওয়ে ঘোরী”

ইহার অর্থ এই যে, সৎগুরুগণ অমৃতকে গোপন করিয়াই রাখেন ; তিনি যখন যাঁহাকে আপন সদৃশ বুঝিতে পারেন তাঁহাকেই সেই অমৃত ঘুরিয়া খাওয়াইয়া দেন । অনেক সময়ে

গুরুগণ প্রার্থীকে অশেষ প্রকার কষ্টদায়ক কার্যের সহিত সাধনার জন্য মন্ত্র প্রদান করেন । অনেকে অনেককে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণের আদেশ করেন, কাহাকেও দীর্ঘকাল কেবল বসিয়াই থাকিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করেন, সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পায় না, কাহাকেও কেবল দাঁড়াইয়া থাকিবার আদেশ ও ব্যবস্থা দেন, সে আর বসিতে পায় না, কাহাকেও বা শূন্যে ঝুলিবার ব্যবস্থা দেন, কোন ব্যক্তিকে উর্দ্ধে পা ও নিম্নে মাথা করিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে মন্ত্রের সাধন জন্য আজ্ঞা করেন, কাহাকেও বা নানা প্রকার আসনের দ্বারা বসিয়া সাধনা করিবার উপদেশ দেন, কাহাকেও ১০।২০ বার মাত্র, কাহাকেও শত সহস্র, কাহাকেও প্রত্যহ লক্ষবার মন্ত্রের উচ্চারণ জন্য আজ্ঞা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা, যাহার প্রতি যাহা আদেশ হইবে তাহাকে ঠিক তদনুরূপই কার্য করিতে হইবে । যিনি গুরুর আজ্ঞানুরূপ অবিকল আদেশ পালন করিবেন তিনিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন ও সিদ্ধ হইতে পারিবেন এবং তখনই তিনি আপন ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন । কেহ বা ভাগ্য গুরুণ আরম্ভকাল হইতেই আপন ফল পাইতে থাকেন । এইরূপে গুরু ও আপন ক্ষমতা বলে শিষ্যের কার্য ও ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আবশ্যকীয় অধিকার অর্পণ করিয়া দেন ; তখনই তিনি যাহা কখনই পাইবার নহে, যাহা কখনই দেখিবার নহে ও যাহা চিন্তার অতীত অথবা যাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত, আকাশ ও পাতালাদি স্থান

সমূহে দৃষ্টি ফেলিলেই দেখিতে পাইবেন এবং এই 'দিব্য চক্ষু' খুদ খোদা ও রসুলের দঃ দর্শন লাভ করিবেন এবং বাক্যালাপও করিতে সমর্থ হইবেন । এই অসার দেহ এক স্থানে থাকিবে, আত্মাকে যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া গিয়া যে কোন দেহ গঠন করিবার ক্ষমতাও হইবে, চক্ষুর পলকে লক্ষ যোজনৈর সংবাদ দেওয়া ও লওয়া করিতে পারিবেন । আমরা সংসার সেবক, অসার ভক্ষ্যক ব্যক্তিগণ আজীবন কষ্ট করিয়া কখন মনকে সন্তোষলাভে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হই না, কখন কাহারও ইচ্ছা সীমার শেষে উপস্থিত হইতে পারে না, যাহার যতই উন্নতি হইতে থাকে তাহার ততই ইচ্ছার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অবশেষে তাঁহার আর আয়ুঃ কুলায় না, ইচ্ছাপূর্ণ হইতে না হইতেই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয় । ঈশ্বর ইহ জগতে কোন সাংসারিক ব্যক্তিকে ইচ্ছার শেষ সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত করেন না, কারণ ইচ্ছার সীমা নাই । যাঁহারা এই অসার সংসারে ইচ্ছার অভিলাষী না হইয়া সেই একমাত্র খোদাও রসুলের অভিলাষী ঈশ্বর তাঁহাদিগেরই ইচ্ছাকে শেষ সম্মায় উপস্থিত করিয়া দেন অর্থাৎ সাংসারিক ব্যক্তিগণের ভাগ্যে যাহা কখনই ঘটিবার নহে, তাহা, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আপন দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছাপূর্ণ করিয়া দেন । তখন তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরে লীন যইয়া পড়েন, তৎকালে তাঁহাদের কার্যকলাপ অদ্ভুত ও অসাধারণ হইয়া পড়ে । এই অপরিমিত আনন্দ ও অতুলনীয় সুখ অনুভব করিতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা এই অসার সংসারের যাবতীয় মিথ্যা সুখ, সচ্ছন্দতা ও

অলৌক মায়া মমতাকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং অপদার্থ দেহকেও কিছুই জ্ঞান করেন না অশেষ প্রকার কষ্টকে সুখই বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সব কারণে তাঁহারা আপনাদের এই বিছাকে কোন প্রকারেই প্রকাশ করেন না গোপন করিয়াই রাখেন। যাঁহারা এই প্রকারের মন্ত্র গ্রহণ করেন তাঁহাদের জন্ম সাধনাই প্রধান, তাঁহাদিগকে গুরুর আদেশানুরূপ কার্য্য করিতেই হইবে নচেৎ কোন ফল হইবে না। এই মর্মে কবির দাস বলিয়াছেন।

হিন্দি

“কবির গুরু ধোবি শিশ কপড়া সাবন সৃজনহার
ধ্যান শীলা পর ধোইও নিকলে জ্যোতি অপার”

ইহার অর্থ এই যে, গুরু ধোপার ন্যায়, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সাবনের তুল্য, ধ্যান অর্থাৎ সাধনরূপ পাথরের উপর, মন্ত্ররূপ কাপড় ধোলাই করিলেই তাহার অপার জ্যোতিঃ বাহির হইবে। অতএব বিনা সাধনাতে অথবা বিনা কষ্টে এই অভাবনীয় ও অচিস্তনীয় ফল লাভ হইবার নহে। এই মর্মে কবির দাস বলিয়াছেন।

হিন্দি

“কবির ইঁওশ করে হরি মিলন কি আওর সুখ চাহে অঙ্গ
পীড় সহে বিহু পছ মিনি পুতন লেত উচঙ্গ”

ইহার অর্থ এই যে, প্রসব যন্ত্রণা সহ্য না করিয়া স্ত্রীলোকে কি কখন ছেলে কোলে করিতে পারে। তদ্রূপ শরীরকে সুখী

করিলে কি কেহ ঈশ্বরকে পাইতে পারেন । এই নিমিত্ত
কবির দাস আরও বলিয়াছেন ।

হিন্দি ।

“কবির এতিতন দিয়ানা করো বাতি মলো জিউ
লেছ সিচো তেল করো তব মুখ দেখো পীউ ।”

ইহার অর্থ এই যে, এই দেহকে প্রদীপ কর, জীবনকে বাতি কর,
রক্তকে তৈল করিয়া আলো করিলে সেই আলোতেই ঈশ্বরকে
দেখিতে পাইবে । এই প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া সাধু
ব্যক্তিগণ আপন দেহ ও জগৎ সংসারে যাবতীয় সুখ, সচ্ছন্দতা
ও মায়া মমতাকে ত্যাগ করিয়া এই অতুলনীয় সুখ পাইয়া
থাকেন । প্রকৃত গুরু না পাইলে ও এই প্রকার সাধনা না
করিলে এ অদ্বিতীয় সুখ কখনই পাওয়া যাইতে পারে না ।
ইহাতেও কবির দাস বলিয়াছেন ।

হিন্দি ।

“কবির কোটি এক চন্দা উগহি সুরজ কোটি হাজার
কহে কবির সৎগুরুবিনাদিসহি ঘোর অন্ধার ।”

ইহার অর্থ এই যে, এক কোটি চন্দ্র ও সহস্র কোটি সূর্যের
উদয় হইলেও প্রকৃত সৎগুরু বিহীনে কেহ কখন সে
আলোতেও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন না, সকলই অন্ধকার
দেখিতে পাইবেন । অধিকাংশ সিদ্ধপুরুষ আত্মগোপন করিয়া
অপ্রকাশ্য ভাবে অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাকে কেহ চিনিতে না
পারে অথবা পাহাড়ে ও জঙ্গলে থাকিয়া লুকাইয়া থাকেন :

কেহ বা পাগল সাজিয়া সহরে ও নগরে বেড়াইতে থাকেন । ইহাদের মধ্যে যখন যাহাকে নগরে ও লোকালয়ে আসিবার জন্ত ঈশ্বরের আদেশ হয় তখন তিনিই সেই আদেশ পালন করেন । দেশ বা নগরের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে তথায় রাখেন, এইরূপ সাধু বা সিদ্ধপুরুষ সহর বা নগরে না থাকিলে কখনই সে স্থান থাকিবার নহে, ইহা ঈশ্বরের ধর্মরাজ্যের ব্যবস্থা । একজন লোকাস্তুরিত বা স্থানাস্তুরিত হইলেই ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে তাঁহার স্থানে তদনুরূপ আর একজনকে তথায় উপস্থিত করিয়া দেন । সংসাররাজ্যে সাংসারিক অধীনতার ন্যায় অধীন ব্যক্তিগণকে যেমন একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানাস্তুরিত হইতে হয় তেমনই ঈশ্বরের ধর্মরাজ্যে ধার্মিক মহাপুরুষগণকেও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হয় । তাঁহাদেরও গুণ বা ক্ষমতা অনুসারে পদ বা শ্রেণী আছে তদনুরূপ তাঁহারা ওলী, আওলীয়া, গওস, কুতুব ও অবদাল আদি সম্মানের খেতাবে অভিহিত হইয়া থাকেন । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে সাধু বা সিদ্ধপুরুষও হইয়া থাকেন সত্য কিন্তু দেশ বা নগর ও সহরের শান্তিরক্ষার ভার খোদা ওন্দ করিম আপন রসুলে মকবুলের দঃ খাতের ও সম্মানের নিমিত্ত কেবলমাত্র আমাদের পবিত্র ইসালাম ধর্মাবলম্বী সাধু ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন । সাধু ব্যক্তিগণ অসাধারণ ও অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ইহারা অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় কার্য্য করিতে পারেন । ইহারা আপন আপন গুণ ও ক্ষমতাবলে এতদূর বাকসিদ্ধ হইয়া পড়েন যে,

যখন যাহাকে যাহা বলেন ঈশ্বর তখনই তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিয়া তাহাই করিয়া দেন । ইহা কেবল ঈশ্বরের সহিত প্রীতি ও প্রণয়লাভের ফলমাত্র । আমাদের পরস্পরের মধ্যে যাহার সহিত যাহার ঘনিষ্ঠতা বা ভালবাসা ও প্রণয় থাকে তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে যখন যাহা বলেন তিনি তৎক্ষণাৎ আপন বন্ধুর অন্যায় অনুরোধ হইলেও তিনি তাহা রক্ষা করিতে তিলান্বিত বিলম্ব করেন না । ইহারাও ঈশ্বরের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধলাভ করিয়া থাকেন । এই অসাধারণ ক্ষমতার নিকট ইহসংসারের সামান্য, তুচ্ছ ও মিথ্যা সুখ, বিলাসিতা, ধন, জন ও ঐশ্বর্যাদি কেন না তাহাদিগের তুচ্ছজ্ঞান হইবে । তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত একবারেই লীন হইয়া থাকেন । তাহাদিগকে আর আমাদের ন্যায় পরকালের জন্য চিন্তাই করিতে হয় না । ইহাদের মধ্যে অনেকেই রিপুসমূহ দমন করিয়া ফেলেন ; কেহ বা তাহা পারেন না । কাহারও মধ্যে কেবলমাত্র ক্রোধের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বারা সাংসারিক কোন কোন ব্যক্তির ভাগ্যদোষে অনিষ্টই ঘটয়া উঠে । কেবল সাংসারিক কেন, পরস্পরে নিজেদের মধ্যেও কাহারও সহিত কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহার বিদ্যা বা ক্ষমতা নিজবিদ্যা বা ক্ষমতাবলে নিজে আকর্ষণ করিয়া লন, না হয় নষ্ট করিয়া দেন, ইহাকে “কশ্ফ” কহে । এরূপ ঘটনা অতি বিরল তবে অনেকে রাগী হইয়া থাকেন, তাঁহারা কাহারও কোন মন্দ কার্য দেখিয়া রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহার ভাগ্যদোষে মন্দ করিয়া বসেন ; এই নিমিত্ত এইরূপ ব্যক্তির

নিকট হইতে সাবধানে থাকা আবশ্যক কিন্তু অনেকের দ্বারা বিশেষ উপকারও পাওয়া যায় । তাই সাধারণে বলে—

উদ্দ ।

“কদম দরবেশরদবলা, দোয়া দরবেশরহমঅল্লা ।”

ইহার অর্থ এই যে, সাধুব্যক্তি যে স্থানে পদার্পণ করেন তথাকার আপদ ও বিপদ দূর হইরা যায় ও কাহাকেও আশীর্বাদ করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি অবশ্যই কৃপা করেন ইহা কোন অংশেই অযথা নহে ।

৩ । যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিতে পারেন তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ, আর আমরা সংসার ত্যাগ করিতে পারি না, কিন্তু যদিও আমাদের দ্বারা তাহা হইতে পারে না সত্য, তা বলিয়া খোদা ও রসুলের আদেশ পালন করিলে তৎসহ আমরা যে তাঁহাদের সন্তোষলাভ করিতে পারি -। এবং তাহার জন্য যে আর আমাদের নিমিত্ত অন্য কোন উপায় নাই এমন নহে । সংসার-ত্যাগি ব্যক্তিগণ যেমন তদুপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া কোন না কোন মন্ত্রের অর্থাৎ খোদায়ে পাকের ইসম অর্থাৎ নামের সাধনা করেন তেমনই আমরা সংসারসেবীগণের জন্য সেইরূপ মন্ত্র অথবা ইসম পাক প্রচুর রহিয়াছে । তাহা কেবল দোয়া ও দরুদ এবং পবিত্র কলাম শরিফের আয়েত মাত্র । পবিত্র কলাম শরিফের যে সব আয়েত অর্থাৎ বাক্য বা বচন আমরা সকলেই জানি এবং সচরাচর যাহা আমরা পাঠ করি বা অভ্যাস করি তৎসমূহই ইসম পাক । আমাদের পাঠে ও

অভ্যাসে আমরা কোন ফল পাইনা কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ তাহারই সাধনাষলে অসাধারণ ফললাভ করিতেছেন ইহা আর কিছুই নহে কেবল মুরশিদে কামেল অর্থাৎ সৎগুরুর আদেশ ও উপদেশমাত্র । গুরু যাঁহাকে যে দোয়া, দরুদ বা আয়েত যে প্রকারে যতবার পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিবেন ও যাঁহাকে তাহা সমর্পণ করিবেন তদনুরূপ সাধনাতেই তিনি সেইরূপই ফল পাইবেন । আমরা সংসারে লিপ্ত থাকিয়া সেইরূপ গুরু বা আদেশ পাই নাই বলিয়া ও আমরা সাংসারিক ব্যক্তিগণের দ্বারা তদ্রূপ কঠোর সাধনা হইতেও পারে না বলিয়াই সেই দোয়া, দরুদ বা আয়েত শত সহস্রবার পাঠ করিয়াও আমরা কোন ফল পাই না ; ফলতঃ যদিও আমরা তদনুরূপ সিদ্ধ ও সৎগুরু পাই না সত্য কিন্তু আমাদের জন্য খোদায়ে পাক যে প্রকার সহজে অতি সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহার কার্য্য করিলেই আমরাও অনায়াসে এবং অক্লেশে সমূহ গুরু গুরু মহাগুরু জনাব রহুলে করিম দঃ কে পাইতে পারিব । তাহার জন্য সহজ উপায় হইতেছে যে, শরীর ও মনকে শুদ্ধ করিয়া আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তিসহকারে প্রত্যহ দরুদ শরিফ পাঠের অভ্যাস করি, তাহা হইলে পাক পয়গম্বরের দঃ সন্তোষ ভাজন হইতে পারা যাইবে । খোদায় পাক আপন প্রিয় রহুলের দঃ উন্মতগণের জন্য এই সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন, ইহাই তাঁহার আদেশ । সংসারত্যাগি সাধুগণ যেমনই কঠোর সাধনা করুন না কেন তাঁহাদেরও এই পথ ; তাঁহারাও অগ্রে

কখনই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন না । রসুলে পাক দঃ খোদায়ে পাকের পরম পবিত্র বন্ধু বলিয়াই তিনি আপন বন্ধুর নামের মহাত্মতা এই প্রকারেই প্রদান করিয়াছেন । এই দরুদ শরিফ পাঠ করিয়া যদি কেহ রসুলে পাকের দঃ প্রীতिलाভ করিতে পারেন তবে তাঁহার আর চিন্তা কিসের ? তিনিই খোদায়ে পাকের সম্ভ্রামভাজন হইতে পারিবেন, কারণ বন্ধুর বন্ধু বন্ধুই হইয়া থাকেন ; অতএব এ অমূল্য রত্নের প্রতি যত্নের অবহেলা করা কোন প্রকারেই আমাদের কর্তব্য নহে । এই একমাত্র দরুদ শরিফই আমাদের জায় সংসারসেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে গুরু এবং আমাদের ইহকাল ও পরকালের সুখদাতা । আমাদের জ্ঞান আর অন্য কোন গুরুর আবশ্যকতা নাই । এই নিমিত্ত আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে প্রত্যহ সূদ্ধ শরীরে, পবিত্র স্থানে ও সঙ্গোপনে এই দরুদ শরিফের পাঠ করা মুসলমান মাত্রেই কর্তব্য । ইহার গুণ, ক্ষমতা, বা ফজিলৎ অশেষ ; ইহাতে আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের মঙ্গল সাধিত হইবে কোন সন্দেহ নাই বলিয়াছেন ।—

উর্দু ।

“দওয়া হায় দিলে দর্দ মন্দানেদরুদ

শফা হায় মরিজান ইসিয়ঁ দরুদ

গমমে অবস হলাক হো পড়লো দরুদে পাককো

আয়ী হুয়ী টলে বলা সলে অলা মহম্মদিন ।”

ইহার অর্থ এই যে, দরুদ পাক সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও রোগের মহৌষধ, কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কাকালে

দরুদে পাক পাঠ করিলে খোদাওন্দ করিম তাঁহাকে সেই বিপদ
 হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন । এই দরুদ পাকের ফজিলৎ
 সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস হইতেছে যে জনাব রসুলে মকবুল দঃ
 এর মুর পাকের সৃষ্টির বিবরণ, তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত ও বাল্য
 জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপলক্ষ্য করিয়া পবিত্র দরুদ
 শরিফের পাঠের উদ্দেশ্যেই অলমায়ে দিনগণ মিলাদ শরিফ
 পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন । পবিত্র মক্কায়ে মোয়াজ্জমা ও
 মদিনায়ে মনওওরাতেও কি সুখে, কি দুঃখের সময়ে প্রত্যেকের
 ঘরে ঘরে এই পবিত্র মিলাদ শরিফ অধ্যয়ন হইয়া থাকে ।
 খোদায়ে পাক ইহার অশেষ গুণ ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ।
 অলমায়দিনগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দিনদার মুসলমানগণ
 প্রফুল্লিতচিত্তে ও আনন্দিত অন্তঃকরণে একত্রে সমবেত হইয়া
 খোদার হবিব রসুলে পাক পয়গম্বরের দঃ প্রতি আন্তরিক
 প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া খুদ খোদায়ে পাক
 তথায় অশেষ রহমৎ অর্থাৎ কৃপাদান না করিয়া থাকিতে
 পারেন না, এবং রসুলে করিম অহমদে মুজতেবা, মহম্মদ
 মুস্তফা দঃ ও আপন ভক্ত ও প্রেমিক পুরুষগণের ভক্তির
 আকর্ষণে বিমুক্ত হইয়া তথায় সুভাগমনকরতঃ বানিয়ে মজলিস,
 হাজেরাগ মজলিস, জায় মজলিসের সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতে
 থাকেন । আমরা অন্ধ, তাঁহার দর্শন লাভের উপযুক্ত শক্তি
 আমাদের নাই, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত ।
 যাহারা এইরূপ শক্তি উপন্ন করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা
 আপন আপন জীবন স্বার্থক করিতেছেন । ইহা ইকিকত ও

মারফতের বিদ্যার ক্ষমতা, যাঁহারা এই বিদ্যায় বিদ্বান তাঁহারা ই
দর্শনলাভে চরিতার্থ । কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়াছেন—

উর্দু ।

“যো আশক হাঁয় হজরতকে অহলে নজর ।

ওহ পাতে হাঁয় দিদার খতরুল বশর ॥

মোশররফ ওহ হোতে হাঁয় দিদার সে ।

সদা ফয়েজ পাতে হাঁয় অনওয়ার সে ॥

ন শক ইসমে লানা তো হরগিজ কভি ।

কে যাওয়ে ন ইমান তেরা অখি ॥

ন হজরত কো মুদ্দি সমঝনা কভি ।

ও লেয়কিন হাঁয় নজরোঁসে গাএব নবি ॥”

এই পবিত্র মিলাদ শরিফের মজলিস তরতিব করা বা তাহাতে
যোগদান করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের
বিষয় । যে স্থানে খোদার রহমৎ নাজেল হয় ও যে স্থানে খুদ
রসূলে পাকের দঃ সুভাগমন হয় তথায় যোগদান করিয়া
আপনাকে সৌভাগ্যশালী করিতে না পারিলে আমাদের স্নুঘ্য
জীবনই বৃথা । সমাজে একতা নিবন্ধনোদ্দেশে অধিক সংখ্যক
মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এক সময়ে একত্রিত হইবার জন্ম ও সকলে
ভ্রাতৃ ভাবে সম্মিলিত হইয়া একান্ত 'মনে এবং ভক্তিসহকারে
দীর্ঘকাল পর্যন্ত দরুদ শরিফ পাঠ করিয়া খোদায়ে পাকের
বেহদ ও বেশোমার রহমৎ পাইবার উদ্দেশেই এই পবিত্র
মজলিসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে ; রসূলে পাকের জন্মবৃত্তান্ত

পাঠ উপলক্ষ্য মাত্র। একান্ত মনে ও ভক্তিসহকারে এই দরুদ শরিফের পাঠের অভ্যাসই আমাদের খোদা প্রাপ্তির জন্য একমাত্র অতি সহজ উপায়। এইরূপ পবিত্র সভায় উপস্থিত হইতে হইলে সুদ্ধ ও শাক্ত শরীরে, পাক ও পবিত্র বস্ত্রে এবং বাউজু তথায় যোগদান করা কর্তব্য। সামান্য মজলিসে বসিতে হইলে কতদূর আদব ও কায়দার সহিত বিনীত ও নম্র হইয়া বসিতে, উঠিতে ও কথাবার্তা করিতে হয়, যে স্থানে আমাদের দিন ও দুনিয়ার মালিক খাতেমন নবিন, হবিবেখোদা, অশরফে অম্বিয়া, পেশওয়ায়ে আওলীয়া, শাফিয়ে মহশর, রসূলে পাক, অহমদে মুজতেবা, মহম্মদ মুস্তেফা দঃ এর আগমন হইয়া থাকে তথায় কি প্রকারে ও কত আদব অর্থাৎ ভক্তি সহকারে বসা ও উঠা কর্তব্য তাহা বর্ণনা করিতে। কোন দৃষ্টিবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়াছেন—

উর্দু।

“বা আদব দাখিল হো আয় দিল মহফিলে মিলাদমে
খুদ বদওলৎ খুদ হাঁয় শামিল মহফিলে মিলাদ মে ॥”

ইহার অর্থ এই যে, মিলাদ শরিফের মজলিসে বিশেষ আদবের সহিত দাখিল হওয়া কর্তব্য, কারণ এই মজলিসে খুদ মালেক উপস্থিত থাকেন। সাধারণতঃ মিলাদ শরিফের মজলিসে তওল্লদ অর্থাৎ রসূলে খোদার দঃ ভূমিষ্ঠ হওন কালীন বর্ণনা পাঠের সময়ে সকলে রসূলের পাকের দঃ প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করেন, ইহাকেই “কয়াম”

কহে । এই কয়ামকে কোন কোন আলেম অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যায়ৎ অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । মারফৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপন আপন গুণ ও ক্ষমতাবলে এই মিলাদে পাকের মজলিসে জনাব রসূলে করিমের দঃ দিদার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । তাঁহাদেরই বাক্য অনুসারে এই মজলিসে পাকে রসূলে খোদার দঃ তশরিফ আওরি অর্থাৎ আগমনি প্রমাণ হইয়া থাকে এবং তাঁহারাই তৎকালে রসূলের পাকের দঃ দিদারে মোশররফ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদেরই দ্বারা রসূলে পাকের তাজিম ও তকরিম হেতু এই পবিত্র মজলিসে কয়ামের সৃষ্টি হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় এই কয়ামের প্রতি ইনকার করা অথবা রসূলে পাকের দঃ তশরিফ আওরির প্রতি অবিশ্বাস করা কোন প্রকারেই উচিত নহে । শরা-পরন্তু আলেমানগণ ইহা সম্যকরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারেন কিন্তু সাধারণ অর্থাৎ মারফৎজ্ঞানহীন অজ্ঞান ও মূর্খ অজ্ঞ দুনিয়াদারগণ যাঁহারা এ অপরূপ রূপ দর্শনে বঞ্চিত তাঁহারা নানা কারণে হিন্দু বা অন্য বিধর্ম্মালম্বীগণের ন্যায় শিরকতের কাণ্ডকারখানা করিয়া দিয়া আপন আপন দিন ও ইমান এবং ইহসংসারে সর্বসাধারণের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের সাধারণ সমাজে ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে অশেষ প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটাইয়া বসিতে পারেন এই উদ্দেশ্যেই অলমায়ে দিনগণ শরা শরিফ অনুসারে এই কয়ামের প্রতি প্রত্নয় দেন না । মিলাদ শরিফের মজলিসে রসূলে পাকের দঃ আগমন যখন স্বতঃসিদ্ধ বণিয়া অসংখ্য দৃষ্টিবান মহাপুরুষগণ দ্বারা প্রমাণিকৃত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, তখন কেবলমাত্র

ভেলাদতের অর্থাৎ জন্মকালীন বিবরণ পাঠের সময়েই কয়াম করা অপেক্ষা মিলাদ শরিফ পাঠের আরম্ভ হইতেই শেষ পর্য্যন্ত স্বসম্মানে, অবনত মস্তকে ও ভক্তিভরে কয়াম করিয়া অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারিলেও ভক্তির সীমায় পহুঁছিতে পারা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে । মিলাদ শরিফের মজলিসে গিয়া রসুলে পাকের দঃ প্রতি আন্তরিক ও বাহ্যিক তাজিম ও তকরিম করা এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে সঙ্গোপণে দরুদ শরিফের পাঠ করিতে থাকাই আমাদের পক্ষে মুখ্য কার্য্য । এই উদ্দেশে কোন জ্ঞানি ব্যক্তি বলিয়াছেন—

উর্দু ।

“জিকরে রসুল সুনকে পড়হো দম বদম দরুদ পড়হো
ইস্ বজমে মে খমোশ ন বয়ঠো দরুদ পড়হো
খমোশ বায়ঠে হাও কেয়া মো মিনো দরুদ পড়হো
শফিয়ে রোজে জজা পর পড়হো দরুদ পড়হো
যাহাকে হো তলব তালেবো দরুদ পড়হো
বহস্ত পাওগে আয় আসিয়ো দরুদ পড়হো ।”

ইহার ভাব এই যে, মিলাদের মজলিসে কেবলমাত্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না দরুদ পাঠ কর । এক সময়ে এই জগতে শত সহস্র অসংখ্য স্থানে মহাপুরুষ ও মহাত্মা ব্যক্তিগণের আশ্রয়ে মিলাদ শরিফ হইতেছে কিন্তু প্রেমিক ও ভক্ত মহাপুরুষগণের মনবাঞ্ছা পূর্ণকরণাভিলাষে এবং দিন ও দুনিয়ার উপকারার্থে সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রসুলে করিম দঃ সর্বত্রই

বিদ্যমান হইয়া থাকেন ; ইহাই খোদার মহিমা ও তাঁহার হবিবে পাকের দঃ মাহাত্ম্য । এই কারণেই দৃষ্টিবান ব্যক্তিগণ সর্বত্রই তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন । এই অসাধারণ ও অমুপম পবিত্র মিলাদ শরিফের প্রতি অবহেলা করা কোন দিনদার মুসলমানের কর্তব্য নহে । এরূপ অভাবনীয় ও অপরিমীম সৌভাগ্যের কার্য্যে কত শত ধনবান ও ভাগ্যবান ব্যক্তি আপন আপন ধন এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিয়া দিতেছেন ও দিয়াছেন । এই অতি সহজ সাধ্য কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া পবিত্র মিলাদ শরিফের মজলিস তরতিব করা ও দরুদ শরিফের তরঙ্গ উত্তোলন করিয়া সৌভাগ্যশালী হওয়া সকলেই কর্তব্য । পবিত্র দরুদ শরিফের পাঠই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । আজকাল অধিকাংশ স্থলে পবিত্র মোলুদ শরিফের পাঠ কালে দরুদ শরিফের নাম মাত্র দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না । ইহা এক প্রকার রঙ্গ ও তামাসার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অন্যায় ও অত্যাধিক হয় না । সাধারণ পুস্তকে অধিকাংশ রেওয়াএৎ ও হেকাএৎ অসমর্থীত, তাহাতে আবার কসিদা, গজল ও রেখ্তা আদিতে পরিপূর্ণ, পাঠকালে বিখ্যাত বিখ্যাত গায়কগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন, তবে কেবল বাজ যন্ত্রেরই অভাব থাকে, নিকটে ভাল পাঠক না থাকিলে অগ্রীম খরচ দিয়া রেল-যোগেও দূর দেশ হইতে একজন উত্তম পাঠক আনাইয়া মোলুদ শরিফ পাঠ হইয়া থাকে আর কিছু হউক না হউক পাঠক মহাশয়ের প্রশংসা লইয়াই সকলের নিকট বিচার । ইহা যে কত দূর সঙ্গত তাহা ধার্মিক

মহাপুরুষগণ বিবেচনা করিবেন । এই ব্যবস্থা শীঘ্র লোপ না হইলে আমাদের সমাজের অশেষ অমঙ্গল বৃদ্ধিতে হইবে । দরুদ শরিফ সংখ্যায় অতীত, ও ১১১টি দরুদ পাকের যে কত প্রকারের ফজিলত তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য । এক্ষণে নিম্নে দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দরুদ শরিফ দেওয়া গেল ইহার ফজিলতও অশেষ ।

আরবি ।

“সল্লুল লাহো অলা মহম্মদ ।”

ও

“অল্লা হুম্মা সল্লে অলা মহম্মদিন
ও অলা আলেহি ও সল্লিম”

এই দরুদ শরিফ সম্বন্ধে খোদায়ে পাক আপন কলাম শরিফে জানাইয়াছেন ।

আরবি ।

“ইয়া অইওহল লজিনা আমনু
সল্লু আলেয়হে ও সল্লেমু তসলিমা”

ইহার অর্থ এই যে, হে ইমানদার মুসলমানগণ আপন নবির উপর দরুদ ও সলাম পাঠ কর । এই দরুদ শরিফ সম্বন্ধে যখন খুদ খোদায় পাকের আদেশ রহিয়াছে তখন তাঁহার সেই আদেশ পালন করিলে যে তিনি সন্তুষ্ট না হইবেন ইহাতে সন্দেহ করা বা তাঁহার আদেশ তামিল না করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ

অন্যায় ও দোষ । খোদায়ে পাক আপন কলাম মুজিদে
বলিয়াছেন—

আরবি ।

“কজ্জ কোরুলী অজ্জ কোরোকুম ।”

ইহার অর্থ এই যে, তুমি আমাকে স্মরণ করিলে আমিও
তোমাকে স্মরণ করিব । এখন ভাবা উচিত, খোদায়ে পাকের
কলাম কখনই লজ্জন হইবার নহে ; তিনি যাহাকে স্মরণ
করিবেন তাহার আর মরণ নাই, অতএব ইহকালের সুখ ও
পরকালের স্বর্গলাভের জন্য খোদাও রসুলে পাকের দঃ প্রীতি
লাভের নিমিত্ত এই দরুদ শরিফ ও সলামের পাঠের ন্যায়
ইহকাল ও পরকাল জন্ত সহজ উপায় আর নাই, এই সহজ
উপায়ের প্রতি অবহেলা করা কোন দিনদার মুসলমানের
কার্য্য নহে । এক্ষণে নিম্নে একটা ক্ষুদ্র সলাম দেওয়া গেল—

আরবি ।

“অস সলাতো অস সলামো আলয়কা

ইয়া রহমতুল লিল আলেমিন ।”

৫ । হিন্দু বা অন্য ধর্ম্মে থাকিয়া অনেক সাধু ও তপস্বীগণ
যোগ ও সাধনা করেন । তাঁহারাও আপন আপন গুরুর আদেশ
অনুসারে যোগ ও তপস্যা দ্বারা সাধনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের
সাধনার প্রক্রিয়া আমার পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে সাধনার প্রক্রিয়া
অপেক্ষা কঠোর । তাঁহারা ও আপন আপন সাধনাবলে ঈশ্বর
কৃপায় সফলকাম হইতে পারেন এবং বাক্যসিদ্ধও হইয়া

থাকেন। এরূপ অনেক সাধু ব্যক্তিগণের দর্শনলাভ করিয়াও চরিতার্থ হওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর মহান, তাঁহাকে যিনি যে নামে, যে প্রকারে ও যে প্রণালীতে পাইবার জন্য একান্তমনে কামনা করিয়া সাধনা করিবেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারিবেন। অসংখ্য দ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশাধিকার করিতে হইলে যে কোন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারা যাইতে পারে কিন্তু তন্মধ্যস্থিত অত্যাচ্ছন্ন অথবা কেন্দ্রস্থলে যাইতে হইলে তদুপযুক্ত সহায় ও সাহায্য আবশ্যক, নচেৎ অসাধ্য হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত আমার নবিযে আখেরে জমান মহম্মদ মুস্তাফাই দঃ একমাত্র অবলম্বন; তাঁহারই সহায়তা ও সাহায্য গুণে আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাধু ও ফকিরগণ সেই অত্যাচ্ছন্ন স্থানে অথবা কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্র আসনের সন্নিধানে অধিকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরে লীন হইয়া যান। ইহাকেই বলা যায় “ওয়াসেলে হক” হইয়া যান। অন্য ধর্মাবলম্বী সাধুগণ এরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। খোদায়ে পাক এক্ষণে জগতের শেষ পয়গম্বর আপন প্রিয় রসূলে করিম মহম্মদ মুস্তাফা দঃ অধিকারেই এই ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিমিত্ত অন্যান্য সাধু অপেক্ষা আমার ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাধু ও ফকিরগণের অধিকার ও ক্ষমতা অধিক, ইহাই অপর সাধুগণের মধ্যে বিভিন্নতা।

৬। সাংসারিক ব্যক্তিগণ আপন সাংসারিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেকেই অনেক প্রকার যত্ন, চেষ্টা ও কষ্ট

করিয়া থাকেন, কত লোকে আপন উপকার ও ইষ্টসাধন জন্য কত লোকের কত প্রকার স্তুতি, মিনতি, ভক্তি এমন কি তোষামোদও করিতে ত্রুটি করেন না, তাহাতে কায়িক ও মানসিক কষ্ট ব্যতীত বিস্তর অর্থ ব্যয় ও অতিরিক্ত ব্যয় করিতেও বাকি রাখেন না; যদিও আপন কার্য্য উদ্ধার জন্য একরূপ করা এক প্রকার অনায়াস নহে বরং অনেক স্থলে আবশ্যিক ও কর্তব্য কিন্তু এই নিমিত্ত লোকে যেন অপর লোকের নিকট চেষ্টা পায় তেমনই তৎসহ আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালায় নিকট চেষ্টাও সর্ব্বাঙ্গে করা কর্তব্য। কথায় বলে “খোশামদে খোদা রাজি,” ইহা কি অনায়াস বা অযথা, তাহা নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপেই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। তাঁহার তোষামাদ করিলেই তিনি যে সদয় ও সন্তুষ্ট না হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সন্তোষলাভ করিতে পারিলে সুখের আর সীমা থাকিবে না। যে বাসনা ও কামনা জন্য তাঁহার তোষামোদ করা যাইবে তাহা অত্যাবশ্য পূর্ণ হইবেই হইবে; তবে সেই বাসনা নেক অর্থাৎ সৎ হওয়া আবশ্যিক। মন্দ বাসনা ও কামনা থাকিলে অনেক স্থলে বিপদগ্রস্ত ও অনিষ্ট করিবার মানসে শয়তানে তাহা পূর্ণ করিতে পারে। কোন প্রকার সৎ কামনার সাধনা বা কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটনা এমন কি কোন আপদ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত এবং সম্যক প্রকারে ঈশ্বরের সন্তোষ লাভের জন্য একমাত্র পবিত্র দরুদ শরিফই তাহার প্রধান উপায়। এই প্রকার

আবশ্যকের সময়ে কোন পবিত্র ইসমে পাকের অধ্যয়ন আবশ্যক হইলেও সেই ইসম আরম্ভ করিবার পূর্বে ও পাঠ শেষ করিবার পর দরুদ শরিফের পাঠ নিতান্ত প্রয়োজন নচেৎ তাহার প্রার্থনা কখনই খোদার দরগাহে কবুল হইবার নহে । সামান্য দোয়া বা মোনাজাতের অগ্রে ও পশ্চাতে দরুদ শরিফের পাঠ অত্যাৱশ্যক । সেই দরুদ শরিফের গুণে ও ফজিলতে সেই মোনাজাত খোদার দরগাহে কবুল হইয়া যায় ইহাই কেতাবের ব্যবস্থা । কোন ইসমে পাকের অভ্যাস বা পাঠ করিতে গেলেই তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে অন্তঃতপক্ষে ১১১১ বার দরুদ শরিফের পাঠ অত্যন্ত আবশ্যক । কোন বিপদ হইতে উদ্ধার বা সৎকামনা পূর্ণ জন্ম কোন ইসমে পাক পাঠ করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা এই ইসমে পাকের অধ্যয়ন করাই আবশ্যক । ইহাকেই দোয়ায়ে ইউনুস কহে—

আরবি ।

“লা এলাহা ইল্লা অস্তা সোবহানেকা

ইন্নি কুনতো মিনজ জোয়ালেনিন ।”

খোদায়ে করিম এই ইসমে পাকের অশেষগুণ ও ফজিলত প্রদান করিয়াছেন । ইহার অমল করিতে হইলে যে কয় দিবস অধ্যয়ন করা হইবে ততদিন মাছ ও মাংস ভক্ষণ নিষেধ । নিশীথ রাত্রে বা উজু প্রত্যহ অন্তঃত ১১ শত বার অধ্যয়ন আবশ্যক । স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে পারিলে অতি উত্তম, তাহাতে খোদার রহম ও করম অবশ্যই হইয়া থাকে, নচেৎ লোক নিযুক্ত করিলে

ততদূর ফল হয় না, তবে যদি লোক ভাল থাকে তাহার কথা পৃথক, কোন বিশেষ আবশ্যিকতার সময়ে অল্পকালের মধ্যে অর্থাৎ শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট হইতে শুভফল লাভের আশা করিলে সওয়া লক্ষবার এই পাক ইসমের অধ্যয়ন আবশ্যিক ; তৎকালে ২০।২৫ জন নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী ও নমাজি ব্যক্তি হইলেই ভাল, এইরূপ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া পাঠ করিলে খোদা অবশ্যই রহম করিয়া থাকেন । আপন রোজী ও রোজগারের উন্নতির নিমিত্ত কামনা থাকিলে খোদায়ে পাকের নাম—

আরবি ।

“হু অর রহম্মা নীর রহিম ।” ✓

ইহা নিয়ত ও প্রত্যহ অনিবার্যরূপে রাতে বা উজু অগ্র পশ্চাৎ ১১।১১ বার দরুদ শরিফ ও ইহাকে ১১১ বার পাঠের অভ্যাস করিলে খোদাওন্দ করিম আপন নামের মহাত্ম্যগুণে অবশ্যই তাঁহার ফল প্রদান করেন । কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কোন হাকিমের সন্নিধানে উপস্থিতির আবশ্যক হইলে আপন ঘর হইতে বাহির হইয়াই তিনবার দরুদ শরিফের পাঠের পর সাতবার “দোয়ায়ে ইউনুস” ও তিনবার পবিত্র কলাম শরিফের সুরায়ে পাক—

আরবি ।

“অলম নশরহ লকা”

সম্পূর্ণরূপে পাঠ করা আবশ্যিক এবং দশবার এই দোয়ায়ে পাক—

আরবি ।

“সোবহান অল্লাহিল কাদেরল, কওয়ীঅল, কাহেরল কাফি”

পাঠ করা আবশ্যিক, তবে প্রত্যেকবারে “বিসমিল্লার” সহিত পাঠ করা কর্তব্য । ইহাতে অবশ্যই খোদার রহমে ও করমে সেই হাকিম মেহের বান হইবেন । হাকিমের নিকটস্থ হইবার পূর্বেই—

আরবি ।

“কাফ” “হা” “ইয়া” “আয়েন” “সোয়াদ”

এই পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে একের পর এক হিসাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি মুঠা করিতে হইবে তাহার পর—

আরবি ।

“হা” “মিম” “আয়েন” “দীন” “কাফ” (বড়ি কাফ)

এই পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পূর্ববৎ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি মুঠা করিয়া হাকিমকে সেলাম করিয়াই মুঠা দুইটি খুলিয়া দেওয়া আবশ্যিক ; ইহাতে অবশ্যই খোদার রহমে ও করমে হাকিম মেহেরবান হইবেন । যদি কখন কোন হাকিম বা মুনিব কোন কারণবশতঃ অসম্মত হইয়া যান তবে তাঁহার দ্বারা যাহাতে অনিষ্ট না হয় তন্নিমিত্ত রবিবার দিবস “অতারদ” নক্ষত্রের অধিকার কালে অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্রের অধিকার কালে ময়দা ও মিষ্টি একত্র করিয়া মনুষ্যের জিহ্বার আকারের গ্ৰাম

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিষ্টক ত্রিশটি ঘূতে ভাজিয়া এই দোয়া ত্রিশবার পাঠের পর তাহাতে দম করিয়া সমূহ পিষ্টকগুলি খাওয়া আবশ্যক, উহাতে অবশ্যই খোদার রহম ও করম হইয়া থাকে—

আরবি ।

“লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ আসমাঁতাজমিঁ
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ অরশ তা কুরসী
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ লওহ তা কলম
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ কলম তা শওহ
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ জমী তা আসমাঁ
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ মশরক তা মগরব
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ মগরব তা মশরক
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ জনুব তা শোমাল
লা এলাহা ইল্লাল লা	অজ শোমাল তা জনুব

বস্তম জব্বাহ তা বদিগোফতন

ফল্লা ইবনে ফল্লা (এই স্থলে তাহারও

তাহার পিতার নাম উচ্চারণ করা আবশ্যক)

ওবন্দ করদম জবান ফল্লা ইবনে ফল্লা

বহকে লা এলাহা ইল্লাল লাহ মহম্মদর রসুল অল্লাহ ।”

সাধারণতঃ কোন কার্যে ঘর হইতে বহির্গত হইবার সময়ে মনে মনে ৭ বার “দোয়ায়ে ইউনুস” পাঠ করিয়া যাওয়া কর্তব্য । খোদায়ে পাকের পবিত্র কলাম ও ইসামের এমনই অসাধারণ গুণ যে তিনি আপন কলামের মহাত্ম্যে অচেতন পদার্থকে

চেতনের সমতুল্য করিয়া তুলেন । ইহা সতত আমরা আমাদের দিব্যচক্ষেই দেখিতে পাই । (আমি একজন নাপাক পুলিশ কর্মচারী) সতত চোর ও চোটা লইয়াই আমাদের ব্যবহার ও কারবার বলিয়াই এই পুলিশের কার্যের স্থায় একটা দৃষ্টান্ত অত্রস্থলে দিলাম । কোন ঘরে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি হইলে গৃহস্থিত বা নিকটস্থ কোন লোকে তাহা লইয়াছে বলিয়া যদি বুঝিতে পারা যায় তবে যে সমস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করিতে পারা যায় তাহাদের প্রত্যেকের নাম পৃথক পৃথক এক একটা পত্রে লিখিয়া সমূহ পত্রগুলি একটা ঘাটীর মধ্যে দিয়া অন্য এক লোক দুই হাতের দুইটা অঙ্গুলির দ্বারা সেই ঘাটীটা শূন্যে তুলিয়া ধরিলে পর কোন একজন নেককার, সত্যবাদী ও নমাজী ব্যক্তি বা উজু অগ্রে “সুরায়ে ফাতেহা” অর্থাৎ অলহমদো সুরা পাঠ করিয়া ওতদ পরে কোন একটা দরুদ শরিফ তিনবার পাঠের পর পবিত্র কলাম শরিফের “সুরায়ে ইয়াসীন” এর ২।৪ আয়েতে পাক পড়িতে না পড়িতে ঘাটীর মধ্যস্থিত নাম সমূহের মধ্যে চোরেরও নাম থাকিলে অথবা চুরির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামও থাকিলে ঘাটীটা খোদার কলামের মহিমাগুণে ঘুরিতে আরম্ভ করিবে । তাহার মধ্যে চোরের নাম অথবা তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তির নাম না থাকিলে কখনই ঘুরিবে না, যদি ঘুরে তবে ঘাটী নামাইয়া তাহার মধ্যস্থিত পত্র গুলি বাহির করিয়া পুনরায় এক একটা পত্র সেই ঘাটীতে দিয়া পূর্ববৎ কেবল সুরায়ে পাকের পাঠ করিতে হইবে, তখন অপর কাহারও নামে না ঘুরিয়া কেবল চোর অথবা সেই চুরি সম্পর্কীয় ব্যক্তির নামের ঘাটী ঘুরিয়া

পড়িবে।* চোর ধরা বা চুরির মাল উদ্ধার করা সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাহি না, আমি কেবল খোদায়ে পাকের ও পবিত্র কলামের মহিমা কিরূপ তাহাই জানাইলাম, তবে তাঁহার কলামে পাকের ও ইসমে পাকের অমল অর্থাৎ পাঠের অভ্যাস করিলে আমরা কেন না চরিতার্থ হইব এই জন্য আমরা নিজের ইহকালের ও পরকালের উন্নতি করিতে চাহিলে প্রত্যহ বাউজু প্রীতি ও ভক্তি সহকারে যদি পবিত্র কলাম মুজিদের এক সেপারা এমন কি অন্ততঃপক্ষে এক রুকুও পাঠের অভ্যাস করি তাহাতে আমাদের অশেষ মঙ্গল। কেহ কলাম শরিফ পাঠ করিতে না জানেন তবে কোনও উজিফা পাঠের অভ্যাস করা কর্তব্য। অন্যান্য কোন দোয়া না জানিলেও “দোয়ায়ে গঞ্জল অর্শ” প্রত্যহ পাঠের অভ্যাস করা উচিত, অন্ততঃ পক্ষে সপ্তাহেও একবার পাঠ করা আবশ্যিক, ইহাতে অশেষ উপকার, ইহার দ্বারা সৎকামনা সমূহ পূর্ণ হয় ও খোদাওন্দ করিম সর্বসাধারণের প্রিয় করেন। যে দোয়া বা দরুদ ইউক না কেন নিয়মিতরূপে ও নির্ধার্য সময়ে পাঠ করা আবশ্যিক। চক্ষু বন্দ করিয়া ভক্তি ভাবে ও কাতর অন্তঃকরণে দোয়া বা দরুদ শরিফের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কেবল মাত্র আপন হস্তস্থিত তসবি অর্থাৎ মালার দানার প্রতি মগ্ন রাখিয়া একের পর একটি দানা গড়াইতে থাকা অথবা মুরশিদের আদেশানুযায়ী

* কোন প্রকার সিকলী বিদ্যা অর্থাৎ বাহু মন্ত্রেও এইরূপ ঘটনা ঘটে তাহা শরতামের কার্য।

শরীরস্থ কোন স্থান বা যন্ত্রের প্রতি চিত্ত সংযোগে সহকারে মন্ত্রের সাধনা করিলেই কোন প্রকার মিথ্যা বা বৃথা চিন্তা মনে আসিয়া স্থান পাইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা বা সাধনার সহজ ব্যবস্থা । আমরা সুখের সময় সকলেই খোদা ও রসুলকে ভুলিয়া যাই, তাঁহাদিগকে স্মরণ করি না । কোন প্রকার দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা বা আপদ ও বিপদের সময়েই খোদা ও রসুলকে মনে পড়ে ; কিন্তু তৎকালে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে অথবা কোন দোয়া বা দরুদ পাঠে কোন বিশেষ উপকারের আশা খুব কম । এই মর্মে কবি কবির দাস বলিয়াছেন—

হিন্দী ।

“কবির দুঃখ মে স্মরণ সব করে,
সুখমে স্মরণ না করে কোই,
যো সুখ মে স্মরণ করে
তো দুঃখ কাছে কো হোই ।”

ইহার অর্থ এই যে, দুঃখের সময়ে সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করেন, সুখের সময়ে কেহই তাহাকে স্মরণ করে না । যদি সুখের সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করে তবে দুঃখ কেন হইবে ।

“রুল লাহোঅলা মহম্মদ ।”

আমিন ! ! !

আমাদের দুর্দশা ।

অতি অল্পকালপূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কি ছিলেন আর আমরাই বা এক্ষণে কি হইয়াছি, ইহা ভাবেই বা কে আর বুঝেই বা কে । আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কিছুই রক্ষা করিতে পারি নাই, আছে মাত্র কেবল আমাদের অভিমান, তাহা আমাদের উপকার করিবে কি অনুপকারই করিতেছে, এমন কি সেই অভিমানেই আমরা মারা যাইতেছি । ধরিতে গেলে ধন, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অপর কেহ সর্বোচ্চ আসন লইতে পারিত না, তাহাই তৎকালে সেই অভিমান আমাদের সাজিতেছিল, এক্ষণে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে পারিব কি নিকৃষ্টত্বই হইয়া যাইতেছি, তাহাই আর আমাদের সে অভিমান সাজিতেছে না ; যদি অভিমান রাখিতে হয় তবে যাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে তদনুসরণ কার্য্য করা কর্তব্য নচেৎ আর অভিমান কিসের । এখন আর সে দিন নাই, যখন যে প্রকার দিন হয় তখন সেই প্রকার হওয়া আবশ্যিক । এক সময়ে ইজার, চাপকান, চোগা ও এবা না হইলে কাছারী দরবার হইতনা এমন কি সহরে এবং হাটে বাজারেও কেহ বাহির হইতেন না । ছাতা বরদার ছাতা ধরিয়া না গেলে, ছকা বরদার ছকা লইয়া পশ্চাৎ ধাবিত না হইলে বাহিরে কাহারও একপদ উঠিত না, এক্ষণে আর সে দিন নাই । এখন আর সে চাল চলন করিলে নিন্দনীয় হইতে হয় আমরা কিন্তু সেই অভিমানেই উন্মত্ত, আমরা যদি এখনও তাহা

ত্যাগ না করি এবং উপস্থিত সময়ের চাল চলন, আচার ব্যবহার রীতি নীতি, ও বিদ্যা শিক্ষা না করি তাহা হইলে আমাদের সাবেকের প্রকৃতির জন্য এক্ষণে যে অবস্থায় পরিণত হইতে হইয়াছে তদপেক্ষা অতঃপর আরও যে কত প্রকার অবনত অবস্থায় পতিত হইতে হইবে তাহা চিন্তার অতীত ।

সমাজের উন্নতি জাতীয় জমিদার ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের উপরেই নির্ভর করে, তবে তাঁহারা নিজেদের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে তাঁহাদের দ্বারা অপরের অথবা সমাজের উন্নতির আশা করাই যাইতে পারে না । এখনও আমাদের মধ্যে এমন অনেক জমিদার আছেন যে তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও ধারণা এযাবৎ পরিবর্তন হয় নাই, অতএব তাঁহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি আশা কোথায় ? তাঁহারা প্রকাশ করেন যে (কোন সত্য ঘটনার অবলম্বনে লিখিত) “আমরা খানদানী ও বুনিয়াদী, আমাদের পূর্ব পুরুষ বোগদাদ নগর হইতে অমুক বাদশাহের সময় অশ্বদেশে শুভাগমন করিয়া ছিলেন । অমুক পরগনা, অমুক চাকলা আমাদের পূর্ব পুরুষের জায়গীর ছিল, অমুক অমুক দেশের বিখ্যাত মহাপুরুষগণের সহিত আমাদের আত্মীয়তা, তদ্যতীত অণ্যকোন স্থানীয় লোকের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নাই । আরবি, ফার্সী ব্যতীত আমাদের বংশে অন্য কোন বিদ্যার অধিকার নাই । বাংলা ও ইংরাজী বিজাতীয় ও বিধর্ম্যাবলম্বীগণের ভাষা, বিশেষতঃ এই ইংরাজগণের ইংরাজি বিদ্যা অধ্যয়নকারিগণ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার বিধর্ম্যাবলম্বী হইয়া যান ;

আপনার দিন ও ইমানের উপর কিছুমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতে পারেন না ; তাঁহাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কার্যে একপ পরিবর্তন হইয়া পড়ে যে, আপন সৃষ্টি কর্তা ও পালনকর্তা খোদাওন্দ করিমের আরাধনা ও উপাসনা এবং আপন ধর্ম যাজক রসূলে করিমের দঃ আদেশ প্রতিপালনার্থে পবিত্র নমাজ ও রোজার সহিত এক প্রকার শত্রুতা করিতে থাকেন । সর্ব প্রকারে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া স্বয়ং সাহেব সাজিয়া বসেন এবং স্ত্রীলোকগণকে স্বাধীনরূপে বিচরণের ক্ষমতা প্রদান করেন, ইহা কেবল আপন ধর্ম ও জ্ঞানের অনভিজ্ঞতা হেতু জ্ঞানহীন পশুর ন্যায় কেবল মাত্র আহার, বিহার ও নিদ্রা ব্যতীত আর কিছুই পরিচয় দিতে পারেন না । এই উদ্দেশে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন :—

পাশী ।

“ইল্লা, দি, ফেক হস্তো তফসিরো হদিস

হরকে খানদ গাএর অজি গরদদ খবিস”*

আমার বংশের ছোট ছোট বালকগণ আপন আপন বাল্য-কালেই করিমা, গুলেস্টা ও বুস্তা ওগায়রোহ মুখস্থ করিয়া শেষে বয়োবৃদ্ধির সহিত উফী, জহির, সেকন্দরনামা, জলেখা, শাহনামা, রোকাৎ ও দিওয়ানিয়াৎ পাঠ শেষ করিয়া লন ; বয়ঃ-প্রাপ্ত হইতে না হইতেই আরবি বিদ্যায় শরহ মোল্লা ও শরহ ভেকায়া ওগায়রহ পাঠ করিয়া লন । এই প্রকারে আমাদের

* ইহার অর্থ এই যে, দিনের বিদ্যা অধ্যয়ন না করিয়া যদি কেহ অন্য বিদ্যা অধ্যয়ন করে তবে সে খবিস হয় অর্থাৎ বে দীন হয় ।

অনেকেই হিন্দিস, ফেকা, ওশুল, সরফ ও নহোএতেও বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল বিদ্যা ও পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া এক এক জন এক একটী মোলবী সাজিয়া থাকেন কিন্তু বিদ্যার পরিচয় লইতে গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের বিদ্যার দৌড় অসীম। অন্য কথা দূরে থাকুক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারীয় দ্রব্যাদি যাহা তাঁহারা সচরাচর ব্যবহার করিতেছেন তাহার মধ্যে কাহার মূল্য কত, অথবা কত মূল্যে কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে বা হইয়া থাকে, তাহার খোজ খবর রাখা দূরে থাকুক তাহার হিসাব করিয়া উঠা কাহারও দ্বারা হইতেই পারে না। এমন কি অনেককে ৩ + ১৩ + ২৩ অথবা ৮ + ১৮ + ২৮ টাকাতে মোট কত টাকা হইল, হটাৎ উত্তর দিতে হইলে তাঁহার আহার ও নিদ্রা ত্যাগ হইয়া যায়, ক্রমান্বয়ে হিসাব করিতে করিতে মাথা ঘুরিয়া যাওয়ায় সুস্থ হইবার নিমিত্ত, বেলা, ফুলেলা, চামেলী ও রক্তানেগুল ২।৫ বোতল খরচ হইয়া পড়ে* ।

জনাব মোলবী সাহেব অর্থাৎ হুজুর বাহাদুরের পৈত্রিক ভালুক আয়মা অথবা জায়গীর বা জমিদারী আছে তাহার বাৎসরিক আয় ১৫।২০ হাজার টাকা হইতে পারে কিন্তু পৈত্রিক অট্টালিকার কোন স্থানে ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে,

* ইনি জমিদারের সন্তান জমিদার, ইহাতেই তাঁহার এরূপ অবস্থা, তাঁহার আবার জমিদারী সংক্রান্ত জরিপ, জমাবন্দী, ধোকা, কড়চা, চিঠা, জমা, ওয়াশীল ও বাকী বুঝিবার কসমতা কি আছে? তাহা নাই। একবার মাত্র জাবিতে গেলেই আকাশ ও পাতাল এক হইয়া যায়।

কোন স্থানে কড়ি বরগা ঝুলিয়া রহিয়াছে, কুটির জল নল দিয়া পড়িবার আবশ্যক হয় না, গৃহাভ্যন্তরেই স্রোত বহিয়াই থাকে, হুজুর বাহাদুরের বাহির দালানে বসিতেও আশঙ্কা হয় কিন্তু তাহারই এক পার্শ্বে একটা মেজ ও মেজের চতুঃপার্শ্বে কুর্সী, দালানের শোভা বর্ধন করিতেছে । প্রাতে বেলা প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল এখনও সদরে হুজুর বাহাদুরের আগমন হয় নাই, জুতা সোজা করিয়া দেওয়ার কোন লোক ছিল না তাহাই বিলম্বের কারন । ইত্যবসরে সেবাদাসী একজন ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় একটা বস্তু আনিয়া হুজুরের সিংহাসনের এক-পার্শ্বে স্থান দান করিল । তাহার মস্তকোপরী পুষ্প কলিকটী ক্রমে বাতাস পাইয়া রক্তবর্ণ গোলাপের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল ও তাহার সৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত হইতে লাগিল । এমন সময়ে হুজুর বাহাদুরের দরবারের কর্মচারিগণ ভ্রমরের ন্যায় ক্রমান্বয়ে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন । বেলা ৯টা বাজিল তাম্বুল চর্বন করিতে করিতে হুজুরের বারাম্ব হইল, ক্রমান্বয়ে পিকদান, ওগালদান ও চিলমচি আসিয়া যে-যার আপন আপন স্থান অধিকার করিল, ইত্যবসরে পান-দান ও আতর দান আসিয়া মেজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, অতঃপর হুজুর বাহাদুরের দেওয়ানজীর আগমন হইতেছে ; শতাধিক গজ অন্তরে পাক্ষী হইতে অবতরণ করিলেন ও বহু কষ্টে ধীরে ধীরে পদব্রজে আসিতেছেন, প্রায় ১০।২০ গজ অন্তরে যেমন তাঁহার প্রতি হুজুর বাহাদুরের নজর পড়িয়াছে অমনই দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ বৃত্তাকারে অবনত

হইয়া প্রথমে ভূমে, পরে বক্ষঃস্থলে ও শেষে মস্তকে হস্তার্পন পূর্বক চারিবার হুজুর বাহাদুরের অভিবাদন করিলেন । আদব, কায়েদা, তাজিম ও তকরিমের চোটে হুজুর বাহাদুর বিমুগ্ধ হইয়া গিয়া গদগদ চিতে দেওয়ানজীকে সম্বোধন করিতেছেন আশুন, আশুন, রায়জী আশুন ! কেমন, আপনি ভাল আছেনত ! রায়জী জাতিতে হিন্দু কায়স্থ, রায় ভাট বা রায় ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি বাল্যকাল হইতে এই সরকারে কার্য্য করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে দেওয়ানী পদে আরুঢ় হইয়াছেন । সঙ্গ, সহবাস, বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড় অনুসারে উর্দু ভাষায় কথা বলিবার ও বুঝিবার বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে তজ্জন্ম হুজুর বাহাদুরের সহিত উর্দু ভাষাতেই কথা বার্তা হইতেছে । দেওয়ানজী হুজুর বাহাদুরের জমিদারীর মধ্যে যে গির দেওয়ারিতে গিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, দেওয়ানজী দণ্ডায়মান হইয়াই উত্তর করিতেছেন, হুজুরের সৌভাগ্য বশত আজ কয়েকদিন হইল অধীন কিঞ্চিৎ সুস্থ আছে, অধীন যখন অমুক কাছারীতে যায় ও অমুক কাছারীতে গিয়া উপস্থিত হয়, তথাকার কর্মচারিগণ অত্যন্ত অভদ্রতাচরণ করে তজ্জন্ম অধীনকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হয় তৎকালে অধীনের জ্বর হইয়া পড়ে, কয়েক দিবস অত্যন্ত জ্বর হওয়ায় অধীনের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কয়েক দিন মাত্র হইল অধীন সুস্থ হইয়াছে, তন্নিমিত্তই অধীন অতু হুজুরে হাজির হইতে পারিয়াছে । হুজুর বাহাদুর ইহা শ্রবণ করিয়া সত্য কি মিথ্যা নির্বাচন করিবার ক্ষমতার অভাব জনিত

কারণের গুণেই দয়ার্জ হইয়া উঠিলেন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়া কি প্রকারে জ্বর হইল ও কি প্রকারে চিকিৎসা হইল এবং কে চিকিৎসা করিল, পথ্যাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ও শতসহস্র আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেওয়ানজীকে যদিও হুজুর বাহাদুর তাঁহার আসন পরিগ্রহ জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে ছেন তত্রাচ দেওয়ানজী দণ্ডায়মানই আছেন, এই প্রকারে আলাপ ও কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই দেওয়ানজী যেমন বাঁম পার্শ্বে ফিরিয়া তাকাইলেন তেমনই একজন নগদী যে একটা ছোট পুটল হাতে লুকাইয়া লইয়া দেওয়ানজীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ানজীর হাতে পুটলটি প্রদান করিল, দেওয়ানজী তাহা লইয়াই হুজুর বাহাদুরের সম্মুখে মেজের উপর রাখিয়া দিয়া স্বসম্মানে আদাব ও তসলিমাত আদায় করিলেন এবং মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদুস্বরে বিশেষ আদব, ও কায়দার সহিত জানাইলেন, অধীন হুজুর বাহাদুরের যে সেলামী পাইয়াছে তাহা হুজুরের শ্রীপাদ পদ্মে দাখিল করিতেছে। হুজুর বাহাদুর তখন কি যে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলেন তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে কাহার সাধ্য। পুটলটি হস্ত ধারণ করিয়াই দেওয়ানজীকে শত সহস্র দোয়া অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ দিতে লাগিলেন ও পুনরায় দেওয়ানজীকে আসন গ্রহণ জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে পর তিনি আপন আসন গ্রহণ করিলেন, তাহার পর হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও খাজনা কিছু আদায় হইয়াছে কি ? যা আজ্ঞা হুজুর !

অমুক গোমস্তার নিকট হইতে এত ও অমুক অমুক কাছার হইতে এত এত টাকা খাজনা আদায় করা হইয়াছিল তত্রাচ অধীন হিসাব করিয়া দেখে যে কিস্তীর টাকা পুরা হয় নাই তখন অমুক শেটজীর নিকট হইতে এত টাকা কর্জ লইয়া কালেক্টারীতে কিস্তীর টাকা পুরা দাখিল করিয়া দিয়াছে । ইহা শ্রবণ করিয়া হুজুর বাহাদুর যেন আকাশের চাঁদই প্রাপ্ত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন রায়জী বড়ই বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন নিলামের ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে এখন খাজনার টাকা আদায় হইতে থাকিবে তবে এক্ষণে গোমস্তাগণকে তলব দেওয়া আবশ্যক তাহারা যেন প্রত্যেকে এত এত পরিমাণ টাকা সহ অমুক তারিখে কাছারীতে হাজির হয়, দেওয়ানজী উত্তর করিলেন যা আজ্ঞা, হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য, অধীন অদ্যই গোমস্তাগণকে তলব দিতেছে ।

দেওয়ানজীর বাড়ী দূর দেশে তিনি বাল্যকালাবধি হুজুর বাহাদুরের সরকারে চাকরী করিয়া এক্ষণে সর্বোচ্চ দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছেন । দেওয়ানজীর বেতন মাসিক থোকা ১০, দশ টাকা মাত্র ; এই বেতনেই যে দেওয়ানজীর সংসার চলিতেছে তাহা নহে, এই সরকারে চাকরী করিয়া দেওয়ানজী দেশে অর্থাৎ বাড়ীতে জায়গা, জমিদারী, মহাজনী ও তেজারতীতে হাজার হাজার টাকার স্টেট করিয়াছেন । তাঁহার নিম্নস্থ কর্মচারিগণ পদ মর্যাদায় যেমন নিম্ন বেতন ও তেমনই এবং তাঁহাদের বৈষয়িক অবস্থাও তদনুরূপ । এই প্রকার বেতনে হুজুর বাহাদুরের কর্মচারিগণ কি করিয়া কার্য্য করিতেছে ও

কি প্রকারে বিষয় বৈভব করিতেছে তাহা হুজুর বাহাদুর বেশ জানেন কিন্তু তাহার কারণের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার কোনই ক্ষমতা নাই, অথবা মনে হয় পাছে তত্ত্বা উন্টিয়াই যায় । দেওয়ানজীর সহিত কথোপকথন কালে টাকার পুটুলটী তিনি খুলিয়া গণনা করিলেন টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী ও পয়সাতে মোট ২৭৮/১৫ (সাতাইশ টাকা তিন আনা তিন পয়সা) হইল । জমিদারীর দেওয়ান একজন দীর্ঘকাল জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিলেন, কতই যে লাক কে লিখ করিলেন, কতই বাজে মামলা ও মোকদমার বিচার করিয়া ডিক্রী ও ডিসমিস্ করিলেন ও কত লোকের ভিটায় ঘু ঘু চরাইলেন তাহার খোজ খবর লেয় কে । হুজুর বাহাদুর এক মুঠা খোকা টাকা পাইয়া মহা আনন্দিত, মনে করিতেছেন ইহা আমার উপরী অর্থাৎ বাজে আমদানী “কেয়া পরওয়া হায়” অমনী খানসামাকে ডাক হইল, হুজুর বলিয়া উত্তর দিয়া খানসামাজী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন, আদেশ হইল (লও বলিয়া হাতে যাহা উঠিল প্রদান করিলেন ও বলিলেন) যাও এখনই অমুক অমুক দ্রব্য এত এত পরিমাণ ক্রয় করিয়া লইয়া আইস এবং অতি শীঘ্র খানা প্রস্তুত কর ও অমুককে বলিয়া দাও সে যেন অমুক অমুক সাহেবানকে অণুই এখানে আহ্বানের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া আইসে ।

কাছারী গরমাগরম লাগিয়াছে নিম্ন পদস্থ কর্মচারিগণ নিস্তক, তাহারা যেন যে যার ইচ্ছা সাধনার জন্তই ব্যস্ত, কিন্তু দেওয়ানজীর সহিত হুজুর বাহাদুরের চুটকি গল্প চলিতেছে ও

গড়াগড় গুঁড়গুড়ি ডাকিতেছে ; তামাকের স্বগন্ধে কাছারী আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে । দেওয়ানজী প্রসঙ্গচ্ছলে হুজুর বাহাদুরের তামাকের প্রশংসা করিতেছেন, তজ্জন্য হুজুর বাহাদুরও তামাকের বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । “হে রায়জি, আপনি কি বলিতে চাহেন যে ইহা অতি পুরাকালের সামগ্রী এবং অতি সামান্য দ্রব্য, তাহা নহে, এই তামাকটী এমন দ্রব্য যে পয়সাতে ৫০৭ তোলা হইতে শত টাকা তোলা দরেরও প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং বিক্রয় হয় । আমার স্বর্গীয় পিতামহ মহাশয় ৫০৬০ টাকা তোলা মূল্যের তামাকি খাইয়া থাকিতেন, তদ্ব্যতীত অন্য কোন তামাক ব্যবহার করিতেন না, যদিচ কখন কোন খিজমৎগার মূল্য চুরি করিয়া কিছু অল্প মূল্যের তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত ও তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরঃপীড়া হইয়া পড়িত ও তিনি পীড়িত হইয়া পড়িতেন ; এক্ষণে এই হতভাগার ভাগ্যে সে দিন কি আর আছে ; এক্ষণে আমাকে ৫০৬০ টাকা সেরের তামাক ব্যবহার করিতে হইতেছে । রায়জী এই তামাক বহুদিবসের পুরাতন দ্রব্য নহে, আপনি হয়ত জানেন সন ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ড্রেক যিনি সর্বপ্রথমে আমেরিকা মহাদেশকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন তিনিই তথা হইতে এই তামাক সঙ্গে লইয়া আসিয়া ইহাকে কলিকায় সাজিয়া খাইবার প্রথা ইউরোপে প্রচার করেন ; তাহার পূর্বে ইউরোপ মহাদেশে ইহার নাম ও গন্ধমাত্র ছিল না, যখন ক্রমে ইউরোপে ইহার ব্যবহার বিস্তার হইতে আরম্ভ হয় তখন জ্ঞানিগণ

ইহার গুণ ও অনুপকারিতা দোষ বৃদ্ধিতে পারিয়া প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় তৎকালীন ইউরোপবাসী সম্রাটগণ ইহার ব্যবহারে নিষেধ আজ্ঞা স্বরূপ বিশেষ আইন ও কানুন প্রচার করিতে থাকেন, এমন কি ইংরাজ জাতীয় সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক রোম নগরী পোপ অবরান ৮ম ও পোপ ইনোসেন্ট ১১শ ইহার বিরুদ্ধে গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা সহ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আমাদের মহামাণ্ডল সুলতান রুম ও এই তামাকের ব্যবহারকারিগণের প্রাণ দণ্ডের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন । পর্তুগীজ বণিকগণ সর্ব প্রথমে এই ভারতবর্ষে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে এই অমৃত সম অনুপম দ্রব্যকে লইয়া আসিলেন । জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও ইহার ব্যবহারের বিপক্ষে বহুতর কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে সাজাহান বাদশাহের আমলে ইহার সম্বন্ধে আর কোন প্রকার গোলযোগ থাকে নাই, বরং ক্রমে অশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম সহকারে ইহার অধিকার শাহী দরবারেও বিস্তৃত হইয়া যায় এবং তৎকালেই সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত ইহার মূল্য ও তদনুরূপ আকাশ মার্গে উঠিয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার পর বাদশাহগণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মর্যাদারও বিস্তর হ্রাস হইয়া গিয়াছে । ইহার ব্যবহারকারিগণ শত মুখে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, আমিও একজন ইহার গুণানুবাদক কিন্তু জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ আপন আপন পুস্তকে ইহার অনুপকারিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া আসিতেছেন যে ইহা ব্যবহার করিলে মনুষ্যের শরীরস্থ সমূহ যন্ত্রের ক্ষমতা

হাস হইতে থাকে। লোকে সর্ব প্রথমে ইহার ব্যবহার শিক্ষা করিবার সময় ইহার দ্বারা কোন উপকার পাইতে পারে কি না অথবা কোন উপকার হইবে কি না তাহা না ভাবিয়া কেবল একজন অপরের দেখাদেখি সখের উপর নির্ভর করিয়া ইহার ব্যবহার আরম্ভ করেন, কিয়দিবস মধ্যেই তাহা গলগ্রহ হইয়া পড়ে, তিনি আর তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন বুঝিতে থাকেন যে, ইহার দ্বারা আমি অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু যখন ইহার ব্যবহার আরম্ভ না হইয়াছিল তৎকালে কেহ তাহার দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারেন না, অপর মাদক দ্রব্য ব্যবহারেই লোকে পাগল হয়, ইহার কিছু বিপরিত গুণ, ইহা না খাইলে অথবা না পাইলেই লোককে পাগল করিয়া তুলে অর্থাৎ লোকে অস্থির হইয়া পড়ে। আমিও ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।” এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে মোলাজেমান আসিয়া ২১- বার ওগালদান ও পীকদান পরিস্কার করিয়া আনিল। হজুর বাহাদুরের পানের সহিত কিঞ্চিৎ জরদা অর্থাৎ শুষ্ক তামাক ব্যবহারেরও অভ্যাস আছে তজ্জন্য পাতি হাঁসের বিষ্ঠা তাগের ন্যায় পচ পচ করিয়া থুতু ফেলিতে হয়, সমূহ থুতু যে পীকদান ও ওগালদানেই স্থান প্রাপ্ত হইতেছে এমন নহে, বেশ ভূষার অধিকাংশ স্থানেও ইহার অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়।

খানসামাজী বাজার হইতে ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন হজুর বাহাদুরের নজর তাহার উপর পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি তুমি সকল জবাই পাইলে ত ? খানসামাজী উত্তর করিলেন
 ছজুর অদ্য কসাইর দোকানে পঁছিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব
 হইয়া যায় কিন্তু অধিন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে যে কোন
 দোকানে উৎকৃষ্ট মাংস নাই কেবল মাত্র একটা দোকানে
 যাহা ছিল তাহাও অমুক সাহেবের খানসামা দর দস্তুর
 করিতেছে, অধিন তখন মনে ভাবিল যে এখন যদি আমি এই
 স্বেযোগ ত্যাগ করি তাহা হইলে অদ্য আমার উপর আকাশ
 পড়িয়া যাইবে, এই নিমিত্ত এদাসও সেই মাংসের উপর
 দর করিতে আরম্ভ করে ; উভয়ে দর দস্তুর হইতে হইতে
 তর্ক উপস্থিত হয় শেষে ছজুরের দাস এই খাসীর মাংস ২
 দুই টাকা সের ও গোমাংস খণ্ড এক টাকা সের দরে খরিদ
 করিয়া লয়, সেই খানসামাকে কিছু মাত্র লইতে দেয় নাই।
 ছজুর মাংসখণ্ড সমূহের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করণ,
 দেখুন কেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী অধিন আনিয়াছে।
 ছজুর বাহাদুরের খানসামা অদ্য যেন রুস ও টার্কিস ওয়ারের
 প্লেভনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই আসিয়াছে; ইহা সত্য বা মিথ্যা
 বিবেচনা করিবার ক্ষমতার অভাব প্রযুক্ত ছজুর বাহাদুর আপন
 খানসামাজীর মিষ্ট বাক্যালাপেই আহ্লাদে উথলিয়া উঠিয়াছেন ;
 “অমুক সাহেবের খানসামাকে আমার খানসামা অদ্য যুদ্ধে
 পরাজয় করিয়া আসিয়াছে, বাহবা, সাবাস, তুমি আজ বাহাদুরের
 কার্য্য করিয়াছ অবশ্যই তুমি অল্প সমুচিত পুরস্কার পাইবার
 যোগ্য।” এই উপলক্ষে কত কথা ও কত দৃষ্টান্তই ছজুর
 বাহাদুরের হইয়া গেল। দেওয়ানজী ও অপরাপর কর্মচারিগণ

শত সহস্র প্রকারে হজুর বাহাদুরের গুণের প্রশংসা করিতেছেন ; এমন সময়ে একজন হিন্দু ভদ্রলোক দূরে গাড়ী হইতে নামিয়া বিধিমত হজুর বাহাদুরের অভিবাদন করিয়া দেওয়ানজী সন্নিধানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও বিশেষ আদব কায়দা সহকারে দেওয়ানজীর সহিত চুপী চুপী কথা কহিলেন । দেওয়ানজী হজুর বাহাদুরকে জানাইলেন, হজুর বোধ হয় এই বাবুটীকে চিনিতে পারেন নাই ; ইনি অমুক জমিদারের সম্ভ্রান, হজুর বলিলেন, হাঁ ইনিই কি ? এই কথাতেই বাবু সাহেব অর্ধচন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় বিধিমত হজুর বাহাদুরের অভিবাদন করিলেন, হজুর বাহাদুর বাবু সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন অগো বাবু তোমার পিতার সহিত যে পত্র দেওয়া লওয়া হইতেছিল তাহার কি হইল ? তদুত্তরে দেওয়ানজী বলিয়া উঠিলেন বাবু অদ্য সেই জন্যই হজুরে হাজির হইয়াছেন । হিন্দু বাবুটী আপন দেশের একজন জমিদারের বাচ্চা জমিদার, এক খণ্ড জমিদারীতে হজুর বাহাদুরের অর্ধেক অংশ ও অর্ধেক অংশ বাবু সাহেবের । বাবু সাহেবদের কুটিলচক্রে হজুর বাহাদুর তথায় স্ফটিকরূপে দণ্ডুর খুলিতে পারেন না, তাহাতে আবার দেওয়ানজীর মন্ত্রণার দৌড় । এই জমিদারী খণ্ড লইয়াই হজুর বাহাদুরের সহিত ও বাবু সাহেবের পিতার সহিত পত্র চলিতেছিল, সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্যই বাবু সাহেব অদ্য শুভাগমন করিয়াছেন । বাবু সাহেব বাঙ্গালীর ছেলে হিন্দী বা উর্দু জানেন না, অথবা হজুর বাহাদুর কি অন্য

কোন শিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে বা সহবাসে দীর্ঘকাল থাকেনও নাই, সুতরাং তাঁহার উর্দু ভাষায় কথা বলিবার ক্ষমতাও নাই । হুজুর বাহাদুরের সহিত বাবু সাহেবের কথা চলিল, বাবু বলিতেছেন, বড় হুজুর খুব উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন তিনি লাঠির জোরেই দুষ্ক প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তাঁহারই ক্ষমতাগুণে আমরাও কিঞ্চিৎ খাজনা পাইতেছিলাম, তাঁহার পরলোক গমনের পর দুষ্ক প্রজাগণ কাঁহাকেও খাজনা দিতেছে না, আমরা উভয়েই ফাঁকি পাইতেছি, এই জন্যই আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় আমাকে হুজুরে পাঠাইয়াছেন, হুজুরে আমার অংশ খরিদ করিয়া লওয়া হউক না হয় ইজারা লওয়া হউক নচেৎ হুজুরের অংশ আমাদের দিগকে দেওয়া যাক । হুজুর বাহাদুর উত্তর করিতেছেন, ওহে বাবু সেই স্থানেই তোমাদের বাড়ী তোমরা সহজে ষোল আনা খাজনা আদায়, ওয়াশীল করিতে পারিবে, আমার দ্বারা তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব, তাহাই আমি এতাবৎ পারিতেছি না, তজ্জন্য বলিতেছি যে যদি আমার অংশ তোমরা লইতে চাও তাহা হইলে দিতে সম্মত আছি । দেওয়ানজী ইহা শুনিবা মাত্রই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন, কারণ ভিতরে ভিতরে বাবু সাহেবের সহিত যাহা হইবার তাহাত হইয়াই গিয়াছে, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, হুজুর ! অধীনও বাবু সাহেবের সহিত এই কথাই কহিতেছে এবং তাহার বন্দোবস্ত করিতেছে । বাবু সাহেব বলিতেছেন যে হুজুর বাহাদুরের হাজার টাকা সেলামী দিয়া শতকরা ছয় টাকা চারি আনা সরঞ্জামীর উপর ইজারা বন্দোবস্ত

করিয়া নেন, যদি খাজনার টাকা যথা সময়ে আদায় দিতে না পারেন তবে শতকরা তিন টাকা দুই আনা হারে সুদ দিতে থাকিবেন । এই নিমিত্ত অধীন বলিতেছে যে, সুদের হার অত্যন্ত কম । হুজুর বাহাদুর তখন বলিয়া উঠিলেন তুমি যাহা বলিতেছ তা সত্য, আচ্ছা, আমিও বুঝিয়া উত্তর দিব । কাছারী বরখাস্তের সময় হইয়াছে দেওয়ান ও মুসদ্দী আদি একে একে হুজুর বাহাদুরের খেদমতে আদায়, তসলিমাত ও কুর্নীশ আদায় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, তদসহ বাবু সাহেবও আপাততঃ বিদায় হইলেন ।

বেলা প্রায় একটা অতীত হইয়াছে এমন সময়ে নিমন্ত্রিত সাহেবানগণের আগমন হইতে আরম্ভ হইল । খিজমৎগার খানার জন্য ফর্শ করিয়া দস্তরখান আনিয়া পাতিল, লাল ও কাল অক্ষরে আরবি ও ফার্সী ভাষায় অসংখ্য কবিতা মনমুগ্ধ করিতেছে, জল পাত্র ও চিলমটি আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমান্বয়ে চিত্র বিচিত্র, রঙ্গিন ফুলদার ও নক্সাদার এবং কত স্থানে কত প্রকার শ্বেত লোহিত বর্ণের জরির কাজ করা ও কতই কবিতা লিখিত খানপোশ আবৃত ছোট ও বড় ৪টা খানচা আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার

প্রথম খানচায়	দ্বিতীয় খানচায়	তৃতীয় খানচায়	চতুর্থ খানচায়
আবিরগুণি	পেলাও	কোরমা	ফিণী
বাকরখানী	চোলাও	কলিয়া	ইয়াকুতি
চপাতী	জরদা	কোক্তা	মাকুতি
দোস্তী	মোতজ্জন	টিকিয়া	মজোচি
গোরাটা	হলিমা	মাদাকবাব	বালারী

প্রথম খানচায়	দ্বিতীয় খানচায়	তৃতীয় খানচায়	চতুর্থ খানচায়
কুলিচা	মিঠি খিচড়ি সাদি খিচড়ি	হস্তি কবাব	রাবড়ী
খাওয়া	ডুর্নীখিচড়ী	ওলর কবাব	দহি
সবোসা	বিরিয়ানী	মোসম্মণ	বোরহানী
শিরমালী	কচ্চিবিরিয়ানী	ভুঞ্জিয়া	ইত্যাদি মিষ্টসামগ্রী
বেসরী	মোজফ্‌কর	ভর্তাআদি	আছে
নানখতায়ী	ইত্যাদি খানা	সালুন আছে	
পোখলারা ইত্যাদি রুটি			

এতদ্ব্যতীত আরও একটা খানচায় বাজারের নানা প্রকার মিষ্টান্ন শু কত কি প্রকারের যে চাটনী আছে তাহার ইয়ত্তাই করিতে পারা যায় না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণসহ হুজুর বাহাদুর ভোজনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভোজনকালে নানা দেশীয় নানা প্রকার আজগুবি ও উদ্ভুটী কথার স্রোত বহিতেছে, কোথায় কাহার রাজধানী গেল ও কাহার রাজধানী হইল গল্প হইতেছে। পানীয় জলের স্থানে নানা প্রকার শরবতের তরঙ্গ ছুটিতেছে। শরবতে অনার, তুরঞ্জেবিন ও শোকেঞ্জেবীনের কতই বোতল খালী হইয়া গেল, সোডা, লেমনেড ও বরফের ইয়ত্তা করে কে। আহারান্তে পান, তামাক খইনী, গুণ্ডি, জরদা, কেমাম ও সুতীর ডিবা সমূহ তারা ও নক্ষত্রের ণায় মেজের শোভা বর্ধন করিতে লাগিল। নানা প্রকার আতরের অসংখ্য শিশিপূর্ণ বাস্ম মেজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কেহ প্রথর রৌদ্রে বাড়ী যাইতে না পারিয়া হুজুর বাহাদুরের আলয়েই বিশ্রাম করিলেন। হুজুর বাহাদুর সকলের অনুমতি লইয়া আরাম জন্য অন্তর মহলে প্রস্থান করিলেন।

বেলা প্রায় ৬টা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যে যার আলয়ে প্রস্থান করিয়াছেন, এখনও হুজুর বাহাদুরের বারাম হয় নাই । সকলেরই নিদ্রা হইল কিন্তু যিনি স্বকার্য সাধনে ব্যস্ত তাঁহার নিদ্রা নাই, আপন চিন্তার বেগে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন না । বাবু সাহেব বাসাতে গিয়া আহার করিয়াই দেওয়ানজীর সহিত গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার পর আবার হুজুর বাহাদুরের ভবনে আসিয়া আড়ালে বসিয়া বড়সাহেবজাদা সাহেবের সাক্ষাৎ লালসায় উদ্বিগ্নচিত্তে কতই কি ভাবিতেছেন, পরিচারিকাগণ দ্বারা বড়সাহেবজাদা বাহাদুরের সমীপে বারম্বার সংবাদ পাঠাইতেছেন, ইহার বয়স প্রায় ২২।২৩ বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স বোধ হয় ১৭।১৮ মাত্র । বড় কর্তা সংসারের সুখ পাইয়াছেন, ছোটটী এখনও যেন ক্রোড়েই আছেন এই জন্য ছোটটীর দ্বারা কোন কার্য হইবার আশা নাই ভাবিয়া বাবু সাহেব বড়সাহেবজাদা সাহেবের সাক্ষাৎ অপেক্ষায় চিন্তিত, এমন সময়ে শান ও শাওকতের সহিত বড় সাহেবজাদা সাহেব অন্তর হইতে বহির্গত হইলেন, বেলা প্রায় ৬।৩০, হুজুর বাহাদুর গাত্রোথান করিয়াছেন কিন্তু অন্তর মহলেই আছেন । বাবু সাহেব, সাহেবজাদা বাহাদুরকে দেখিবামাত্রই দণ্ডায়মান হইয়া বিধিমত অভিবাদন করিলেন ; উভয়ের সাক্ষাতে উত্তমরূপ পরিচয় হইয়া গেল । আশুন বাহিরে বেড়াইতে যাই, ঘরে বসিয়া কি করিবেন বলিয়া বাবু সাহেব সাহেবজাদা বাহাদুরের হাত ধরিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বাহিরে আসিলেন ; বাহিরে বাবু সাহেবের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিলেন ; নানা প্রকার

কথা হইতে লাগিল, অল্প সময়েই সহরের মধ্যে ২১৪ মাইল পথ ভ্রমণ হইয়া গেল । সন্ধ্যা হইয়াছে এক্ষণে কিছু আমোদ করা আবশ্যক বলিয়া বাবু সাহেব, সাহেবজাদা সাহেবের অর্দ্ধ সন্মতি লইয়া উভয়ে এক বাইজীর ভবনে উপস্থিত হইলেন; বাবু সাহেব বনাবন, ঠনাঠন টাকা খরচ করিতে লাগিলেন, নানা প্রকার আমোদে ও প্রমোদে মত্ত হইলেন, কিছুক্ষণ পরে রাত্রি যখন ১১টা বাজিয়া গেল উভয়ে তথা হইতে উঠিলেন । বাবু সাহেব তৎকালে ষোল আনার উপর বিশ আনা পরিমাণ সাহেবজাদা বাহাদুরের অন্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন এবং সাহেবজাদা বাহাদুরও বেশ বুঝিয়াছেন যে এমন অকপট বন্ধু আর কোথায় পাইব । অকপট কি কপটবন্ধু তাহা বুঝিবার ক্ষমতাই নাই । উভয়ে বেশ কোলাকুলি ও টানাটানি হইতেছে, বাবু সাহেব আপন সুযোগ বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন, হজুরের অমুক জমিদারীর অংশ আমাকে ইজারা দিবার কথা হজুরের পিতার সহিত চলিতেছে, তাহাতে আমি হাজার টাকা সেলামী দিবার অঙ্গীকার করিয়াছি, হজুর এখনও কোন হুকুম দেন নাই, তাহাই আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা ও আপনার মাতা ঠাকুরাণীকে পাঁচশত টাকা গোপনে সেলামী দাখিল করিব, আপনারা উভয়ে হজুর বাহাদুরকে বুঝাইয়া বলিলে অবশ্যই আমার এই কাজ হইয়া যাইতে পারে, তবে দলীল রেজেক্টারীর পর হজুরের হাজার টাকা এবং আপনাদের হাজার টাকা সমূহ বুঝাইয়া দিব । সাহেবজাদা বাহাদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আদরের ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধির সাগর, ফার্সী

৭ আরবি বেশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অল্পদিন হইল ইহার শুভ বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে ৫৭৮৩৮/১৫ টাকা নগদ খরচ হইয়াছে, উহার প্রায় সমস্তই লিখিতঃ যন্ত্রে নির্মিত, তন্মধ্যে প্রায় পাই পয়সা কোন প্রকার নেক অর্থাৎ দেশের বা সমাজের উন্নতি বা মঙ্গল সাধনার্থ ব্যয়িত হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না ; অধিকাংশই টাকা খেমটা ও বাইজীগণের শ্রীপাদপদ্মে দাখিল করা হইয়াছে ও তাম ওলিমার খানা খাওয়াইয়া এবং আতসবাজীর দ্বারা অসংখ্য টাকা আগুণে পুড়াইয়া নাম জাহির করা হইয়াছে। দীন, দুঃখী বা মুখাপেক্ষীও যদি কেঁহ কিছু পাইত তাহা হইলেও কাহারও উপকার হওয়া বলা যাইত, কিন্তু তাহাও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ইনিই সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি এক্ষণে মনে করিতেছেন, কি চিন্তা, পাঁচশত টাকাত পাইয়া যাইব ; উত্তর করিলেন হাঁ ভাই আপনার শ্যায় বন্ধুর কার্য্য আমি প্রাণপনে যত্ন পূর্বক করিব, অবশ্যই আমি মাতা ঠাকুরাণীর দ্বারা পিতা ঠাকুরকে বলাইব। কল্য আপনি আসিবেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আমি আপনাকে উত্তর দিব। অতঃপর বাবু সাহেব, সাহেবজাদা বাহাদুরকে বাড়ীতে ছাড়িয়া দিয়া অগ্নিকার জন্ত বাসায় গমন করিলেন ; পথি মধ্যে দেওয়ানজীকে ইহা জানাইয়া যাওয়া উচিত ভাবিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় গমন করিলেন।

পর দিবস দেওয়ানজী কাছারীতে আগমন করিলেন, হুজুর বাহাদুরের সহিত বাবু সাহেব সম্পর্কীয় আলাপ হইতেছে, দেওয়ানজী বলিতেছেন, বাবু সাহেব যদি শতকরা তিন টাকা

দুই আনার স্থলে ছয় টাকা চারি আনা সুদ দিতে স্বীকৃত হন তাহা হইলে পৃথক কথা মতুষা তাঁহাকে স্পষ্ট উত্তর দেওয়া আবশ্যক । হজুর বাহাদুর তাহাই সমর্থন করিয়া বলিলেন, আপনি শ্রায্যই বলিতেছেন । এত অল্প সুদে সম্মত হওয়া কর্তব্য নহে, অতঃপরে সাহেবও আমাকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন, ভাল, বাবু সাহেবকে বলুন, তিনি কি বলেন, দেওয়ানজী বলিলেন আমি অতঃপরে তাঁহাকে হজুরে হাজির হইবার জন্য কল্যাই বলিয়াছি, হজুরের সাক্ষাতেই যাহা বলিবার আছে তাহা স্পষ্টই বলিয়া দিয়া, দেখা যাক্ তিনিই কি বলেন । বেলা মধ্যাহ্ন হইল, কাছারী ভগ্ন হইল, হজুর বাহাদুর অন্তরে গেলেন, মাথার ঘায়ে যেমন কুকুর পাগল হয় বাবু সাহেবও তদনুরূপ আপন মনস্কামনা পূর্ণ জন্য পাগল হইয়াছেন, তাঁহার আহার ও নিদ্রায় সুখ নাই, কারণ তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই । অন্যদিকে সাহেবজাদা বাহাদুর এক দিবসেই যেন স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের রাজত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিও আপনার রাজত্বের চিন্তায় পাগল হইয়াছেন, তাঁহারও কি আর বিশ্রাম আছে, সে সুখে বঞ্চিত, কিন্তু তিনি অন্য সুখের চিন্তায় অস্থির । গ্রীষ্মকালের দিন বেলা অধিক থাকিতে থাকিতেই ৪।৫টা বাজিয়া যায়, অন্য দিবস রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ হেতু ৫।৫।৫টা পর্য্যন্ত বাহিরে আসিতে পারেন না, কিন্তু অদ্য ৪টা বাজিতে না বাজিতেই অন্তর ও বাহির হইতেছেন এবং অহরহ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিতেছেন ও পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । ঠিক ৫।৫টার সময়েই গাড়ীর ঘড় ঘড়ী শব্দ সাহেবজাদা বাহাদুরের কর্ণ কুহরে প্রবেশ

করিয়া মাত্রই মনে যেন ধড় ধড়ি আরম্ভ হইয়া গেল, চৌকি হইতে উঠিয়া দেখিলেন বাস্তবিক তাঁহার প্রাণের বন্ধু বাবু সাহেবই আসিতেছেন, অগ্রবর্তী হইয়া বন্ধুর সম্মানার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু বাবু সাহেব আদব ও কায়েদা ভুলিবার ছেলে নহেন, তাঁহার হস্তে হস্ত না দিয়া অগ্রেই অতিভক্তি সহকারে যথারীতি অভিবাদন করিলেন । “অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ” ইহা বুঝিয়া উঠিবার ক্ষমতা আছে কি ? তাহা নাই ; যাহা হউক পরে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন । সাহেবজাদা সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্বেই বা সাহেব দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াই আসিয়াছেন, সে গুপ্ত মন্ত্রণার সন্ধান পায় কে, যাহা জানেন, তিনি আর উনি । আজ সময় নষ্ট করা কর্তব্য নহে ভাবিয়া বাবু সাহেব আপন বুদ্ধি ও কৌশলে নানা প্রকারচ্ছলে আপন ইচ্ছা সাধনার ফলযুক্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইলেন । তাহার পর বলিতেছেন, হুজুর অদ্য আমি সেই বাইজীর ভবন হইতে আসিতেছি সে কিছু অসুস্থ আছে, আমার সহিতও সাক্ষাৎ হয় নাই, অদ্য আমারও শরীরটা বড় ভাল নহে এই জন্য আমার প্রার্থনা যে, আপনি এই ৫০ টাকা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন, আর আপনার যথা ইচ্ছা গমন করুন, এবং অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন আমি বাসায় গমন করি । সাহেবজাদা সাহেব টাকা লইতে চাহেন না, বন্ধু বিহনে একা কোথায় যাইবেন ও কি সুখ পাইবেন তদসম্বন্ধে নানা কথাই বলিলেন, কিন্তু ৫০ টকাও কম টাকা নহে মনে মনে তাহার প্রতি ক্রমে

মমতা জন্মিতেছে, কিন্তু মুখে নানা কথা বলিয়া বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করিতেছেন । বাবু সাহেব বলিলেন, হুজুর এই টাকা আপনার সেই পাঁচ শত টাকার মধ্যস্থিত টাকা নহে, ইহা কেবল আপনার অদ্যকার আয়েশ ও আরাম খরচ জন্য মাত্র । হুজুরের মন বড়ই আহ্লাদিত হইল, ভাবিলেন ৫০০ টাকা একবারেই থোকা পাইবেন, এটা আজকার তাঁহার উপরি টাকা ভাবিয়াই টাকা গুলি হস্তগত করিলেন, বাবু সাহেব আপন গাড়ী হুজুর বাহাদুরের জন্য ছাড়িয়া দিলেন, গাড়ীর ভাড়া বাবু সাহেবেরই নিকট হইতে লইবার জন্য কোচম্যানকে আদেশ করিয়া নিজে পদব্রজে বাসায় গমন করিলেন । অন্যদিকে হুজুর বাহাদুর নিজের ইচ্ছামত স্থানে গমন করিয়া মনোমত ভাবে অর্থ ব্যয় সহকারে কিঞ্চিৎ কালক্ষেপন করিয়া বাড়ীতে গমন করিলেন । বাবু সাহেব বিদায় হইয়া দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া বাসায় জান নাই, পর দিবস হুজুর বাহাদুরের কাছারীতে উপস্থিত হইলেন, ছলনাপূর্বক দেওয়ানজীর সহিত নানা প্রকার ওজর, আপত্তি ও হুজুর বাহাদুরের সমীপে অশেষ প্রকার কাকুতি ও মিনতির পর প্রতি কিস্তী টাকা না দিলে শত করা ছয় টাকা চারি আনা স্বেদেরই উপর স্বীকৃত হইয়া রেজেষ্টরী করিয়া দিবার জন্য সম্মত হইলেন, দুই পক্ষ হইতে দুইটা দলিল হইয়া রেজেষ্টরী হওয়ার কথা স্থির হইল ও তাহার খসড়া অমুক অমুক উকিল বাবুগণকে দেখাইয়া যাচাই জন্য হুজুর বাহাদুর দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন । কাছারী বরখাস্ত হইল বিধিমত অভিবাদন পূর্বক দেওয়ানজী ও বাবু সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

সাহেবজীদা বাহাদুর আপন চিন্তায় অস্থির, অন্য দালানে দাঁড়াইয়া বাবু সাহেবের সাক্ষাত প্রতীক্ষা করিতেছেন, বাবু সাহেব আসিবামাত্রই উভয়ে ভাবে ও প্রকারান্তরে ঠিক হইয়া গেল যে বাবু সাহেব অদ্য অপরাহ্নে আসিতে পারিবেন না । দলিলের খসড়া হইল, উকিল বাবুগণকে দেখান গেল, উভয় পক্ষের স্ট্যাম্প খরিদ হইল, খসড়া আসিয়া হুজুর বাহাদুরকে শোনান হইল, দলিল বাঙ্গালা ভাষাতেই হইল । হুজুর বাহাদুর বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন, কিন্তু হায়রে কপাল, আর হায়রে বিদ্যা ও বুদ্ধি, এটাও বুঝিতে পারিলেন না যে, কিস্তী খেলাপ করিলে কাগজ কলমের সুদ লইয়া করিবেন কি, টাকা না দিলে কালেক্টরীর খাজনা দিব কোথা হইতে, ক্রমান্বয়ে টাকা বাকী ফেলিতে থাকিলে টাকা সমূহ আদায়ের ব্যবস্থা কি হইবে । ইহা বুঝাইয়াই বা দেয় কে, দেওয়ানজী নিমকখার হইয়া নিমক হারাম হইয়াছেন । পর দিবস উভয় দলিল লিখিত হইল । হুজুর বাহাদুর কাছারী গিয়া রেজেষ্টরী করিলে ইহা অপেক্ষা অসম্মানের বিষয় আর কি হইতে পারে, তন্নিমিত্ত দেওয়ানজী উভয় দলিলের রেজেষ্টারি আফিসের খরচ সমূহ হুজুর বাহাদুরের খায়ের খাহী করিয়া বাবু সাহেবের উপরেই ন্যস্ত করিয়া দিলেন । বাবু সাহেবও আমতা আমতা করিয়া স্বীকার করিলেন, রেজেষ্টরী আফিসে কমিশন দাঁখিল হইয়া গেল । সবরেজেষ্ট্রার বাবু হুজুর বাহাদুরের গৃহেই আগমন করিলেন । উভয় দলিল একত্রেই রেজেষ্টরী হইয়া গেল । বাবু সাহেবের পিতা বর্তমানে পুত্রের নামেই দলিল হইল । হুজুর বাহাদুরের হাজার

টাকা বাবু সাহেব তৎক্ষণাৎ দাখিল করিলেন । হুজুর বাহাদুর যেন স্বর্গলাভই করিলেন, কিন্তু তিনি যে পাতালে গেলেন এবং পরবংশকেও যে রসাতলে দিলেন তাহা এখনও ভাবিয়া উঠিতে পারেন না । দেওয়ান ও কর্মচারী আদির বাহ্যিক ভক্তি ও মিনতিতেই ভুলিয়া রহিলেন । এই প্রকার ব্যক্তির হস্তেই সমুহ অর্পন করিয়া বসিয়া আছেন । মুনি ও ঋষির বাক্যের প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করিতেছেন না, বাল্যকালে যাহা পাঠ করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা যেন মনেই নাই । এই উদ্দেশে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মওলানা সাদি বলিয়া গিয়াছেন—

পাশী ।

“গুরবা মিরও সগ উজিরও মোশ দরবানীকুনদ

ই হমা অরকান দওলৎ খানাভিরাগী কুনদ।”*

হুজুর বাহাদুরের ঘরও সেই দশায় উপস্থিত । বাবু সাহেব বিদায় কালে সাহেবজাদা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন বৈকালে আসিতেছি বলিয়া ইঙ্গীতে আশা দিয়া বিদায় লইলেন, তাহার পর আজ বৈকাল ও কাল বিকাল হইতে হইতেই কাসে কাল হইয়া গেল । হুজুর বাহাদুর হাজার টাকাতেই বাৎসরিক ৫৭ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি একবারেই চিরকালের জন্য যেন এক প্রকার হস্তান্তরিত করিয়া দিলেন । বহুকাল পরে দলিলের ভ্রম ও দোষ বাহির হইতে লাগিল । হায় রে আমার

* ইহার অর্থ এই যে, যে রাজ্য বিড়াল মীর থাকে, কুকুরে যদি মন্ত্রীত্ব করে এবং ইন্দুরে যদি গ্রহরীর কার্য্য নিযুক্ত হয় তাহারা রাজ্যের উন্নতি করিবে কি, রাজ্য বিনাশই করিয়া থাকে ।

অভিমানী ভায়াগণ, আর হায়রে আমার সমাজ শিরোমণীগণ
এই করিয়াই আমরা রসাতলে যাইতেছি, এত ঠকিয়া ও
আমার অভিমানী ভায়াগণের মোহনিদ্রা ভগ্ন এবং জ্ঞানোদয়
হইতেছে না !

এক সময়ে আমরা কি ছিলাম, এখন আমরা কি হইয়াছি।
এক সময়ে আমাদের আরবিয়ধ্বজা, বিদ্যা, বুদ্ধি ব্যবসায়,
বাণিজ্য, রাজ্য ও ধনগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া জগৎময়
উড্ডীন হইতেছিল। এই ভারতখণ্ডেও পবিত্র ইসলাম পতাকা
কিরূপেই না উড্ডীন হইয়াছে। কোন জীব বা জন্তু ইহার
অবলম্বন নহে। যাহার বিনাশ আছে সে আপন সীমায় গেলেই
তাহার পর আর তাহার পুনরুত্থান হয় না, ইহাই জগতের ও
জগৎপিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টি কৌশলের নিয়ম। ধন্য ঈশ্বরের
মহিমা, তিনি এই জগতের সহিত তৎসদৃশ অন্য অন্য গ্রহ ও
নক্ষত্রগণকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া আমাদের জ্ঞান
ও শিক্ষার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে তাহাদের ও তদস্থিত যাবতীয়
পদার্থের উৎপত্তি, উন্নতি, হ্রাস ও বিনাশ ঘটাইতেছেন, তন্মধ্যে
কোন কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টিতে বিলয় হইয়া গেলও
পুনরায় তাহাদিগকে সেই প্রকারে ও সেই অবস্থায় পরিণত
করিতেছেন। আমার রসূলে পাকের দঃ অসাধারণ বিচক্ষণতা
ও দূরদর্শীতাকে শত, সহস্র ও অসংখ্য ধন্য, তিনি যেন আপন
পবিত্র ইসলামের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিতে পারিয়াই সর্ববিবিনাসোপযোগী
কোন জীব বা জন্তুর অর্থাৎ সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক আদির
অবলম্বনে আপন পবিত্র ইসলাম ধ্বজার সৃষ্টি না করিয়া যাহার

হ্রাস ও বিলুপ্তির পরও পুনরায় উৎপত্তি ও উন্নতি আছে
তাহাই অবলম্বন করিয়া আপন পবিত্র পতাকা তুলিয়া দিয়াছেন,
তদ্বারা আমাদেরকে যেন জানাইয়া গিয়াছেন যে, এক সময়ে এই
পবিত্র ইসলামের হ্রাস হইলেও যেকোন অমাবস্তার পর পুনরায়
নবচন্দ্রের উৎপত্তি হয় এবং তাহারই বিমল কিরণে ক্রমে
জগৎ স্নিগ্ধ হইয়া উঠে, তদনুরূপ এই পবিত্র ইসলামেরও
দশা তাহাই হইবে। আমাদের এই ভারতে ইসলাম সমাজে
অমাবস্তা বশতঃ যদিও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু
ঈশ্বর কৃপায় ও রসুলে পাকের দঃ আশীর্বাদে সেই অমাবস্তার
পর পুনরায় পবিত্র ইসলামচন্দ্র মধ্যভারতে পবিত্র আলীগড়
ধামে দ্বিতীয় চন্দ্র সমদৃশ্য দেখা দিয়াছে এবং তাহার
বিমল জ্যোতি আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষগণের
নিবাসস্থল পূর্ববঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিত্ত এক্ষণে
খোদাওন্দ করিমের সমীপে প্রার্থনা যে, এই পবিত্র জ্যো
যেন ক্রমান্বয়ে চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিয়া সমগ্র
এমন কি সমাগরা পৃথিবীকেও স্নিগ্ধ করিতে থাকে, ও পবিত্র
ইসলাম ধ্বজা যেন জগৎময় শোভাবর্দ্ধন করিতে থাকে।

আমিন।

“সলুল্লাহ্ অলামহম্মদ।”

“সলুল্লাহ্ অলামহম্মদ।”

সম্পূর্ণ।

